উত্তরায়ণ

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—চৈত্র, ১৩৫৯

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

মুদ্রণী

৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট,

কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—

ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

বাঁধাই—বেংগল বাইণ্ডার্স

সাড়ে তিন টাকা

বইখানি অগ্রজপ্রতিম শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখরের হস্তে

পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে সমর্পণ করলাম।

ব ভ. ম

এই লেখকের কয়েকখানি বই—

নব সন্ন্যাস (২য় সংস্করণ)

তোমরাই ভরসা

নীলাঙ্গুরীয় (৬ষ্ঠ সংস্করণ)

হাতে খড়ি

রূপান্তর

অতঃকিম্‌ (২য় সংস্করণ)

শ্রেষ্ঠ গল্প („ „)

দুয়ার হ'তে অদূরে

এক

সুকুমার মৃত্যুর মধ্যে অবগাহন করে এসে এক নবজীবনের সামনে মুখোমুখি হয়ে বসল।

কী ভীষণ! এতদূর চলে এসেছে, তবু তার কল্লোল যায় শোনা। ডাক্তার, তবুও তার করাল রূপ সহ্য করতে পারলে না, কর্তব্যহানি হচ্ছে জেনেও চলে এল। কিন্তু এই ধ্বনি-তাণ্ডব থেকে কি করে রক্ষা পায়? ওর মনে হয় পৃথিবীর যে-প্রান্তেই উঠুক, কালের যে-সীমান্তেই—এ থেকে ওর মুক্তি নেই; যে-আর্তনাদ আজকের আকাশ এমন ভাবে মথিত করছে তা ওর জীবনের আকাশেও চিরায়ু হয়ে রইল।

দৃশ্যটাও ঘুরে ফিরে আসছে মনের পটে, যতই ঠেলে রাখবার চেষ্টা করুক না কেন। খানিকটা আগে থেকে বেশি স্পষ্ট, অর্থাৎ ঘটনাটুকুর সঙ্গে যে-অংশটার বেশি সম্বন্ধ। আসানসোলে ঘুমটা পাতলা হয়ে গেল। কে একজন উঠল গাড়িতে. সুকুমার জড়িতকণ্ঠে প্রশ্ন করলে—

"কোন্ স্টেশন?"

"আসানসোল।"

"আসানসোল?...টাইমে এল?"

"না, ঘণ্টা লেট।"

"বেড়েং গেল! বর্ধমানে ছিল তিন কোয়ার্টার।...আজ একটা কাণ্ড না করে · "

হাওড়াতেও কুড়ি মিনিট দেরি হয়ে যায়; ড্রাইভারটা ইয়ার্ড থেকে বেরিয়েই প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড, ফাঁকা লাইন, তবুও কিন্তু

ক'বারই সিগনালের প্রতিকূলতা গেল। মত্ত বেগে ছুটে আসতে আসতে ইঞ্জিনটা পাখার ল্যল আলোর সামনে নিরুপায়ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে আর গর্জায়। যাত্রীদের পর্যন্ত কেমন একটা গতির নেশা লেগেছে, মুখ বাড়িয়ে থাকে উৎসুক দৃষ্টিতে। অন্ধকার আকাশের গায়ে লালটা নিভে গিয়ে পাখাব নীলটা জেগে ওঠে, গাড়ি চলতে আরম্ভ করে, একটুখানির মধ্যেই আবার সেই অন্ধ গতিবেগ, স্টেশনের পর স্টেশন ছিটকে পেছনে বেরিয়ে যাচ্ছে, দেরির ওপব দেরি করিয়ে এরা সব যেন ইঞ্জিনটাকে দিয়েছে ক্ষেপিয়ে; গাড়ি দুলে দুলে উঠছে, চাকাগুলা মনে হয় লাইন ছেড়ে উঠে পড়ল। তারপর পাগলামি যখন চরমে উঠে এসেছে, আবার লাল আলো; ক্ষিপ্ত কণ্ঠে অভিশাপ দিতে দিতে ইঞ্জিনটা মাঠের মধ্যে থেমে পড়ল।

একজন বৃদ্ধ, বয়সের দুর্বলতাতেই গোড়ায় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, জেগে উঠে বেশ একটু অস্বস্তির সঙ্গেই গুটিসুটি মেরে বসে আছেন।

প্রশ্ন করলেন—"ইস্টিশান?"

"না মাঠ; সিগনাল পায়নি।"

বৃদ্ধ একটু চুপ করে রইলেন। তারপর ড্রাইভারকে উপলক্ষ করে কতকটা নিজের মনেই বিড়বিড় ক'রে বললেন—"লাইন ক্লিয়াব না থাকলে তো ঢুকতে দিতে পারে না। তা যখন পৌছুবি, পৌছুবি, তোর এত মাথা-ব্যথাটা কিসের রে বাপু?"

একজন বললে—"অনেক সময় বেতব নেশা করে ওঠে এরা ইঞ্জিনে, অনেক দুর্ঘটনার গোড়ার কথা তাই "

আলোচনাটা সবার মনের আতঙ্কেই যে আব এগুল না, এটা বেশ বোঝা যায়।

বর্ধমানে কুড়ি মিনিটটা তিন কোয়ার্টারে দাঁড়াল। তাবপর সুকুমার কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছে, ঝাঁকানির অভ্যাসে কি ঝাঁকানির ক্লান্তিতে ঠিক বলা যায় না, হয়তো দুই-ই, তার সঙ্গে ছিল গভীরতর রাত্রি।

আসানসোলেও ঐ ক'টি কথার পর আবাব পড়ল ঘুমিয়ে তারপর সেই ঘুম ভাঙল।

একটা প্রচণ্ড শব্দ। স্বপ্নের মধ্যে গাড়ির গতিবেগের যে-শব্দটা একটা আলোড়ন তুলে রেখেছিল সেটা যেন মুহূর্তের মধ্যে হাজার গুণ হয়ে ফেঁপে উঠল, তারপরেই সেই একটা হুঙ্কার হাজার কণ্ঠের হাহাকারে টুকরা টুকরা হয়ে ভেঙে পড়ল। সুকুমার জেগে উঠল একেবারে একটা নূতন জগতে।···ঘূর্ণমান জগৎ নাকি ?—কেননা সে জাগার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে গেল এক পাক এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তার ওপরের আবরণটা একেবারে বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে তারায় ভরা নৈশ আকাশ উঠল জেগে। সেই আকাশ লক্ষ্য করে ছুটেছে খণ্ডিত হুঙ্কারের সেই হাজার হাজার হাহাকার।· অসহ্য বেদনা···কোথায় ?···কেন ?···পিঠের নিচে কি সব কিলবিল করে কেন ?...পাঁচটি মোটে ইন্দ্রিয়, অথচ কত বিচিত্র কি সব যে অনুভূতি !—সব উগ্র, আর যেন একটি মুহূর্তের মধ্যে ঠাসা ··ঠিক গুছিয়ে ধরা যায় না।···তারপর আর একটা জগৎ, বুদ্ধি আসছে ফিরে—বুঝতে পারলে গাড়ি লাইন থেকে ছিটকে পড়েছে। জানাই—পড়বে, পড়তে বাধ্য। গাড়ি কাৎ হয়ে দেয়াল আর ছাতের জোড়ের কাছটা একেবারে ফাঁক হয়ে গেছে মাথার ওপর। পিঠের নিচে কিলবিল করে মানুষ। জন পাঁচেক যাত্রী ছিল এ গাড়িটায়, সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে, গাড়িটার একটা অংশ তুমড়ে গিয়ে যে একটা ডোঙার মতো হয়ে গেছে, তারই মধ্যে। শুধু মানুষ নয়, যত মালপত্র ; তাই কিলবিলানিটা নরম হয়ে আসছে। সুকুমার পড়েছে সবার ওপর।

সারা গায়ে বেদনা ; কিন্তু সে জন্য নয়, বিরাট একটা ধ্বংসের অনুভূতির যে মোহ আছে তারই ঘোরে সুকুমার চুপ ক'রে রইল প'ড়ে। নিশ্চয় বেশিক্ষণ নয়, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল ধ'রেই আছে পড়ে—ঐ তারায় ভরা আকাশ কত আর্তনাদ যে কত যুগ ধ'রে নিজের অন্ধকারের মধ্যে লুপ্ত করে ফেলছে !···

তারপর প্রকৃত হুঁস হোল, ডাক্তারের সহজ বোধ নিয়ে ঘোরটা থেকে জেগে উঠল সুকুমার। উঠে বসল ; শব-সাধনা করার মতো সে বৃদ্ধের দেহের ওপর বসে আছে। শব-সাধনাই, কেননা তার শরীরটা মৃত্যু-হিম, পায়ের উল্টপিঠ দিয়ে অনুভব করছে সুকুমার আরও নিচে থেকে একটা ক্ষীণ আওয়াজ উঠে

আসছে। সুকুমার সচকিত হয়ে উঠল, ও লোকটা বেঁচে আছে!—তবে আর বেশিক্ষণ নয়—কিছু করা যায় না?···ভেতরটা একেবারে অন্ধকার, তবু হঠাৎ উৎসাহের ঝোঁকে উঠে পড়ে বৃদ্ধের শরীরটা সমস্ত শক্তি দিয়ে পাঁজা করে তুলে ধরলে—ওপরে ভাঙা ছাত বেয়ে বাইরে ফেলে দেবে, এই রকম একটা একটা করে মোটঘাট পর্যন্ত সব। ডাক্তার জেগে উঠেছে, কান্নাটাকে খুঁড়ে বের করতে হবে, বাঁচাতে হবে লোকটাকে।···বৃদ্ধকে তুলে ধরতেই নীচে চাপ পড়ে মোটঘাট, ভাঙা তক্তা, লাস—সবগুলো আরও গেল নেমে, কান্নাটা মিহি হতে হতে থেমে গেল, বর্ধিত চাপে পিষ্ট হয়েই গেল বলা যায়।

ভুল হয়ে গেছে, তবে অনুশোচনা হয় না ভুলের জন্য, করতই বা কি যের করে—মৃত্যুর একেবারে দোর থেকে টেনে এনে?—ওষুধ নেই, নিতান্তই ফার্স্ট্এডের দু'একটা যা থাকে সব ডাক্তারের ব্যাগেই, তাও কোন্ অতলে কে জানে?

দুটো তক্তা দু দিক দিয়ে এমন ঢালু হয়ে নেমে এসেছে যে ছাতে ওঠা দায়—বেরুবার যা একমাত্র পথ। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে মোট-মানুষ একজায়গায় জড়ো করে তার ওপর উঠে সুকুমার ছাতে পৌছুল, তারপর আন্দাজে আন্দাজে কি সবের ওপর পা দিয়ে দিয়ে বাইরে নেমে এল।

নেমে এসে দাঁড়াল লাইনের উঁচু বাঁধটার বেশ খানিকটা নিচের দিকে। অন্ধকারে চোখ অনেকটা সয়ে এসেছে। কী বীভৎস দৃশ্য! ওদের গাড়িটা প্রায় ট্রেণের মাঝামাঝি, ইঞ্জিন থেকে এ পর্যন্ত সমস্তটা একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ইঞ্জিনটা ছিটকে বাঁধের নিচে গিয়ে পড়েছে, চাকাগুলা ওপরে, ফায়ারবক্সে আগুন এখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে; তার রাঙা আলোটা সামনের ধ্বংসস্তূপের ওপর নাচছে যেন একটা বিরাট তাণ্ডবে। সব পেছনের মাত্র দু'খানি গাড়ি লাইনের ওপর আছে দাঁড়িয়ে, তার আগের সবগুলাই টাল খেয়ে লাইন থেকে নেমে গেছে কমবেশি ক'রে। মাঝখানের একটা কি ক'রে একেবারেই কয়েকটা পাক খেয়ে বাঁধের একেবারে নিচে চলে গেছে, মাঝামাঝি একটা জায়গা খালি ক'রে।

ঐ অন্ধকারের মধ্যেই ছুটাছুটি, হাঁকাহাঁকি, খোঁজাখুঁজি। আর্তনাদে কান পাতা যায় না। মুমূর্ষুর গ্যাঁঙানি—জল! জল!...পানি দেও!...সঙ্গীদের নাম ধরে ডাকছে, যতই উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না, আতঙ্কে, নৈরাশ্যে গলা যাচ্ছে চিরে। বৃদ্ধ গোছের একজন হন্তদন্ত হয়ে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে সুকুমারের কাছে এসে একেবারে মুখের কাছে মুখ নিয়ে এল। উৎকণ্ঠায় চোখ দুটো জ্বলছে কোটরের মধ্যে; শুধু বললে—"কৈ, এ না তো; কোথায় গেল তা'হলে? কি হোল?"...হন্তদন্ত হয়ে আবার চলে গেল।...কত করবার আছে, কিন্তু আরম্ভ করে কোথায় সুকুমার? এগিয়ে গেল সামনের ধ্বংসস্তূপটার দিকে। মানুষের এ রকম বিকৃত অঙ্গ দেখেনি কথনও; ডাক্তারির ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও; এক সময় কত রকম দুর্ঘটনার কেস্ তো ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়েছে।...একটা লোক জ্যান্ত, তাঁর চোখের উগ্র কাতর দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হয়েই সুকুমার দাঁড়াল। কোমরের নিচেটা একরাশ লোহা আর কাঠের মধ্যে চাপা; টেনে বের করতে ডান-পায়ের আধখানা ভেতরেই রয়ে গেল; লোকটার দৃষ্টিও সেই সঙ্গে গেল নিভে।...সুকুমারের মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাবে এ আবেষ্টনীর মধ্যে বেশিক্ষণ থাকলে, হয়তো শুধু এই জন্যই যে, এত করবার আছে অথচ কোন উপায় নেই। ভেতরের ডাক্তার ওকে টেনে রাখতে চাইছে, মনটা কিন্তু আইঢাই করছে, এখান থেকে মুক্তি পেলে বাঁচে।

এমন সময় ধ্বংসস্তূপের একটা আড়াল ছাড়িয়ে দাঁড়াতেই দূরে দিকচক্রের এক জায়গায় দৃষ্টি আটকে গেল। সিগনালের নীল আলো, গাড়িটার প্রতীক্ষায় বহু দূরে আকাশের কোলে রয়েছে জেগে।

মুক্তি পেলে সুকুমার, ভেতরের ডাক্তারকে ক্ষুণ্ণ না করেই। সত্যই তো, আগে গিয়ে স্টেশনে যে খবর দিতে হবে। যদি ছোট স্টেশন হয় তো ওরা আবার পাশের বড় স্টেশনে দেবে খবর, সাহায্য নিয়ে গাড়ি আসবে—ওষুধপত্র, লোকজন, তারপরে তো পারা যাবে কিছু করতে। ..অন্তরের সঙ্গে বাইরের রফা হোল।

বাঁধ থেকে আরও খানিকটা নেমে সুকুমার সোজা চলল, গাড়ির বিকট দৃশ্যটা সাধ্যমতো এড়িয়ে, ইচ্ছে করেই আর চাইছে না ওদিকে। ইঞ্জিনটা পেরিয়ে আবার বাঁধের ওপর উঠে পড়ল। পাহাড়ে অঞ্চল, কোন্‌খানটা বোঝবার উপায়

নেই, তবে লাইনটা সামনে-পেছনে তুদিকেই ক্রমে ক্রমে উঁচু হয়ে গেছে; তার মানে বেগমত্ত গাড়িটা ওৎরাইয়ের মুখে আর টাল সামলাতে পারে নি। সামনের চড়াই ঠেলে উঠতে লাগল সুকুমার, এদিকটা খুব খাড়া নয়, অন্ধকারে চোখ বেশ ভালো রকমই সয়ে এসেছে; ছুটতে লাগল। নীল আলোটাকে লাগছে বড মিষ্ট, স্নিগ্ধ, অবিচল, চোখ তুটো যেন জুড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু অনেকটা দূর; তুইটা পাহাড তুইদিক থেকে এসে লাইনের অবকাশটুকু হয়েছে গলির মতো, তারই একটা বাঁকের মুখে সিগনালের ঐ আলোটা। ডিস্‌টেণ্ট অর্থাৎ বাইরের সিগনাল, স্টেশনটা তাহলে ও থেকেও আধ মাইল দূরে হবে।

খানিকটা এগিয়ে একবার চোখ তুলে দেখলে আলোটা কখন্ নীল থেকে লাল হয়ে গেছে। ওরা তাহলে টের পেলে নাকি?

পৌঁছে দেখলে স্টেশন নয়—একটা ছোট আড্ডা, রেলেব ভাষায় বলে হল্ট্। পাহাড়ে জায়গা—স্টেশন যেখানে বহু দূরে দূরে, সেখানে মাঝে মাঝে এইরকম এক একটা হল্ট বসানো থাকে একটা লোকের চার্জে, সে সিগনাল দিয়ে গাডিব গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে, স্টেশনে খবর চালান দেয় টেলিফোনযোগে। একটা নিরাপত্তাব ব্যবস্থা।

লোকটার সঙ্গে কথাবার্তা হোল। সে কিছুক্ষণ আগে জানতে পেরেছে—একটা আওয়াজ শুনেছিল, কিন্তু ওৎরাইয়েব মুখে গাডিব আওয়াজ ভেবে গা কবেনি প্রথমটা; তারপরে বেরিয়ে দেখে সার্চলাইট নেই, তাবপর গাড়ি আসতেও দেরি হতে লাগল। স্টেশনে টেলিফোন কবে দিয়েছে, তুদিকেই লাল আলো জ্বালিয়ে দিয়ে। জায়গাটা ঝাঝা আর শিমূলতলাব মাঝামাঝি।

বললে তার উপায় নেই হল্ট ছেড়ে যাবার। সব ভগবানের মর্জি। বুঝিয়ে দিলে লাইনই যখন, তখন গাডি চলবেও, আবার ডিরেলও হবে। কলিশনও হবে। যেমন মানুষের জিন্দগি, ভোগও আছে, আবার মৃত্যুও আছে। সুকুমার যখন পৌঁছল, সে নিশ্চিন্ত সুরে রামায়ণ পাঠ করছিল।

ফিরল সুকুমাব। সাহায্যের গাড়ি আসতে আসতে সেও যেন আবার পৌঁছে যেতে পারে ঘটনাস্থলে। একটা ঝোঁকের মাথায় এসেছিল, মাঝে মাঝে ছুটেই,

সে-ঝোঁকটা কেটে গিয়ে আবার শরীরে মনে ক্লান্তি ছেয়ে আসছে, আরও অনিবার্যভাবেই। ক্লান্তিটা অনুভব করছে বলেই হাওয়াটা লাগছে বড় মিষ্ট—হালকা খনখনে পাহাড়ে হাওয়া। শুধু তাই নয়, অতবড একটা ট্রাজেডি প্রত্যক্ষ করেছে বলেই পাহাড়ের স্নিগ্ধ পরিবেশে রাত্রির এই অপরূপ শান্তি অবসর পেয়ে ওর মনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে লাগল।··এইটেই টানছে, একটু আগে ট্রাজেডির ভীষণতাটা যেমন ভাবে টেনেছিল; ক্রমে যেন তার চেয়েও বেশি ক'রে। এগুতে ইচ্ছে করছে না, শুধু ক্লান্তির নয়, সারা মনটাই কেমন যেন গুটিয়ে আসছে। ···একটা পুল পেলে, ছোট্ট একটা পাহাড়ী ঝরণার ওপর, একটু দাঁড়িয়ে কি ভাবলে স্থকুমার, তারপর খানিকটা নেমে এই এসে বসেছে।

দুই

জায়গাটা সত্যই চমৎকার। রেলবাঁধের নিচে থেকে জঙ্গল আরম্ভ হয়ে সেটা ডাইনে বাঁয়ে আর সামনে একটা বিরাট পরিধি নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আরও দূরে, আকাশের কোলে একটা পাহাড়ের স্তূপ অর্ধচন্দ্রাকারে স, ও, জঙ্গলটাকে রেখেছে ঘিরে, দৈর্ঘ্যে সবটা বোধহয় চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইলেরও বেশি। সমস্ত জায়গাটা নিঃশব্দ; এইটিই যেন তার স্বধর্ম, তাই দূর থেকে যে-আওয়াজটা ভেসে আসছে—আর্তনাদের, সেটাকে অপঘাতের মতো আরও কর্কশ বলে মনে হচ্ছে।

স্থকুমার সামনের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল। অন্ধকারে চোখ ঠেলে ঠেলে সামনের মসীলিপ্ত বিরাট গ্রন্থ থেকে কি একটা যেন পাঠোদ্ধার করবার চেষ্টা করছে। যে-জীবনটাকে এত সত্য বলে মনে হচ্ছিল, একটা ক্ষণিকের প্রলয়ে তো দেখা গেল সেটা কি একটা বিরাট মিথ্যা। এই মিথ্যার জন্যই কত ত্রুটি, স্খলন, কত গ্লানি; আবার গিয়ে একেই ধরবে আঁকড়ে?·· শ্মশান-বৈরাগ্য বলে যে একটা জিনিস আছে, আসলে সেইটাই স্থকুমারের মনকে করেছে অধিকার; শুধু এইটুকু

প্রভেদ যে আজকের শ্মশানটাও ছিল বিকটতম, তাই বৈরাগ্যটাও তেমনি অতল গভীর। মনটা হয়ে উঠছে নরম, উদাস, উদার। একটি প্রশ্নই জটিলতর হয়ে বারে বারে আসছে ফিরে—সুকুমার বুঝতে পারছে না সামনে ঐ ঘন অরণ্যের মধ্যে নেমে গিয়ে এ-সবের সম্ভাবনা থেকে নিজেকে চিরতরে আলাদা করে দেবে, কি ফিরেই যাবে স্খলন-ক্রটি-গ্লানিতে ভরা ঐ মিথ্যার মধ্যে। ঐ যদি হয় মানুষের অদৃষ্ট—তো নির্বিচারে মেনে না নিয়ে উপায় কি ?

চিন্তায় ক্লান্তি আসছে বলে সুকুমার জোর করেই তাকে ঠেলে সরিয়ে চুপ করে বসে রইল। অনেকক্ষণ গেল। একবার ঘড়িটার দিকে হাত উলটে দেখলে, নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবেই। এই প্রথম দেখলে। ঘড়িটারও অপমৃত্যু হয়েছে, বন্ধ হয়ে গেছে একটা বেজে। নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু খালি পেয়ে সুকুমারের মনে যে স্তব্ধতার সমতান জেগে উঠছিল তাতে যেন আর একটি সুর সংযুক্ত হোল। এই রাত্রি, এই জনহীন অরণ্য, এই নিকষের মতো অন্ধকার, যার গায়ে কোনখানেই একটু আলোর রেখাপাত নেই—এই সবের পাশে সময়ও যেন হঠাৎ গতিহীন হয়ে পড়ল দাঁড়িয়ে। মৃত্যুর গহ্বর থেকে উঠে এসে সুকুমার মৃত্যুর চেয়েও রহস্যময় কিসের সামনে এসে পড়েছে।

ক্রমে অনুভব করলে এ তারই জীবন। আজকের এই মৃত্যুস্রোতে, পরম বেদনার মধ্যে যে তার তীর্থস্নান হোল এটা বুঝতে পারে নি সুকুমার। তারই জীবন; নূতন রূপের রহস্যেই তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বলে তাকে চেনা যায় নি।

নব জন্মের আনন্দেই আরও অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল। শেষ কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার এক সময় যেন নিবিড়তম হয়ে উঠে আস্তে আস্তে আবার স্বচ্ছ হয়ে আসতে লাগল; বুঝলে পাহাড়ের আড়ালে চন্দ্রোদয় হচ্ছে; রাত্রিরও নবজন্ম। বড় অপূর্ব লাগছে, বাইরের সুরের সঙ্গে মনের সুর আছে মিলে। সমস্ত পৃথিবীটারই রূপ ধীরে ধীরে যাচ্ছে বদলে।

সুকুমার পারবে। জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। স্বার্থে, লোলুপতায় যে-জীবনে গ্লানি এনে ফেলছিল, কর্মে সেবায় সেই জীবনকে আবার সার্থক করে

তুলবে।···ধীরে ধীরে সেই সার্থক জীবনের পুণ্যচ্ছবি তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। আজ থেকেই যাত্রার আরম্ভ। যাঁর বিধানে সামনে এই বিপুল শান্তি, তাঁর বিধানেই তো ঐ বিরাট ধ্বংস; তাঁরই যখন আহ্বান, কাপুরুষের মতো জ্ঞান-বধির হয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকবে সে?

এক সময় উঠে পড়ল; চিন্তার মধ্যে সময়ের ঠিক আন্দাজ রাখতে পারে নি, তবু নিশ্চয় বেশই দেরি হয়ে গেছে। এখনি সাহায্যের ট্রেণটা নিশ্চয় পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। পুলের পাড় বেয়ে অনেকটা নেমে এসেছিল, কয়েকবার পা ফসকে ফসকে তাড়াতাড়ি উঠে এল; ছু' এক জায়গায় গেল ছড়ে, গ্রাহ্যের মধ্যে আনলে না।

ওপরে উঠে এসে হঠাৎ একটু দ্বিধায় পড়ল; কোন্ দিকে যাবে?—দক্ষিণে, না, উত্তরে হল্টটার দিকে? হল্টে গেলে খোঁজ পেতে পারে সাহায্য-ট্রেণটা রওয়ানা হয়েছে কিনা, কিম্বা কখন্ এসে পড়বে · নিরুপায় ভাবে দাঁড়িয়ে সেই ধ্বংসের দৃশ্য দেখাও তো যন্ত্রণা। তেমনি আবার গাড়িটা যদি ইতিমধ্যে এসে পড়ে তো বৃথা সময় নষ্টও তো। তার পর মনে হোল হল্ট্‌ম্যান গাড়িটা একটু রুখে দিতেও তো পারে; একজন ডাক্তার সাহায্যে যোগদান করবার জন্য অপেক্ষা করছে জানলে ওরা আপত্তি নাও করতে পারে। আর, আজ সবই তো নিয়মের ব্যতিক্রম।

আর বেশি তর্কের দিকে না গিয়ে হল্টের অভিমুখেই পা বাড়াল; এমন কিছু দূরেও নয়।

সামনে গিয়ে দাঁড়াতে রামায়ণ পাঠে বাধা পড়ল। খবর পেলে এখনও খানিকটা দেরি আছে গাড়ি আসতে।

আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে স্থকুমার ঘুরে দক্ষিণমুখো হোল। পাঁচ-সাত পা যেতে না যেতেই রামায়ণের স্থর উঠল। আবার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল, পেছন থেকে ডাক পড়ল—"বাবুজী!"

স্থকুমার ঘাড় ফিরিয়ে দাঁড়াল। হল্টম্যানটা বেরিয়ে এসেছে।

"কি?"

"একঠো মাইয়ালোক এসেছে; বাঙ্গালীন, ভোদ্দোর লোক।"

বেশ ভালো ক'রে ঘুরে দাঁড়াল স্থকুমার।

"ভদ্রঘরের বাঙালী মেয়ে! কোথায় আছেন? চোটফোট লেগেছে নাকি? ওখান থেকেই আসছেন?"

"না, চোট না আছে, আপনি আসেন না, দেখবুন।"

বেশ উৎকণ্ঠিত ভাবেই পেছনে পেছনে চলল স্থকুমার। হন্টের একটু দূরেই একটা ছোট ঘর, খুবরি বললেই হয়। রেলের দিক থেকে বোধ হয় তৈয়ার করাও নয়, হন্টম্যান নিজের প্রয়োজনে পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে করে থাকবে। ভেতরে একটা টেমি জ্বলছে। তারই আলোয় সামনে একটা দড়ির খাট দেখা যায়; হয়তো মেয়েটি তার ওপর বসে ছিল, এরা যখন পৌঁছাল, ঘরের মুখটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ততক্ষণে জ্যোৎস্নাও খানিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মেয়েটির বয়স তেইশ-চব্বিশ বছর হবে। বেশ স্থন্দরী, তবে মনে হোল রংটা হয়তো একটু ময়লা। সাজ-সজ্জায় মনে হয়, রুচিও আছে, সামর্থ্যও আছে; অর্থাৎ সব দিক দিয়ে এক নজরে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো মেয়ে।

কিন্তু তার নিজের দৃষ্টি একটু অদ্ভুত ধরণের। উঠে এসে দাঁড়িয়েছে, হয়তো বা ছিলই দাঁড়িয়ে, কিন্তু চোখে কৌতূহল, প্রশ্ন বা অভিনিবেশের কোন চিহ্ন নেই, কেমন যেন শূন্যলগ্ন। ডাক্তার স্থকুমার খুব বিস্মিত হোল না, ব্যাপারখানা যা হয়ে গেল তাতে আজ অনেকেরই চৈতন্য নষ্ট হয়ে গিয়ে দৃষ্টি এই রকম উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যাবার কথা। স্থকুমার হন্টম্যানের পেছনে ছিল, সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলে—"আপনি ওখান থেকে আসছেন?—ঐ কলিশনের জায়গা থেকে?"

"হ্যাঁ, কলিশন নয় তো, গাড়িটা ডিরেল হয়ে গেছে।"

স্থকুমার একটু থতমত খেয়ে গেল, শুধরে নিয়ে বললে—"ঠিক, আমারই ভুল হয়েছিল, ডিরেলমেন্টই।···ওখান থেকেই আসছেন তাহলে—ঐ গাড়িতেই ছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

মুস্কিলে পড়া গেল, আর কথা এগোয় না; প্রশ্ন করতে গিয়ে কোন্ মর্মন্তুদ স্মৃতিতে ঘা দিয়ে আবার সেটাকে জাগিয়ে তুলবে! প্রথম উত্তরটায় উন্মাদের লক্ষণ না পেলেও, দৃষ্টিটা বেশ সহজ বোধ হচ্ছে না তো।

মেয়েটি নিজেই বলে গেল—"ঐ গাড়িতেই ছিলাম একটা ফার্স্ট ক্লাসে। একটা শক লেগেছিল, কিন্তু··"

একটু যেন মনে করবার চেষ্টা করলে, তারপর—"কিন্তু তেমন কিছু নয়। জিনিসগুলো অবিশ্যি খুঁজে পেলাম না—হোল্ডঅল আর স্যুটকেসটা।"

একটু মনে ক'রে ক'রে দিলেও বেশ সুসংলগ্ন বিবরণই। সুকুমার বেশ সাহস পেল প্রশ্ন করতে, তবে বেশ সাবধানেই অগ্রসর হোল—

"একলাই চলে এসেছেন্···এই এতটা পথ ?"

"হ্যাঁ, একলাই ছিলাম।"

নিশ্চিন্ত হোল সুকুমার। এর পর কি ভাবে অগ্রসর হতে হবে, ভেবে নিলে, প্রশ্ন করলে—"বাড়িতে আছেন কে ?···মানে, কাকে খবরটা দেওয়া যায় ? আমার মনে হয় এখান থেকে ফোন্ করা চলবে—জংশন স্টেশনে, তারপর তারা জানিয়ে দেবে· ঠিকানাটা কি ?"

আশা করছিল ভরসার কথাগুলো শুনে ওর মনে যেটুকু আতঙ্কের জড়তা লেগে আছে সেটুকু কেটে যাবে; কিন্তু ফল হোল উল্ট। মেয়েটি এক দৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রইল এবং চোখের ভাবটা আগেকার চেয়েও বিহ্বল আর শূন্যময় হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে এমন একটা দীপ্তি ঠিকরে বেরুচ্ছে যাতে মনে হয় ভেতরে ভেতরে কিসের একটা অমানুষিক চেষ্টা চলছে মস্তিষ্কের মধ্যে। একটু পরে হতাশ হয়ে প্রশ্নে-উত্তরে জড়িয়ে বললে—"বাড়িতে ?·· জানিনা তো কে আছে···"

সুকুমার আবার সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল, চোখে কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠেছে, প্রশ্ন করলে—"ঠিকানাটা ?·· কোন ঠিকানায় জানাব ?"

ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়েই রইল, কোন উত্তর নেই, স্মৃতিটা আলোড়ন করে দেখবার শক্তিটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছে। সুকুমারের সন্দেহটা গেছে মিটে, রোগ যে কোথায় ধরতে পেরেছে—হঠাৎ একটা প্রবল সংঘর্ষে স্মৃতির একটা প্রকোষ্ঠই গেছে নষ্ট হয়ে, একটা সীমারেখার পর থেকে সমস্ত অতীতটা ওর জীবন থেকে গেছে মুছে। তবুও দু'একটা প্রশ্ন করলে—

"কলকাতা থেকে আসছেন ?···চড়েছেন কোথায় ?"

কোন উত্তর নেই। সুকুমার একটু দ্বিধায় পড়ল, তবে ডাক্তারের মন দিয়ে সেটা সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়ে উঠল, জিজ্ঞাসা করলে—"আপনার নাম? মানে রেলের লোকেরা হয়তো জানতে চাইবেন তাই ..."

এটা যেন অনেকটা হাতের কাছের জিনিস, মেয়েটির দৃষ্টিতে আবার চেষ্টা করবার ভাবটা ফুটে উঠল একটু। কিন্তু ফল হোল না। শেষে হঠাৎ সেই দৃষ্টিতে একটু বুদ্ধির দীপ্তি জেগে উঠল, ব্লাউসের ভেতর থেকে রুমালটা বের করে একটা কোণের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সুকুমারও এগিয়ে গেল। রাঙা ক্রুচেটের সুতায় একটা ইংরাজী "S" অক্ষর লেখা।

সুকুমার একটু সময় দিলে, তারপর জিজ্ঞাসা করলে—"সুনন্দা?"

"না তো।"

"সুচেতা?"

মাথাটা ধীরে ধীরে নাড়লে শুধু, চারটে আঙুলের ডগা দিয়ে কপালটা একটু ঘষলে। সুকুমার 'স' দিয়েই নাম বললে —"সরলা?"

তাও না।

"সরমা?"

মুখে নিশ্চিন্ততার অল্প একটু হাসি ফুটে উঠল, বললে—হ্যাঁ, সরমা—সরমা—সরমা সেনগুপ্তা।"

সুকুমারের মনে হোল মস্তিষ্কের ওপর আর বেশি চাপ দেওয়া ভুল হবে।

এই সময় লাইনে যেন একটা ক্ষীণ শব্দ উঠল। হন্টম্যান তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তখনই ঘুরে এসে বললে—"গাড়ি পহুঁছে গেল, সার্চলাইট দিখাই দিচ্ছে।"

সুকুমারও সচকিত হয়ে উঠল, জিজ্ঞাসা করলে—"এখানে একবার দাঁড় করাতে পারবে? আমি ডাক্তার, গেলে কাজ হবে।"

তারপর উগ্র তাড়াহুড়ার মধ্যে অত কিছু না ভেবেই মেয়েটির পানে চেয়ে বললে—"আপনিও যাবেন না হয়?"

"না! না!—ওখানে নয়!!"

—দারুণ আতঙ্কে চোখ দুটো যেন ঠেলে আসছে, যেন আগলে রাখবার জন্যেই সুকুমারের চেয়ে দু'পা এগিয়ে গিয়েই বললে—"আপনিও যাবেন না···শুনেছি ওরা মেরে ফেলে যারা বেঁচে আছে তাদের!"

—শেষের কথাগুলো বললে বোধ হয় নিজের অসহায়তাকে ঢাকবার জন্যেই; ভয় দেখালে যদি কার্যসিদ্ধি হয়, সুকুমার না যায়।

সুকুমার অন্যরকম ভয়ে শান্তকণ্ঠে বলল—"না, আমি যাচ্ছি না; আপনি চঞ্চল হবেন না মোটেই।

তিন

যে-সঙ্কল্পটা নিয়ে পুল থেকে উঠে এসেছিল তাতে বাধা পড়ল। ডাক্তারী বিবেকটা ক্ষুণ্ণ হ'ল, তবে বেশি নয়, কেননা এও তো সেই কাজই—বহুর জায়গায় না হয় একজনকে নিয়েই,·কিন্তু সেই একজনের মধ্যে ট্র্যাজেডিটা তো কম ঘনীভূত হয়ে ওঠে নি—এযে বেঁচেও ম'রে থাকা। বিবেককে এই বলে সান্ত্বনা দিলে যে এই রকমই বোধ হয় দৈবের ইচ্ছাও, নৈলে এমন করে এইখানেই টেনে নিয়ে এলেন কেন? ঐদিকে যাবার জন্যেই তো উঠেছিল।

ট্রেণটা হল্টে এসে আপনিই দাঁড়াল। দু'খানা গাড়ি নিয়ে তৈরি, ভেতরের একজন লোকের সঙ্গে হল্টম্যানের কথাবার্তা হোল, দুর্ঘটনাটা কত দূরে কি বৃত্তান্ত এই সব নিয়ে। কয়েকটা মিনিট উৎকট দ্বিধার মধ্যে দিয়ে কাটল সুকুমারের। দু'জনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ও এক একবার ঘুরে চাইছেও গাড়িটার পানে, পা'টা যেন আপনিই উঠে পড়তে চায়, তারপরেই সরমার মুখের পানে গিয়ে দৃষ্টিটা পড়ছে; সে যেন মরণ-বাঁচনের রায় শুনবে এখনি। ··গাড়িটা ছেড়ে যেতে একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার।

সুকুমার আর অত ভাবাভাবির মধ্যে না গিয়ে চিকিৎসা আরম্ভ করে দিলে; বললে—"আপনার একটু ঘুম দরকার আগে।···আর কিছু নয়, একটু-আধটু থাক···

ধাক্কি তো লেগেছেই এখানে-সেখানে—এখন বুঝতে পারছেন না—ঘুমুলে সেটুকু ঠিক হয়ে যাবে।...কিন্তু কথা হচ্ছে, শোবেন কোথায় ?"

নিজের প্রশ্নের প্রচ্ছন্ন উত্তর হিসাবেই দড়ির খাটটার দিকে একবার অপাঙ্গে চাইলে।

সরমাও বললে—"কেন, ঐতো রয়েছে, এখানে আর কত বিচার করতে যাব ? ...কিন্তু একটা কথা, নাইবা ঘুমুলাম, কতটুকুইবা রাত আর ?"

স্থকুমার অম্নুরোধের মধ্যে একটু আদেশ ফুটিয়েই বললে—"না, ঘুমটা আপনার দরকার।...আর, আমি যাব না জায়গাটা ছেড়ে, ভয় নেই।"

বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে উঠল সরমা; বোধ হয় লজ্জাটাকে চাপা দেবার জন্যেই খুবরিটার দিকে পা বাড়ালে, কিন্তু আবার মুখ ফিরিয়ে বললে—"না. ও লোকটার আপত্তি হ'তে পারে খাটটা বেশিক্ষণের জন্যে ছেড়ে দিতে, তাই বলছিলাম।"

উত্তর হোল—"যে এমন অবস্থার মধ্যেও বসে রামায়ণ পাঠ করতে পারে, সে রাজপাট ছেড়েও বনে বাস করবার লোক—খাট তো তুচ্ছ ; .আপনি নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোন গিয়ে ; আমি কাছেই আছি।"

খানিকটা সরে গিয়ে একটা পাথরের ওপর বসল আবার রাত্রির সামনা-সামনি হয়ে। একটা টিলার খানিকটা চেঁচে ফেলে সেইখানে হল্টটা বসানো হয়েছে ; টিলা চিরে রেলের লাইনটা দুদিকে ঢালু বেয়ে গেছে বেরিয়ে। পুলের সামনেই সেই বিরাট অরণ্যটা গেছে আড়ালে পড়ে। দুর্গতদের আর্তনাদটাও গেছে চাপা পড়ে ; নিশ্চয় অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে, যেটুকু আছে, টিলার গায়ে প্রতিহত হয়ে ওদিকেই ফিরে যাচ্ছে। আওয়াজের মধ্যে হল্টম্যানের একস্থরে রামায়ণ পাঠ।

স্থকুমার আকাশ-পাতাল ভাবছে বসে বসে, এ আবার কী নূতন সমস্যার মধ্যে পড়ল ? একে নিয়ে এখন করে কি—কোথায় গিয়ে ওঠে—কোথায় রাখে ? এর অতীত নেই, বিধাতার সৃষ্টির যেন একটা ব্যতিক্রম, জীবনের মাঝখান থেকে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে উঠেছে ; সংসারের মধ্যে একে কি করে কোনখানটিতে বসায় ?

...অতীত যে নেই একেবারে তাও তো নয়; সব থেকেও নেই, সেই খানেই তো সমস্যা আরও জটিল।

আজকের অভিনব অভিজ্ঞতার মধ্যে চিন্তার ক্ষমতাটা নিশ্চয় একটু কমে এসেছে। তবুও মাঝে মাঝে বুদ্ধির একটু স্ফুরণ হচ্ছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রশ্ন এসে অবার সব এলোমেলো করে দিচ্ছে।...একটা সমাধান মনে এসেছে—বিজ্ঞাপন দিয়ে দেবে কাগজে কাগজে।...বেশ, কিন্তু যতদিন না উত্তর আসছে রাখবে কোথায়? বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখা চলবে না—রেল দুর্ঘটনার মধ্যে পরিচয় - একথাটা অনেকে হয়তো বিশ্বাস করতে পারতো, কিন্তু ঐ যে পূর্ব জীবনের স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে এইটেই বিশ্বাসে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। এ ব্যাধিটা অসাধারণ, এমন কি অন্য ব্যাধির মতো পরীক্ষায়ও ধরা পড়বার নয়; লোকের মনে করতে একটুও সঙ্কোচ হবে না যে এটা দু'জনের মাথা ঘামিয়ে একটা মন-গড়া ব্যবস্থা—যাতে অতীত সম্বন্ধে সব কৌতূহল নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। মনে পড়ল কলকাতায় সম্প্রতি কয়েকটি মানসিক ব্যাধির চিকিৎসাগার হয়েছে, এ্যাসাইলাম, কিন্তু সেখানে কি চাইবে থাকতে? এ যা ব্যাধি, তাতে মনের একটা অংশ একেবারে সুস্থ, জীবন্ত; জীবনে একটা কিছু যে হয়েছে সে সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। ঐ রকম জায়গায় নিয়ে গেলে সুস্থ অংশটাও আতঙ্কে—নিরাশায় বিকৃত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা নেই কি?...ঝড় শক্ত প্রশ্ন সব, সুকুমারের মনটা শুধু ব্যথাতুর করে তুলছে। আর ঠিক যে সেবা, চিকিৎসা, পরোপকার, নিজের জীবনকে নতুন পথে চালিত করা—এ সব নয়, এই দুর্ঘটনা থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে দু'জন একজায়গাটিতে এসে দাঁড়িয়েছে, সমবেদনায় মনটি উঠছে ভরে; রাত্রিটিও এমন, সমাবেশও এমন যে আর সব খেয়াল থেকেই মুক্ত হয়ে মানুষকে, শুধু মানুষ বলেই বুকের কাছে টেনে নিতে ইচ্ছে করছে; কত অসহায়, কতই যে ক্ষণ-ভঙ্গুর, দেখা তো গেল।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল—সুকুমারের নিজের বাড়িতে খবর দিতে হবে! মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে পাঁচটা চিন্তার মাঝখানে পড়ে। কাল ভোর না হ'তে ডিরেলমেণ্টের খবরটা শহরময় দেশময় ছড়িয়ে পড়বে, যতশীঘ্র সম্ভব এখবরটাও পৌঁছানো দরকার যে সুকুমার ভালো আছে। কি উপায় হতে পারে? মনে

পড়ে গেল হুন্টে টেলিফোন আছে। এখনই তো এ কথা মেয়েটিকে বলছিল, আর গাড়িটা যে এল—সেও তো টেলিফোনে খবর পেয়েই।···আজ ক্রমাগতই এত ভুল হয়ে যাচ্ছে।

উঠে হন হন করে এগিয়ে গিয়ে "পাঁড়েজী" বলে ডাক দিতে যাবে, একটা অদ্ভুত কথা মনে হতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।—তার নিজের অতীতকে যদি মুছে ফেলা যায় তো কেমন হয়? মেয়েটির গেছে দৈবের হাতে মুছে, সুকুমার মুছে ফেলবে নিজের হাতে।·· উত্তেজনায় সুকুমারের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।···চমৎকার হয়, অত বড় দুর্ঘটনা হয়ে গেল, তারপর আর খবর পাওয়া গেল না সুকুমারের—বিনা আয়াসেই লোকে এ থেকে একটি মাত্র সিদ্ধান্ত যা হয় তাই করবে—অর্থাৎ সুকুমার আর নেই। কোন প্রশ্ন উঠবে না, কিছু না। জীবনের মধ্যেই চমৎকার একটি মৃত্যু। পুরাণো পৃথিবীটাতে সে আর নেই; সেখান থেকেই নূতন পৃথিবীটা গড়ে তুলুক না। সুকুমার ধীরে ধীরে এসে আবার শিলাখণ্ডের ওপর বসল।···একটা কান্নার রোল উঠবে বাড়িতে। উঠুক; মা নেই, তা ভিন্ন সবচেয়ে যা নির্ভাবনার কথা—কারুর সীমন্তের সিঁদুর মুছবে না তার বিলুপ্তিতে। জীবনের ওপর তার একটা অভিমান আছে···বাবা, সৎ-মা,···যে ছবিটা ফুটে উঠতে চায় সেটাকে জোর করে চেপে রাখে সুকুমার; বেশ আনন্দের স্মৃতি তো নয়! কিন্তু পুরাতন এত অল্পে ছাড়তেও তো চায় না; বলে—ফিরেই এসো, ছোট বড় বৈষম্য-মিটিয়ে এর মধ্যেই তো আবার নূতন করে আনন্দ সৃষ্টি করে নিচ্ছে মানুষে, তুমিই বা না পারবে কেন?—সম্পত্তি রয়েছে, সহায় রয়েছে, ভবিষ্যৎ—তাও অনুজ্জ্বলই বা কিসে?··

অস্বীকার করে না সুকুমার, তবু যেন একটা নবজন্মের জন্যই মনটা আবেগময় হয়ে ওঠে।

তার আহ্বানই আপাততঃ হয়ে ওঠে প্রবল।···আর, নিরুপায়ও তো সুকুমার; যখন সে কর্তব্যের সঙ্কল্প নিয়ে পা বাড়িয়েছিল ঠিক সেই লগ্নটিতে, পুরাতনের পথ যেন রুদ্ধ করেই ভগবান যে রহস্যের আকারে এই কঠিন কর্তব্য তার হাতের কাছে এনে দিলেন, এর অমর্যাদাই বা কি ব'লে করে সে?

টেলিফোন কবার মতো চিন্তাও আপাতত রইল বন্ধ। অবস্থাই ঠেলে নিয়ে চলল ওর জীবনকে।

উত্তবেব দিকে মুখ করে বসেছিল, একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দে ফিরে দেখে সরমা কখন এসে পেছনটিতে দাঁড়িয়েছে। পূর্বাকাশে উষার আলোও একটু একটু দিয়েছে দেখা।

বললে—"হচ্ছে না ঘুম।"

উত্তর হোল—"হবার কথা তো নয়, চেষ্টা করতে বলেছিলাম মাত্র। বসুন ঐ পাথরটার ওপর।"

একটু চুপ করে বসে বইল, তাব কারণ সমস্ত মন দিয়ে অনুভব করছে নূতন জীবনটাই হোল যেন আরম্ভ এই নব প্রভাত থেকেই। সব কিছুই হয়ে উঠছে অপরূপ—আকাশ, পাহাড, অনাবিষ্কৃত এই বনভূমি, ঐ রকমই অনাবিষ্কৃত সামনের এই নারীমূর্তি···

সরমা গিয়ে সামনে একটা পাথরের ওপর বসল, পূর্বমুখী হয়ে। সুকুমার একটু পরে বললে—"সকাল হয়ে আসছে, একটা কিছু ঠিক করে ফেলতে হবে তো? খানিকক্ষণ পরে রিলিফ ট্রেণটা ফিরবে। স্টেশনে ফিবে যাই, তাবপর সেখান থেকে কলকাতা, কি বলেন?"

সবমা স্থিরভাবে কথাগুলো বোঝবার চেষ্টা ক'রে ক'রে শুনছিল, আয়াসে বড বড় চোখ দুটি একটু কুঁচকে গিয়েছে; প্রশ্ন করলে—"সে কোথায়?"

সুকুমার স্তম্ভিত হয়ে একটু চেয়ে বইল। অবশ্য কলকাতা যাওয়া চলবে না; সরমার মন বোঝবার জন্যেই কথাটা বলেছিল, কিন্তু মুছে যাওয়া মানে এমনভাবে যে মুছে যাওয়া সে ভাবতে পারেনি। একটা ভয়ও হোল—নবজাত শিশুর মতোই একে একেবারে গোড়া থেকে আবার সব শিখতে হবে নাকি? সেইটে পরীক্ষা করবার জন্য একটু বিস্তারিত ভাবে বললে—"কলকাতা শহর—যেখান থেকে আমরা আসছি। গঙ্গার এ-পারে হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়িটা ছাড়ল তো কাল রাত্তিরে, তারপর এখানে এসেই এই দুর্ঘটনা, মনে পড়ছে?"

সরমা সেইরকম বিহ্বল ভাবেই একটু চেয়ে রইল, তারপর বাঁ-হাতটা কপালে

চেপে ওপরে তুলতে তুলতে বলল—"একটু একটু মনে পড়ছে যেন, আর এটা তো রাত্তিরেই দেখলাম—ছিলামও গাড়িটাতে।"

"চলুন সেখানে।"

"কেন ?"

"আপনার যাঁরা আছেন, খুঁজে বের করতে হবে তো ?"

"কারা আছেন ?"

সুকুমার বুঝলে নিজের জীবনকে কেন্দ্র করে যেটুকু—সেইটুকুই গেছে শুধু বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে, আর সবের সম্বন্ধে একটা আবছায়া গোছের ধারণা আছে, না হলে তো কথাবার্তাই বুঝতে পারত না। যাক্ মনস্তত্ত্বের এ জটিলতা পরে উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা করবে, এখন বর্তমান নিয়েই পড়ল সুকুমার-

"আমি হচ্ছি একা মানুষ···মুস্কিল ঐখানে।"

"কিসের মুস্কিল ?"

খানিকটা স্পষ্ট করতে হোল—

"আপনি মেয়েছেলে তাই কোন স্ত্রীলোক আমার বাড়িতে থাকলে সুবিধে হোত।"

এবার অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সরমা। শান্ত, একেবারেই অসঙ্কোচ দৃষ্টি, তার ওপর নূতন প্রভাতের আলো এসে পড়েছে; এত মুক্ত, এত নিষ্কলঙ্ক আর কিছু দেখেনি জীবনে সুকুমার, তারও চেয়ে থাকতে দৃষ্টি একটু কুণ্ঠিত হ'ল না। একটু পরে, যেন সুদূরতম স্মৃতি থেকে সামান্য কিছু সংগ্রহ করতে পারবার পর সরমা বললে—"না হয় কাউকে রেখে নেবেন - কোনও মেয়েছেলে··· তদ্দিন ··"

"তদ্দিন মানে ?"

"আমি কাজ জানি।"

"পড়াশোনা আছে ? · কতদূর ?"

আবার দৃষ্টি স্থির হয়ে মুখের ওপর এসে পড়ল। এমন সময় রেলে আবার একটা মৃদু সন-সন আওয়াজ উঠল। হণ্টম্যান এসে বললে—"মোটরট্রলি আসছে

বাবু, ডিরেলের তরফ থেকে ; জগ্‌হ আছে, সাহেবকে বলিয়ে দেখবেন টিশনে নিয়ে যেতে ?"

ট্রলিটা এসে পড়ল। একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, সঙ্গে হাপপ্যাণ্ট আর টুপি পরা একজন দেশীয় সহকারী। সুকুমার তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে রেলের মাঝখানেই হাত তুলে দাঁড়াল মনের উত্তেজনায়।

সঙ্গে স্ত্রীলোক, সুতরাং জায়গা পাওয়া গেল।

চার

সমস্ত পথের মধ্যে কথাবর্তা হোল খুব কমই, সবাই নিজের মনের চিন্তা নিয়ে রইল। সরমার চিন্তার কথা সেই জানে, সুকুমার ভাবছে কোথায় গিয়ে তাদের এই নূতন জীবন আরম্ভ করবে। কলকাতা বন্ধ, বাংলা বা বিহার-যুক্তপ্রদেশের কোন শহর সম্বন্ধেও সেই কথা, কতদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে ? বিশেষ করে ইচ্ছা যখন—কর্মের মধ্যে দিয়ে নবভাবে জীবনটাকে গড়ে তুলি, গায়ে ছাই মেখে বৃক্ষতল আশ্রয় করা নয়তো। বাকি থাকে একেবারে বহু—বহুদূরে কোথাও গিয়ে গোড়াপত্তন করা—তা সে কোথায় ? কি ভাবে ? চিন্তার মধ্যে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা যদি বা পায় দেখতে তো সঙ্গের সাথীর ছায়াটুকু এসে পড়ে তার ওপর, চিন্তা এগোয় না।

ঝাঝায় যখন পৌছুল, বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। ট্রলি এই পর্যন্তই ; ওরা নেমে ওয়েটিংরুমে চলে গেল। কৌতূহলীর দল তখনও খুব বেশি পুষ্ট হয়নি, যারা জুটেছিল দরজা বন্ধ করে—সুকুমার বাইরে এসেই তাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করলে। সরমাকে মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে ইজিচেয়ারে একটু বিশ্রাম করতে বলে স্টেশন মাস্টারের ঘরে গেল, খবর পেলে কলকাতার দিকে যাবার রাস্তা তো বন্ধই, পশ্চিমে যাবার গাড়িও আপাতত কোন নেই, রিলিফ ট্রেণ যেখানা ঘটনা স্থলে

গেছে সেখানা ফিরলে তবে ওদিকে যাওয়া যাবে। ট্রলি করে ওভারসিয়ার যিনি ফিরে এসেছেন তাঁর রিপোর্ট রিলিফ ট্রেণ ফিরতে এখনও অন্তত ঘণ্টা চার দেরি, তার মানে বেলা দশটার এদিকে নয়। স্থকুমার ত্বর্ঘটনার মধ্যে থেকেই এসেছে জেনে কিছু প্রশ্নাদি করবার পর জিজ্ঞাসা করলেন—কিছু সাহায্য করতে পারেন কিনা। সাহায্য মানেই খানিকটা জানাজানি হওয়া, যা চায় না স্থকুমার। ধন্যবাদ জানিয়ে বললে—একেবারে পিছনের গাড়িতে থাকায় তারা ত্বজনে সম্পূর্ণ অক্ষতই আছে, ক্ষতিও বিশেষ কিছু হয়নি, তবে তার সঙ্গের আত্মীয়া মহিলাটির একটু আরাম প্রয়োজন, মহিলাদের ওয়েটিং-রুমটি যদি একেবারেই তাদের ত্বজনকে ছেড়ে দেবার হুকুম দেন স্টেশনমাস্টার, তো বিশেষ উপকার হয়। তারপর কিউলের দিকে যাবার একটু ব্যবস্থা। রিলিফ ট্রেণের অত বিলম্ব, তাও অনিশ্চিত, ওদিকে জামালপুরে তার বিশেষ এক প্রয়োজন রয়েছে।

খালাসিকে ডেকে স্টেশনমাস্টার মহিলাদের ওয়েটিংরুমের চাবিটাই স্থকুমারের হাতে দিয়ে দিলেন, যাবার সময় সে যেন শুধু মনে করে দিয়ে যায়। কিউলে যাবার কিন্তু কোন বন্দোবস্তই চোখে পড়ে না, সবই এখন ওলট-পালট, রিলিফ ট্রেণ না আসা পর্যন্ত কোন উপায় নেই। ইতিমধ্যে অন্য কোন রকম দরকার পড়লে স্থকুমার যেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জানায়; কোন বাঙালী পরিবারের সাহায্যও যদি দরকার হয় তারও ব্যবস্থা হ'তে পারে।

স্থকুমারের ঐটেই ভয়। বললে—"অনুগ্রহ করে ঐদিকটাই একটু নজর রাখবেন, বাঙালী একজন বিপর্যস্ত হয়ে স্টেশনে আশ্রয় নিয়েছে কেউ যেন না টের পায়, তাহলে রেল কলোনির বাঙালী অধিবাসীদের সহানুভূতিই একটা অত্যাচার হয়ে দাঁড়াবে। আমরা খানিকটা আরাম করে রিলিফ ট্রেণেই ফিরে যাব।"

বিপদের গুরুত্বটা হাল্কা করে ফেলবার জন্যে একটু হেসে বললে—"জীবনই যাচ্ছিল, না হয় দেরির জন্যে কাজের একটু ক্ষতি হবে, তবু লাভেই থাকব মোটের উপর।"

কথাগুলো বলে বেরিয়ে আসবে, একটি ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে এসে দরজায়

দাঁড়িয়ে স্টেশন মাস্টারকে ইংরাজীতে প্রশ্ন করলেন—"ভেতরে আসতে পারিকি ?"

উত্তর হোল—"আসুন।"

বেশ দীর্ঘ গঠন সুপুরুষ। দোরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে থাকার জন্য সুকুমারকে থেমে যেতে হল। ভদ্রলোক ভেতরে আসতে আসতে স্টেশন মাস্টারকে বললেন—"আমি একটা বিষম বিপদে পড়েছি, আপনি যদি কোন সাহায্য করতে পারেন..."

দরজা খালি পেয়ে সুকুমার একপা বাড়িয়েছিল, আপনি আপনিই থেমে গেল, অনুচিত হ'ল জেনেও।

•স্টেশন মাস্টার প্রশ্ন করলেন —"বিপদটা কি ?"

"আমার স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন ··হয়ে পডছেন ঘন ঘন, সকাল থেকে এই চারবার হ'ল—আমরা ওয়েটিংরুমে রয়েছি।"

সুকুমার ঘাড় ফিরিয়েছে ; স্টেশন মাস্টাব একবার তার দিকে চেয়ে নিয়ে ভদ্রলোককেই প্রশ্ন করলেন—"কোন্ ওয়েটিংরুমে ?"

"বেটা ছেলেদের ··এই আমার কার্ড···ব্যাপারখানা হচ্ছে, যে ট্রেনটা ডিরেল হয়েছে তাইতে আমাদের ছেলে /আসছিল···কিছুদিন হ'ল নতুন বিবাহ হয়েছে, তার স্ত্রীকে নিয়েই আসছিল · আমরা তাদের নিয়ে যাব, আমার স্ত্রী আর আমি সকালে এসে পৌচেছি স্টেশনে, এসেই খবর পেলাম ডিরেলমেণ্ট হয়েছে·· তারপর থেকেই তাঁকে নিয়ে এই উল্টো বিপদ।···"

কার্ডটা দেখেই স্টেশন মাস্টার বসতে অনুরোধ করেন, মনের উদ্বেগের জন্য ভদ্রলোক না বসায় নিজেই দাঁড়িয়ে উঠেছেন, কথাগুলা শুনে একটু এগিয়ে বললেন —"হাঁসপাতালের ডক্তার···আসুন, তাঁকে ডেকে পাঠাচ্ছি···"

"তাঁর খোঁজ আগেই নিয়েছি···সঙ্গে লোক আছে আমার তিনি নেই, এক্সিডেণ্টের জায়গায়···"

"ও, হ্যাঁ, খেয়াল ছিলনা, তিনি তো সেখানেই গেছেন, কম্পাউণ্ডার সুদ্ধ্যু.... তাহলে ?"

সুকুমার এগিয়ে এল, বললে—"আমি হচ্ছি ডাক্তার, কিন্তু ওষুধপত্র তো চাই

অবশ্য ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু তবুও দু'একটা ওষুধ হলে ভালো হোত··· দরকার···"

ভদ্রলোক এগিয়ে এসে দুহাতে স্থকুমারের ডান হাতটা ধরে ফেললেন, বললেন —"আপনি চলুন, ওষুধ না পেলেও অনেকটা সাহস পাব।···মুখে জল ছিটিয়ে হাওয়া করে বার তিন সজ্ঞান করে তুলেছি, এবারেও তাই করতে বলে আমি চলে এসেছি···আপনি চলুন, শীগগির "

একরকম টেনেই নিয়ে যাচ্ছিলেন, স্থকুমার ঘুরে স্টেশন মাস্টারকে বললে— "আপনাদের তো ফার্স্ট এডের (First Aid) বাক্স থাকা সম্ভব স্টেশনে ?"

"আছে।"

"সেইটে পাঠিয়ে দিন ওয়েটিংরুমে, আমি এগুচ্ছি।"

একেবারে চৈতন্য না হলেও ভদ্রমহিলার চোখের পাতা একটু একটু কাঁপতে আরম্ভ করেছে, এরা গিয়ে উপস্থিত হ'ল। ফার্স্ট এডের বাক্সটাও এসে পড়ল, দু'একটা ওষুধ বেছে নিয়ে স্থকুমার অচিরেই চাঙ্গা করে তুললে। স্টেশন মাস্টার বাইরে অপেক্ষা করছিলেন, খবরটা পেয়ে চলে গেলেন। স্থকুমারও বেরিয়ে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক অনুরোধ করলেন—"আপনি অনুগ্রহ করে বস্থন, তাহলে একটু সাহস পাই।"

খুবই যে সম্ভ্রান্ত পরিবার তার পরিচয় রয়েছে, তার ওপর অ-বাঙালী, সম্ভবত বেহারীই, স্থকুমার কুণ্ঠিতভাবে বললে—"বাইরে—দরজার পাশেই অপেক্ষা করছি আমি···"

"আপনার সঙ্কোচের কারণ বুঝেছি, কিন্তু একেবারেই তার দরকার নেই ! আমাদের মোটে পর্দার বালাই নেই, তা ভিন্ন আপনি তো ডাক্তারই ; তারও ওপর একটা কথা, আমিও একটু সঙ্গ চাই, মনটা বড অস্থির হয়ে রয়েছে—বুঝতেই পারেন।"

বসেই রইল স্থকুমার, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজের মনে কি ভাবতে লাগল, বোধ হয় দুর্ঘটনার প্রসঙ্গটা তুলে কোনও ভরসার কথা বলতে পারে কিনা—ঠিক হবে কিনা বলা। তার আগে ভদ্রলোক নিজেই কথা পাড়লেন, বোধহয় আলাপ জুড়ে

দিয়ে ধরে রাখবার জন্যই ; প্রশ্ন করলেন—"তা আপনি কোথা থেকে এসে পড়লেন এখানে?—আমাদের কাছে তো ঈশ্বর-প্রেরিত বলেই মনে হচ্ছে।"

একবার মনে হ'ল লুকোয কথাটা. রোগীনীর কাছে দুর্ঘটনাব প্রসঙ্গ তোলা হবে না ঠিক, তাব পরেই কিন্তু খেয়াল হ'ল একজন সেখান থেকে বেঁচে এসেছে প্রত্যক্ষ করলে ফলটা ভালোই হবে। বললে—"আমি ঐখান থেকেই আসছি।"

ঘরটার মধ্যে হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল ; ভদ্রলোক তো সচকিত হয়ে উঠলেনই, তাঁর স্ত্রী বেঞ্চে শুয়ে ছিলেন, তিনিও ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে পড়বার চেষ্টা করলেন। সুকুমার উদ্বিগ্ন ভাবে ভদ্রলোককেই বললে—"ওঁকে শুয়েই থাকতে বলুন। ভয়ের তেমন কিছু নেই, এই দেখুন না, আমিই তো বেরিয়ে এসেছি—একেবারে অক্ষত—সুতরাং..."

এমন একটা সকরুণ বিশ্বাস আর আশা ফুটে উঠেছে দুজনার দৃষ্টিতে যে সুকুমারকে যেতেই হ'ল থেমে। সঙ্গে সঙ্গেই আর আর একটা কথা মনে পড়ে গেল, বললে—"তাঁরা নিশ্চয় সেকেণ্ড ও ফার্স্ট ক্লাসে ছিলেন?"

"ফার্স্ট ক্লাসে।"

"তাহলে তো···আমিও ছিলাম সেকেণ্ড ক্লাসে—পাশেই···"

আটকে যাচ্ছে কথাগুলা, ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাস বগির চেহারাটা পড়ছে মনে—সেকেণ্ড ক্লাসে ছ'জনার মধ্যে সে একলা পেলে নিষ্কৃতি।··এখনই রিলিফ ট্রেণ এসে পড়লে যে-সত্য নিজের নগ্নতায় প্রকাশ হয়ে পড়বে, এইটুকুর জন্য তাকে ঢেকে রাখতে কেমন যেন সায় দিচ্ছেনা মন। একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে সুকুমার চুপ করে গেল. বিষয়ান্তরে প্রবেশ করবার পথ খুঁজতে লাগল।

ওদিকেও ভদ্রলোক অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন, শেষে কথা কইলেন ভদ্রমহিলাই, অবশ ক্লান্ত কণ্ঠে ; দৃষ্টিতে কোন রকমে একটু আশা ফুটিয়ে স্বামীকে বললেন—"ওঁকে সেই কথাটা বলো না—যে ওরা একেবারে···"

স্বামী কথাটা লুফে নিলেন, বললেন—"হ্যাঁ ঠিক কথা, ওদের যাবার কথা ছিল সোজা পাটনায়, আমরা এখানে নামিয়ে নিতে এসেছিলাম কোন কারণে। তার

মানে তারা একেবারে শেষের গাড়িতে ছিল—পাটনার জন্যে একখানা ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাস বগি জুড়ে দেয় এই গাড়িটাতে…”

দুজনে সামনা সামনি হয়ে দুখানা ইজি-চেয়ারে বসেছিল, পাশের বেঞ্চে ভদ্র মহিলা। সুকুমারের মুখটা দীপ্ত হয়ে উঠেছে। ডাক্তার, অনেক আশা-আশ্বাসের কথা বলেছে, কিন্তু এত আনন্দ কখনও পায়নি, সোজা হয়ে আনন্দের আতিশয্যেই ভদ্রলোকের একটা হাত ধরে বললে—“আপনারা নিশ্চিন্ত হোন, শেষের দুখানা গাড়ি যে একেবারে খাড়া দাঁড়িয়েছিল লাইনের ওপর—একথা আমি শপথ নিয়ে ব'লতে পারি।”

ভদ্রমহিলার দিকেও চেয়ে বললে—“কোন কারণ নেই ভয়ের, একটু ধৈর্য্য ধরে রিলিফ ট্রেনটার জন্যে অপেক্ষা করুন।”

দুশ্চিন্তার বাতাসটা একেবারেই গেল কেটে। এর পর পূর্ণ স্বচ্ছন্দতার মধ্যেই আলাপ জমে উঠল, পরিচয় হোল ভদ্রলোকের নাম বীরেন্দ্র সিংহ, বললেন এই জেলাতেই কিছু জমিদারী আছে। কথাবার্তার মধ্যেই সুকুমার টের পেলে বেশ শিক্ষিত এবং মার্জিত রুচিসম্পন্ন, যদিও শিক্ষা কতদূর কি বৃত্তান্ত নিজের মুখে তো একবারও বললেনই না, বরং বেশ একটি সূক্ষ্ম আবরণের আড়ালে সেটা বরাবর গোপন করেই গেলেন। প্রসঙ্গক্রমে শুধু একবার বললেন যে বাংলা বই তিনি অনেক পড়েছেন—বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—আরও অনেকের এবং বাংলা ভাষার অনুরাগী। কথাবার্তার মধ্যে কখন্ স্ত্রীও উঠে বসেছেন, মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলে যোগ দিতে লাগলেন ; যেমন অযথা আড়ষ্ট ভাবও নেই, তেমনি বাচালতাও নেই মোটেই, নূতন পরিচিতের কাছে এমন সামঞ্জস্য রক্ষা করে কথাবার্তা বাঙালী মেয়ের মধ্যেও কম দেখেছে সুকুমার। তবে মাঝে মাঝে বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন, মা-হিসাবে দুর্ভাবনাটা একেবারে কাটিয়ে ওঠা নিশ্চয় সম্ভবপর হচ্ছিল না।

ওঁদের সঙ্গে একজন বৃদ্ধ চাকর আর শফারটা। শফার বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল, স্ত্রী বেশ সুস্থ হয়ে উঠলে বীরেন্দ্র সিং চাকরটাকেও বাইরে যেতে বললেন।

সুকুমার নিজের পরিচয়টা ঠিক দিলে না, লুকুলে ; আগাগোড়াই একটা মনগড়া

কাহিনী বলে গেল, নাম ধাম সব কিছু নিয়েই। সরমাকেও বাদ দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলে না। মনে করেছিল পাশের ওয়েটিংরুমে ঘুমুচ্ছে, ওর প্রসঙ্গ এনে ফেলার দরকার নেই। ঘুমুচ্ছিলই সরমা, তারপর কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ দরজা দিয়ে বাইরে নজর পড়ায় স্থকুমার দেখে হন হন ক'রে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, গতিতে যেন চরম উদ্বেগ মাখানো। মুহূর্ত খানেকের দ্বিধা, তারপরই স্থকুমার উঠে দাঁড়াল, যতটা পারলে সহজভাব ধ'রে রাখবাব চেষ্টা ক'রে বললে—"মাফ করবেন, আমি এক্ষুণি আসছি।"

দরজাটি ভালো করে ভেজিয়ে চলে গেল।

অতিরিক্ত ক্লান্তিতে সরমার চোখ বুজে এসেছিল বটে কিন্তু ঘুমুতে পারেনি, যে কারণে হন্টের মধ্যেও তাব ঘুম হয়নি ; অর্থাৎ বিপদের মধ্যে এই অবলম্বনটি হারাবাব ভয়। খুঁজে বেড়াচ্ছিল স্থকুমারকে, তাকে আবার বুঝিয়ে-স্থঝিয়ে ফিরে আসতে মিনিট কয়েক লেগে গেল।

বীরেন্দ্র সিং একটু কুণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করলেন—"একটু যেন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন ডাক্তারবাবু··"

"না, বিশেষ কিছু নয়।"

মুগ্ধ হোল ওঁর সীমাজ্ঞানে, গোপন কবছে দেখে আব কোন প্রশ্ন করলেন না।

তবে গোপন রইল না কথাটা ; একটা স্থযোগ সমস্যা হয়েই দেখা দিল, তাহাতেই সব প্রকাশ করে ফেলতে হ'ল।

বীরেন্দ্র সিং অনুরোধ করে বসলেন স্থকুমারকে— তাঁদের সঙ্গে যেতে হবে।

তাঁর অনেক বিপদ ; দীর্ঘপথ, স্ত্রী বাব চারেক অচেতন হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছেন, তারপর ঈশ্বর না করুন তাঁদেব ছেলে-বৌয়েব যদি কোন বকম আঘাত লেগে থাকে তো একজন ডাক্তার সঙ্গে থাকা তো খুবই প্রয়োজন। আরও একটা আশঙ্কা ছিল সেটার উল্লেখ না করে শঙ্কিত নীরব দৃষ্টিতে বুঝিয়ে দিলেন বীরেন্দ্র সিং, অর্থাৎ ভবিষ্যতের গর্ভে কী আছে কে জানে? এখন সবটাই তো মাত্র একটা আশা।

একটু জোরের সঙ্গেই অনুরোধ করলেন, স্থকুমার যা ফি চায় দেবেন তিনি। ভগবানের দানের মতো এমন হাতের মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দেবেন না স্থকুমারকে।

মানে তারা একেবারে শেষের গাড়িতে ছিল—পাটনার জন্যে একখানা ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাস বগি জুড়ে দেয় এই গাড়িটাতে…”

দুজনে সামনা সামনি হয়ে দুখানা ইজি-চেয়ারে বসেছিল, পাশের বেঞ্চে ভদ্র মহিলা। সুকুমারের মুখটা দীপ্ত হয়ে উঠেছে। ডাক্তার, অনেক আশা-আশ্বাসের কথা বলেছে, কিন্তু এত আনন্দ কখনও পায়নি, সোজা হয়ে আনন্দের আতিশয্যেই ভদ্রলোকের একটা হাত ধরে বললে—“আপনারা নিশ্চিন্ত হোন, শেষের দুখানা গাড়ি যে একেবারে খাড়া দাঁড়িয়েছিল লাইনের ওপর—একথা আমি শপথ নিয়ে ব'লতে পারি।”

ভদ্রমহিলার দিকেও চেয়ে বললে—“কোন কারণ নেই ভয়ের, একটু ধৈর্য্য ধরে রিলিফ ট্রেনটার জন্যে অপেক্ষা করুন।”

দুশ্চিন্তার বাতাসটা একেবারেই গেল কেটে। এর পর পূর্ণ স্বচ্ছন্দতার মধ্যেই আলাপ জমে উঠল, পরিচয় হোল ভদ্রলোকের নাম বীরেন্দ্র সিংহ, বললেন এই জেলাতেই কিছু জমিদারী আছে। কথাবার্তার মধ্যেই সুকুমার টের পেলে বেশ শিক্ষিত এবং মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন, যদিও শিক্ষা কতদূর কি বৃত্তান্ত নিজের মুখে তো একবারও বললেনই না, বরং বেশ একটি সূক্ষ্ম আবরণের আড়ালে সেটা বরাবর গোপন করেই গেলেন। প্রসঙ্গক্রমে শুধু একবার বললেন যে বাংলা বই তিনি অনেক পড়েছেন—বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—আরও অনেকের এবং বাংলা ভাষার অনুরাগী। কথাবার্তার মধ্যে কখন্ স্ত্রীও উঠে বসেছেন, মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলে যোগ দিতে লাগলেন ; যেমন অযথা আড়ষ্ট ভাবও নেই, তেমনি বাচালতাও নেই মোটেই, নূতন পরিচিতের কাছে এমন সামঞ্জস্য রক্ষা করে কথাবার্তা বাঙালী মেয়ের মধ্যেও কম দেখেছে সুকুমার। তবে মাঝে মাঝে বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন, মা-হিসাবে দুর্ভাবনাটা একেবারে কাটিয়ে ওঠা নিশ্চয় সম্ভবপর হচ্ছিল না।

ওঁদের সঙ্গে একজন বৃদ্ধ চাকর আর শফারটা। শফার বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল, স্ত্রী বেশ সুস্থ হয়ে উঠলে বীরেন্দ্র সিং চাকরটাকেও বাইরে যেতে বললেন।

সুকুমার নিজের পরিচয়টা ঠিক দিলে না, লুকুলে ; আগাগোড়াই একটা মনগড়া

কাহিনী বলে গেল, নাম ধাম সব কিছু নিয়েই। সরমাকেও বাদ দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলে না। মনে করেছিল পাশের ওয়েটিংরুমে ঘুমুচ্ছে, ওর প্রসঙ্গ এনে ফেলার দরকার নেই। ঘুমুচ্ছিলই সরমা, তারপর কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ দরজা দিয়ে বাইরে নজর পড়ায় সুকুমার দেখে হন হন ক'রে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, গতিতে যেন চরম উদ্বেগ মাখানো। মুহূর্ত খানেকের দ্বিধা, তারপরই সুকুমার উঠে দাঁড়াল, যতটা পারলে সহজভাব ধ'রে রাখবার চেষ্টা ক'রে বললে—"মাফ করবেন, আমি এক্ষুণি আসছি।"

দরজাটি ভালো করে ভেজিয়ে চলে গেল।

অতিবিক্ত ক্লান্তিতে সরমার চোখ বুজে এসেছিল বটে কিন্তু ঘুমুতে পারেনি, যে কাবণে হল্টের মধ্যেও তাব ঘুম হয়নি ; অর্থাৎ বিপদের মধ্যে এই অবলম্বনটি হারাবাব ভয়। খুঁজে বেড়াচ্ছিল সুকুমারকে, তাকে আবার বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরে আসতে মিনিট কয়েক লেগে গেল।

বীরেন্দ্র সিং একটু কুণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করলেন—"একটু যেন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন ডাক্তারবাবু··"

"না, বিশেষ কিছু নয়।"

মুগ্ধ হোল ওঁর সীমাজ্ঞানে, গোপন করছে দেখে আব কোন প্রশ্ন করলেন না।

তবে গোপন রইল না কথাটা ; একটা সুযোগ সমস্যা হয়েই দেখা দিল, তাহাতেই সব প্রকাশ করে ফেলতে হ'ল।

বীরেন্দ্র সিং অনুবোধ করে বসলেন সুকুমারকে— তাঁদের সঙ্গে যেতে হবে।

তাঁর অনেক বিপদ ; দীর্ঘপথ, স্ত্রী বাব চারেক অচেতন হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছেন, তারপর ঈশ্বর না করুন তাঁদেব ছেলে-বৌয়েব যদি কোন রকম আঘাত লেগে থাকে তো একজন ডাক্তার সঙ্গে থাকা তো খুবই প্রয়োজন। আরও একটা আশঙ্কা ছিল সেটার উল্লেখ না করে শঙ্কিত নীরব দৃষ্টিতে বুঝিয়ে দিলেন বীরেন্দ্র সিং, অর্থাৎ ভবিষ্যতের গর্ভে কী আছে কে জানে ? এখন সবটাই তো মাত্র একটা আশা।

একটু জোরের সঙ্গেই অনুরোধ করলেন, সুকুমার যা ফি চায় দেবেন তিনি। ভগবানের দানের মতো এমন হাতের মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দেবেন না সুকুমারকে।

কঠিন সমস্যা, অথচ এতবড় সুযোগও আশা করে নি সুকুমার, হাতছাড়া হতে দিতে পারছে না। পরিচিত লোকের দৃষ্টি পৌঁছুবে না, নূতন জীবন সম্বন্ধে ভাববার, প্ল্যান করবার প্রচুর সময় পাবে। মাত্র সুযোগ নয়, একটা সৌভাগ্যই।

চুপ করে একটু ভাবলে, তারপর ইতিকর্তব্য ঠিক করে ফেললে। বললে—"আমার আপত্তি নেই, তবে বাধা আছে বীরেন্দ্রবাবু।"

"কি বাধা বলুন।"

"আমার স্ত্রী সঙ্গে আছেন।

"স্ত্রী !! · কৈ বলেন নি তো কথাটা !...কোথায় আছেন তিনি ?"

দুজনে জড়াজড়ি করে বললেন কথাগুলো। চাকরটা একটু চকিত হয়ে উঠল।

"বলিনি তার কারণ আছে ; আমি দুর্ঘটনায় যতটা ঠিক আছি, উনি ততটা নেই।...আছেন এই পাশেই লেডিজ ওয়েটিং রুমে..."

দুজনে অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ভদ্রমহিলা যেন তাঁকে নিয়ে আসবার জন্যই ওঠবার ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকে পড়লেন। সুকুমার বললে—"না, সেরকম ভয়ের কোন কারণ নেই, আপনারা ব্যস্ত হবেন না, তাহলে আমিই কি নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকতে পারতাম ? ওঁর বাইরে কোন আঘাতই লাগেনি, ভেতরে ভেতরে বোধ হয় ভয়ের জন্যেই একটা শক পেয়েছেন।"

"তাহলে !..."

—বীরেন্দ্র সিংই প্রশ্নটা করলেন, কথাটার মধ্যে নিজের চিন্তাও আছে, সুকুমারের স্ত্রীর বিষয়েও চিন্তা আছে।

সুকুমার বললে—"আর কিছু নয়, আপনার ওখানে গেলেই বোধহয় ওঁর পক্ষে ভালো, যদি একটু নিরিবিলির ব্যবস্থা করতে পারেন। ব্রেণের শক্, মাঝে মাঝে কথা একটু অসংলগ্ন হয়ে পড়ছে, স্মৃতিশক্তিও বেশ কাজ করছে না, অথচ আমরা যেখানে যাচ্ছিলাম সেখানে প্রশ্নে প্রশ্নে ওঁকে উদ্ব্যস্ত করে তুলবে, হাজার মানা করলেও।"

ওঁরা দুজনেই একটু যেন বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। সুকুমারই একটু থেমে বললে

—"এই জন্যেই ওঁকে আমি আপনাদেব সামনে আনিনি, বড় লজ্জিতও এর জন্যে। আমায় ক্ষমা করবেন। সবই যখন জানলেন, এবার ডেকে নিয়ে আসি।"

সরমাকে।অবস্থাটা বোঝাতে, শেখাতে-পড়াতে একটু দেরি হ'ল। পাতানো সম্বন্ধ নিয়ে একসঙ্গে থাকতে হলে এই স্বামী-স্ত্রীব সম্বন্ধটাই যে সবচেয়ে নিরাপদ— সরমা এটা শেষ পর্যন্ত বুঝলে। অন্তত কিছু বললে না বিশেষ, বেশ বোঝা গেল চারিদিক দিয়ে ভালো করে কোন একটা জিনিষ খতিয়ে দেখবার ক্ষমতাটা হারিয়েছে ; কতকটা যেন নিবিকার ভাব।

বীরেন্দ্র সিং-এব স্ত্রী এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন, একটি মৌন সকরুণ বিস্ময়ের সঙ্গে। পরিচয়ে স্বকুমাব শুধু আব একটু জুড়ে দিলে, একটু হেসে বললে—"আমরা কিন্তু ব্রাহ্ম, আধা-ক্রিশ্চান বলে অনেকে মনে করে, একেবারে অত কাছে বসালেন তাই বলছি।"

ভদ্রমহিলা এতক্ষণ অত লক্ষ্য করেন নাই, সবমার সিন্দুরহীন সিঁথির দিকে একবাব চেয়ে দেখে বললেন—"ও, তাই!...তা বেশ, ভালোই তো!"

সিঁথিটা দেখিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল স্বকুমারের ; একটা কুটিল সংশয়ের পথ বন্ধ হ'ল।

রিলিফ ট্রেণটা আন্দাজেব খানিকটা আগেই এসে পড়ল। স্বকুমারের পরামর্শে বীরেন্দ্র সিং একাই গেলেন দেখতে। কয়েকটা মিনিট তীব্র উৎকণ্ঠায় কাটল সবার, স্বকুমার ভদ্রমহিলাকে কথাবার্তায় টেনে অন্যমনস্ক রাখবার বৃথাই চেষ্টা করলে। তারপর পুত্র আব পুত্রবধূকে নিয়ে বীবেন্দ্র সিং উৎফুল্লভাবে ঘরে প্রবেশ করলেন।

পাঁচ

নিশ্চিন্তভাবে গল্পগুজব করতে করতে স্নানাহার সেরে বেরুতে দুপুর হয়ে গেল ; মোটর এসে যখন বাড়ির গেটের মধ্যে প্রবেশ করলে, তখন বেশ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। একটার পর একটা পাহাড় টপকে, কোথাও পাহাড়ের গা বেয়ে, কোথাও পাশ কাটিয়ে রাস্তা ; কোথাও ঘন বনেব মধ্যে দিয়ে, কোথাও আবার কচ্ছপের পিঠের মতো টানা মাঠ। কয়েকটা পাহাডে নদী, একটা পেরুতে হ'ল নৌকায়, বাকিগুলা পায়ের-গোছ-ডোবা ঝিরঝিরে জলের স্রোত আর বালি ঠেলে মোটর আপনিই পেরিযে গেল। সেটাকে হালকা করে দেবার জন্যে সবাই নেমে হেঁটে-হেঁটেই পার হ'ল ; মেয়েদের মধ্যে একটা ছেলেমানুষী কৌতুক-চঞ্চলতা—সরমার পর্যন্ত, বেটাছেলেরাও সেটাকে বেশ ভালোভাবে চেপে রেখে পুরাপুরি গম্ভীর হতে পারছে না।·· আমাদের বয়স্কতা প্রকৃতি-মাকে ছেড়ে থাকবার জন্যে তাঁর অভিশাপ, কাছে এসে পড়লে সেটা তিনিও যান ভুলে, আমরাও যাই ভুলে।···চমৎকার কাটল পথটা।

বাড়িব এখানটা অন্যরকম। পাহাড় শ্রেণীগুলা দূরে দূরে সরে গেছে ; আছে চারিদিকেই, তবে কোথাও মনে হয় মাইল দুয়েক দূরে, কোথাও চাবপাঁচ মাইল, কোথাও আরও বেশী,—দশ-পনেরো বা তার চেয়েও বেশি। মাঝখানে একটা বেশ বিরাট চত্তর ; একেবারে সমতল নয়, ঢেউয়ে-ঢেউয়ে কোথাও খানিকটা উঁচু, কোথাও আবার আস্তে গডিয়ে নেমে গেছে। চালের নৈবেদ্যের মতো ছাড়া ছাড়া কয়েকটা ছোট ছোট পাহাড় এখানে ওখানে ছডানো আছে ; অনেক দূরে একটির ওপর ছোট একটি মন্দির, শ্বেত পাথরের বা হয়তো শুধু চুণকাম করাই। চারিদিকের হালকা আর ঘন নীলিমার মধ্যে ঐ একটি মাত্র শ্বেত বিন্দু। সন্ধ্যার শেষ আলোটুকুতে চিক চিক করছে।

এই চত্তরের একদিকে গ্রামখানি। সন্ধ্যার ম্লান আলোয় খুব স্পষ্ট নয়, তবে

বেশ বড় বলেই মনে হয়, কোনখানে বাড়িঘর একটু ঘেঁষাঘেঁষি, কোনখানে বা ছাড়াছাড়া। বাবু বীরেন্দ্র সিং-এর বাড়িখানি গ্রাম থেকে একটু আলাদা, একটা টিলার ওপর, এখান থেকে চারিদিকে জমিটা গেছে নেমে।

হালফ্যাসানের বাড়ি, খানিকটা দোতলা, খানিকটা একতলা।

ঢালুর গা কেটে কেটে চারিদিকে বাগান, একটা আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে মোটরটা খানিকটা উঠল। তারপরই চমৎকার একটা শ্বেত পাথরের সিঁড়ি, গোটা দশবারো ধাপ; তাই বেয়ে সকলে বাড়িটাতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। ডায়নামো বসিয়ে বিজলী-বাতি আর ফ্যানের ব্যবস্থা। ভেতরে গিয়ে আসবাবপত্র দেখলেও মনে হয় ভদ্রলোক প্রকৃতই শৌখীন। স্টেশন থেকে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে পার্বত্য অঞ্চলের একেবারে মাঝখানে এই রকম একটি মুক্ত প্রাঙ্গণ আর একেবারেই আধুনিক প্রথায় সজ্জিত এই রকম একখানি বাড়ি,—স্নকুমারের পথশ্রান্ত মনে একটি যেন কল্পলোকের স্বপ্ন জাগিয়ে তুললে। একটি বিস্মিত প্রশ্ন যেন মনের মধ্যে রুণরুণ করতে লাগল—এ কোথায় এলাম···কি করেই বা?···

আয়োজন সব তোয়েরই ছিল, ক্লান্তি আর এই অভিনব পরিবেশের আচ্ছন্নতার মধ্যে, গা-হাত ধুয়ে আহারাদি সেরে সে-রাত্রির মতো বিশ্রাম করতে গেল। সরমা রইল বীরেন্দ্রবাবুর স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে।

তার পরদিন উঠতে একটু বেলা হয়ে গেল। সূর্যের আলোটা তখনও কিন্তু রাঙা, কালকের সন্ধ্যায় দেখা অবছায়া চিত্রটা সেই গোলাপী আলোয় ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। অপূর্ব! এ যেন পৃথিবীর বাইরে অন্য কোন্ এক লোক, যেদিকেই চায় চোখ ফেরাতে পারে না। দূরের কাছের পাহাড়ে, অনেক নিচে দূরের নদীটির বালুচরে, তার পাশের গ্রামখানিতে, প্রান্তরের মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি দুটো পুষ্পিত পলাশ গাছে, ঐ একই আলো কত বিচিত্র রঙের মায়া রচনা করে চলেছে! সমস্তর ওপর প্রভাতের একটি শান্ত নীরবতা,—স্নকুমারের মনে হ'ল কোন কুশলী কারিগর ধ্যানমৌন হয়ে নিজের সৃষ্টিতে রয়েছে তন্ময়। মনে হোল, গত রজনীর সেই জায়গাটিই আজ রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে চোখের সামনে—অন্ধকারের জায়গায় এসেছে দিনের আলো, অরণ্য মুছে গিয়ে এসেছে মানব

জীবনের স্পন্দন-বৈচিত্র্য, আর্তনাদের জায়গায় প্রভাতের কলকাকলি। পরশু রাতে সত্যই তার মৃত্যু হয়ে গেছে নাকি? ক্রমাগতই নূতন, ক্রমাগতই অসম্ভব,—এ কোন্ জগতে এসে পড়ল সে? কোন্ দেবতা এত মুক্ত দাক্ষিণ্যে তার প্রার্থনা করলেন পূর্ণ?

তাকে ঘর দেওয়া হয়েছে বাড়ির পূর্বদিকে। বারান্দায় পরেও খানিকটা খোলা রক, ভালো করে চারিদিকটা দেখবার জন্য বেরিয়ে খানিকটা গেছে, দেখে বীরেন্দ্র সিং এগিয়ে আসছেন এদিকে। আসতে আসতেই প্রশ্ন করলেন—"এত সকালে উঠেছেন আপনি? ভোরেই ওঠা অব্যেস নাকি?"

স্বকুমার হেসে বললে—"অতিথিকে অপ্রিয় সত্য বলবেন না স্থির করেছেন নাকি? ভোর আর কোথায়? বরং আপশোষ হচ্ছিল আপনার এখানকার ভোর দেখা হোল না। আপনি যশ দিচ্ছেন, অথচ আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না।"

বীরেন্দ্র সিংও হাসলেন, বললেন—"আপনার যশ নয়, আমার অপযশের কথা ডাক্তারবাবু; আমার এই ভোর, নিজের অভিধানের ভাষাই ব্যবহার করব তো? শুনুন, একটু চক্কর দিয়ে আসবেন জায়গাটায়? আমি সেই জন্যেই উঠে এলাম, মনে হোল জিগ্যেস করি গিয়ে ডাক্তারবাবুকে।"

"আপনি আমার জন্যে কষ্ট করলেন—একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমনো যখন অব্যেস..."

"অমন একটা ভালো অব্যেস একটা দিনে যাবার ভয় নেই। না, কথা হচ্ছে পাহাড়ে জায়গা, এখানকার সকালটা যেমন ঠাণ্ডা থাকে, রোদ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তেমনি হুহু করে তেতে ওঠে; তখন আর বেড়িয়ে আরাম হবে না।

স্বকুমার একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে—"যাবো কিনা জিগ্যেস করাই ভুল, বীরেন্দ্রবাবু, তবে আপনাকে খানিকটা অস্থবিধেয় ফেলছি..."

"আমার খানিকটা স্থবিধেই হোল ডাক্তারবাবু, চক্কর আমায় একটা দিতেই হয়, আজ বরং ঠাণ্ডা থাকতেই হবে। থাক্ সে কথা, আপনি তোয়ের হয়ে নিন্। ঘণ্টাখানেক?—কি বলেন? স্নান পর্যন্ত সেরে নেওয়াই ভালো।...আমিও তাহলে আসি তোয়ের হয়ে।"

একটা চাকর এসে সব ব্যবস্থ করে দিলে। তোয়ের হতে হতেই স্থকুমারের মনে পড়ে গেল সরমার কথা, কি করে যে ভুলে ছিল নিজেই যেন বুঝতে পারলে না। বেড়াতে তো যাচ্ছে; কিন্তু সরমার কি হবে? সরমা যে কতবড সমস্তা, চোখের আড়াল হতে সেটা আরও ভালো ভাবে উপলব্ধি করলে স্থকুমার। কাল রাত্রে অসহ্য ক্লান্তিতে মনের বোধ হয় সাড় ছিল না, তাই সরমাকে কাছ ছাড়া করেছিল, নয়তো চলে কি এক মুহূর্ত্তের জন্য ওকে চোখের আড়াল করা? ওযে কত অসহায় সে কথা নয়, যদিও সেটা একটা চিন্তার বিষয় তো বটেই, আসল কথা ওর একটা প্রশ্ন বা উত্তরের এদিক-ওদিকে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে, এত আদর অভ্যর্থনা এক মুহূর্তে যে কোথায় চলে যাবে তার কি ঠিক আছে?

ভয়ের ঢেউ যখন ভাঙতে থাকে, তখন একটার পর একটায় অভিভূত করে ফেলে। স্থকুমার চঞ্চল হয়ে উঠল, ইতিমধ্যে বেফাঁস প্রশ্ন-উত্তরের ব্যাপার কিছু হয়েই যায়নি তো। বীরেন্দ্র সিং-এর কথাবার্তায়, ব্যবহারে কোন সংশয়ের কারণ দেখা যায় না, কিন্তু কাল রাত্রি থেকে আজ সকাল পযন্ত অন্দরমহলে কি কথাবার্তা হয়েছে তিনি তো নাও জানতে পারেন। বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল।

প্রাতরাশ তুজনে একসঙ্গে বসে করলে, হলঘরের পাশে একটি স্থসজ্জিত কক্ষে। স্থকুমার অন্যমনস্ক হয়ে রইল কিন্তু বরাবর, সরমাকে ছেড়ে থাকা যে চলবে না এটা ঠিক করে ফেলেছে, কিন্তু কি ব্যবস্থাটা করবে সেইটেই মাথায় আসছে না। বীরেন্দ্র সিং ওর ভাবান্তরটাকে আহারে অরুচির লক্ষণ বলে ধরে নেওয়ায় এবং দোষটা খাদ্যেব ওপর ফেলায় ওকে খেতে হোল বেশি করে। মোটর এসে সিঁড়ির নিচে দাঁড়াল।

বারান্দা পেরিয়ে রকের শেষাশেষি এসে বীরেন্দ্র সিং দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন—"সত্যি আপনার শরীর ভালো তো? বড় বেশি অন্যমনস্ক রয়েছেন।"

স্থকুমার হাসবার চেষ্টা করে বললে—"খাওয়ার বহর দেখেও আপনার সন্দেহ যাচ্ছে না কেন?"

"খাওয়ার বহর দেখে সন্দেহটা বেড়েছে।…যদি খারাপই থাকে শরীরটা—তো না হয় অন্যসময় যাবো; ওবেলা, ঠাণ্ডা পড়লে।"

স্কুমারের একবার মনে হোল সেই ভালো ; কিন্তু যে-ব্যাপারটা আবার ঘুরে ফিরে আসবেই সে সম্বন্ধে একটা নিষ্পত্তি করে নেওয়াই ঠিক নয় কি ?—এই যে একটু দ্বিধা হোল এর মাধ্যই ওর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"বোধহয় আমার স্ত্রীও যেতে চাইতেন···মানে, তাঁর শরীরটা বিশেষ ভালো নেই তো ··বলেইছি আপনাকে···পরিষ্কার হাওয়ায় যদি একটু ঘুরে আসতেন···আমার মনে হয় ··"

—একে স্ত্রী নয় তাকে স্ত্রী বলা, তায় কারণ যা দেখালে সেটা আসল কারণ নয়, কথাগুলা জড়িয়ে যেতে লাগল।

বীরেন্দ্র সিং চাকরটাকে ডাকতে সে এসে উপস্থিত হোল, বললেন—"খবর নাও বাঙালী মাইজী যিনি এসেছেন, উঠেছেন কি না।·· ও ঠিক, উঠেছেনই তে ! তুমি শুধু খবর নিয়ে এস একটু বেড়িয়ে আসবেন কি না, আমরা যাচ্ছি—ডাক্তারবাবু, আমি···"

এর পরেই এল একটা নীরবতা। বীরেন্দ্র সিং যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন, কথাগুলা বলবার ভঙ্গিতেই বোঝা যায়। সেই জন্যই নিস্তব্ধতাটুকু আরও বেশি অস্বস্তিকর বলে বোধ হ'তে লাগল। চাকর এসে খবর দিলে—যাবেন, মিনিট দশেকের মধ্যেই আসছেন।

দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, শেষে এর অস্বস্তিটা কাটাবার জন্যেই স্কুমার বললে—"মাফ করবেন, এবার আমার রোগটা যেন আপনার ঘাড়ে চাপল —বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন।"

বীরেন্দ্র সিং একটু হাসবার চেষ্টা করে অল্প নড়ে চড়ে দাঁড়ালেন, একটা কথা বলা ঠিক হবে কিনা যেন বুঝে উঠতে পারছেন না, তারপর বলেই ফেললেন, অবশ্য একটু গৌরচন্দ্রিকা করে—

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না ডাক্তাববাবু···"

"নিঃসঙ্কোচেই করুন জিগ্যেস, কুণ্ঠিত হয়ে লজ্জা দিচ্ছেন।"

"আপনার স্ত্রীকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন, বাইরে হোক ভেতরে হোক তেমন কোন আঘাত লেগেছে কি না ?"

একটু বিরতি দিয়ে নিজেই আবার বললেন,—"এই জন্যে জিগ্যেস করছি যে

ওঁর স্মৃতি শক্তিটা খুবই একটা নাড়া খেয়েছে, আমার স্ত্রী বলছিলেন আজ সকালেই। আপনি কাল বলছিলেন ভয়ে শক লেগেছে, তাতে কি এতটা হবে?··· না, উনি খুঁচিয়ে বেশি বকাতে যান নি ওঁকে, আপনি বারণ করেছিলেন, আমিও খুব সাবধান করে দিয়েছিলাম; কিন্তু তবু কিছু না কিছু কথা হবেই তো?—কাল রাত্রেও হয়েছিল, আজও হয়েছে। আমার স্ত্রী ভোরে ওঠেন, ওঁরও শুনলাম সেই রকম অব্যেস।”

মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

সুকুমার একটু দ্বিধায় যে না পড়ল এমন নয়, সেটা কিন্তু তখনই কাটিয়ে বললে —“আপনি কথাটা জিগ্যেস করে ভালোই করেছেন বাবু বীরেন্দ্র সিং, না হ'লে আমি খুলে বলতাম না। বলতাম না এইজন্যে যে একদিনের অতিথি, আপনাদের অযথা একটা বেদনার ভাগী করি কেন?···এই রেল-দুর্ঘটনার আগের জীবনটা একেবারে গেছে মুছে আমার স্ত্রীর স্মৃতি থেকে। আঘাত বাইরে তো কিছু দেখছি না।'

“সে কি!! তাহলে···চিকিৎসার ··?”

“চিকিৎসা এব কি আমার জানা নেই; তবে কখনও কখনও দেখা যায় মস্তিষ্কের আহত কোষগুলা আপনি আপনি আবার সচেতন হয়ে ওঠে। সেই আশায় থাকতে হবে। দু'টো জিনিস দরকার—প্রথমত দেখতে হবে উনি না বুঝতে পারেন যে ওঁব এই রকম একটা রোগ হয়েছে। দ্বিতীয়ত খুব ধীরে ধীরে ওঁর অভিজ্ঞতা বাড়ানো দরকার। এখন উনি অনেক বিষয়ে একেবারে শিশু। আমি যে ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি তা এই কারণেই বীরেন্দ্রবাবু, ওঁর বিশেষ করে মানুষ আর তার জীবন পদ্ধতি দেখা দরকার। আপনাকে এতটা বলে চিন্তিত করব না বলেই কথাটা লুকিয়েছিলাম, মাফ করবেন।”

কথাগুলো বলে নিশ্চিন্ত হোল সুকুমার। ভেবে দেখলে না বলেই ভুল করছিল; সরমার বেফাঁস প্রশ্ন বা উত্তরে যে বিপদটা ছিল, এবার কেটে গেল বরং। এবার এই পরিবারটিও সরমাকে আগলে চলবে, সরমার গতিবিধি কথাবার্তাও ওরই মধ্যে অনেকটা স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠবে, যেটা নিতান্ত দরকার; চারিদিকের সবাই যদি

ক্রমাগত ওর দিকে স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তো বিপদটাকেই তুলবে বাড়িয়ে। এ ভালো হোল।

সরমা বেরিয়ে এল, বীরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। তিনি অবশ্য গেলেন না, তবে নেমে মোটর পর্যন্ত তুলে দিয়ে গেলেন।

ছয়

সরমা বেরিয়েই বীরেন্দ্র সিংকে করযোড়ে অভিবাদন করেছিল। এটা যে শুধু মিষ্ট লাগল স্বকুমারের তাই নয়, কতকটা আশ্বস্তও হোল ওর এই সামাজিক চৈতন্যটুকুতে। আরও আশ্বস্ত হোল এইজন্য যে স্বকুমারকে অভিবাদনটা করলে না, যাতে প্রমাণ হোল যে ওদের পরস্পারের মধ্যে নূতন ব্যবস্থাটা, স্বামী-স্ত্রীর অভিনয়, বেশ মনে আছে সরমার। তাহলে নূতন শেখার, নূতনকে গ্রহণ করার ক্ষমতাটা নষ্ট হয়নি একেবারে।

বীরেন্দ্র সিং শফারকে পাশে বসিয়ে নিজে মোটরের স্টিয়ারিং ধরলেন।

এটা ওঁর শালীনতা, এতে স্বকুমারের একটা বাড়তি স্থবিধে এই হোল যে সরমাকে দেখাতে-বোঝাতে পারবে। কাল স্টেশন থেকে আসতে আসতে স্বকুমারকে একটু একলা পেয়ে বীরেন্দ্র সিংযের পুত্র ও পুত্রবধূকে ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করলে—"এরা কে?"

যা স্বাভাবিক, স্বকুমার বীরেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে সম্বন্ধটাই জানিয়ে দিলে,—"ওঁর ছেলে, বৌ।"

বুঝলে কিনা ঠিক টের পাওয়া গেল না; আবার প্রশ্ন করলে—"ওরা দুজনে কে হয়?"

"স্বামী-স্ত্রী।"

একটু চুপ করলে সরমা, দ্বিধার জন্যে কি চিন্তার জন্যে সেটা বুঝা গেল না। তারপর জিগ্যেস করলে—"যা আমরা?"

"ওদের বিবাহ হয়েছে। আমাদের তো…"

এইখানেই থেমে গেল সুকুমার, হঠাৎ খেয়াল হ'ল প্রবঞ্চনার কথাটা স্পষ্ট না করাই তো নিরাপদ। কিন্তু ও যে কত অজ্ঞ, আর সেই অজ্ঞতায় শিশুর মতোই যে কত শুদ্ধ, তাই দেখে ওর মনটা স্নেহে-বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেই থেকে বুঝেছিল যে ওর কাজ কত কঠিন, সমস্যা কত জটিল।

মোটরটা নেমে চলল গ্রামের দিকে। মুরামের বেশ চওড়া রাস্তা, গ্রাম হিসাবে বেশ পরিষ্কার। প্রথমটা এখানে-ওখানে ছড়ানো বাড়ি, তারপরেই অল্পে অল্পে সেগুলা ঘন হয়ে উঠতে লাগল। পথে-ঘাটে, মাঠে, বাড়ির উঠানে, দাওয়ায়, চলতি গাড়ি থেকে ঘরের মধ্যে যেটুকু নজর যায়—সর্বত্রই প্রভাতের নূতন জীবনের চঞ্চলতা ··ছোট মেয়েটি দুটি ভাই বোনকে নিয়ে দুটি হাত জড়ো করে একমনে ধূলার বাড়ি তুলছে···একটি বউ পিঠের ওপর একটা হাত ফেলে হেঁট হয়ে উঠানে দিচ্ছে ঝাঁট, মোটর দেখে ঘুরে সোজা হয়ে দাঁড়ালো···পাঠশালায় ছেলের পাল, গুরুমশাই আসে নি, ছাত্তরা পাখির মতো কিচির-মিচির চলছে·· মেয়েরা খালি কলসী হাতে ঝুলিয়ে নদীতে জল আনতে যাচ্ছে, মাথায় ভরা কলসী চাপিয়ে চড়াই বেয়ে উঠে আসছে ক'জন···বস্তা বোঝাই গোরুর গাড়ি যাচ্ছে, মোটরের হর্ণ শুনে গাড়োয়ান পাশ কাটিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে নিলে, রাস্তার ধারে গিয়ে একটা সসম্ভ্রম সেলাম ঠুকে বলদের রাশ টেনে দাঁড়াল···পাশের বাড়ি থেকে ঘুঁটের ওপর আগুন নিয়ে একটি আধবুড়ি গোছের স্ত্রীলোক নিজের বাড়ির আঙিনায় ঢুকল, সঙ্গে একটি ছোট ছেলে, উলঙ্গ, কোমরে শুধু একগাছা ঘুনসি, ঘাড় দোলার ভঙ্গিতে বোধ হয়, কি একটা আবদার ধরেছে। ··বসতি ঘন হয়ে উঠল, পাশাপাশি কয়েকখানা দোকান—চাল-ডাল, বেনে-মসলা, মেঠাই; তরিতরকারি আসতে আরম্ভ হয়েছে, দরদস্তুর বেচাকেনায় লোকের জটলা বেশি। দুধারে সেলাম কুড়ুতে কুড়ুতে আস্তে চলেছে মোটর।···বসতি আবার পাত্‌লা হয়ে গিয়ে দুদিকে মাঠ; কোনটা উষর, কোনটাতে ফসল দাঁড়িয়ে আছে, কোনটাতে হাল চলছে, মোটর দেখ্‌তে হালী, বলদ দুই-ই কাজ থামিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো···রাস্তা ঢালুতে নামছে, মোটরের গতি গেল বেড়ে···

স্কুমার সরমার মুখের পানে চেয়ে আছে, অবশ্য খুব সন্তর্পণে, যাতে সে বুঝতে না পারে যে লক্ষ্য করছে তাকে। মাঝে মাঝে পরিচয় দিচ্ছে—শিশুকে যেমন নাম বলে বলে পরিচয় দিতে হয় সেভাবে নয়—নিতান্তই যেন কথা কওয়ার ছলে—"ছেলেটি বোধহয় বুড়ির নাতি। আপনার কি মনে হয়? আমি বলছি আবদারেব রকম দেখে; অবশ্য ছেলেও হতে পারে, বুড়ো বয়সেব ছেলে, তাব আবদার আবার আরও ভয়ংকর, নয় কি?·· যেমন লাগিয়েছে ছেলেগুলো, কাছে পিঠে নিশ্চয় গুরুমশাই নেই; আপনার কি মনে হয়?·· আমাদেব দেশে নেয় কাঁখে কলসী, এদেশে মাথায়···রাজপুতানার দিকে কখনও গেছেন কি? এক এক জন তিন চারটে কলসী নিয়ে নেয় মাথায়, বড, তারচেয়ে ছোট, তারচেয়ে ছোট ·"

কথার মধ্যেই লক্ষ্য করে মুখের ভাব। একটা অদ্ভুত কৌতূহলের সঙ্গে আস্তে আস্তে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে সরমা, ঈষৎ কুঞ্চিত ভ্রূর নিচে চোখের কোণে ঠোঁটের কোণে খুব ক্ষীণ একটু হাসি; অন্ধকারের গায়ে প্রথম উষাব মতো বিস্মৃতির সঙ্গে একটু যেন চৈতন্যেব আভাস। সরমা একটু একটু যেন বুঝছে। হারানো জিনিস সব যেন আস্তে আস্তে ফিরে আসছে। একজন পূর্ণ যুবতীর মুখে শিশুর প্রথম জ্ঞানোন্মোষের বিস্ময়,—এমন অদ্ভুত দৃশ্য কখনও দেখেনি স্কুমার, একদিকে যেমন করুণ অন্যদিকে তেমনি অনির্বচনীয়।···মাঝে মাঝে কপালে চারটি আঙুলের ডগা চেপে বুলিয়ে নিচ্ছে, যেন কি খুঁজে পাই পাই করেও পাচ্ছে না; তেমনি এক একবার মুখটা হঠাৎ বেশি রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, যেন একটার গায়ে একটা করে এক সঙ্গে অনেকগুলো ব্যাপাব বুঝতে পেরেছে, চিনতে পেরেছে; যেন একটার পরিচয়ে আর একটা বা আর অনেক কিছু আপনিই এসে পডছে ওর কাছে। এক একবার দু' একটা কথার বেশ উত্তর দিচ্ছে; একবার কৌতুকে চোখ দুটো একটু হাসি-হাসি করে বললে—"এখানে যেন সব কিছুই একটু অন্য রকম —আপনারও তাই মনে হচ্ছে না?"

স্কুমার বললে—"হ্যাঁ, পাহাড়ে অঞ্চল তো, আর, আপনি এর আগে যা দেখেছেন···"

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই প্রশ্ন করলে—"আপনি অন্যরকম কি হিসেবে বলছেন? —মানে, কোথাকার তুলনায়?"

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল সরমা, মনে করবার চেষ্টায় কপালে আঙুল চারটে চেপে আস্তে আস্তে বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিয়ে গেল। সুকুমার অন্য কথা পাড়লে, বেশি জোর দিতে চায় না।

আর একটু এগিয়ে যেতেই ওরা একেবারে গ্রামের বাইরে এসে পড়ল। এক সমতলে বেশ অনেকখানি নিয়ে একটা ফাঁকা জায়গা। এর পরে জমিটা আবার ধীরে ধীরে উঠে গেছে, প্রায় চারিদিকেই। এই রকম অবস্থানের জন্যেই জায়গাটার মাঝখানে একটা হ্রদ সৃষ্টি হয়ে গেছে, বর্ষায় চারিদিককার জল জমে। গোটা তিনেক ছোট ছোট পাহাড়ে নদীও এসে নেমেছে হ্রদটাতে, এখন জলের চেয়ে বালির ভাগই বেশি; একটা অপেক্ষাকৃত বড় নদী হ্রদের জল নিয়ে এক দিক দিয়ে গেছে বেরিয়ে। এ সমস্তই হ্রদের সামনের অর্ধেকটায়, অর্থাৎ সুকুমারেরা যেদিকে এল তার উলটা দিকে। এদিকটায় কোন নদী নেই, বর্ষার জল নামার দরুণ মাঝে মাঝে এক আধটা খোওয়াই আছে। সব মিলিয়ে জায়গাটি বড় মনোরম; সমস্ত চত্বরটাই সুন্দর, তার মধ্যে এখানটা যেন আরও অপূর্ব।

একটি শালের বন, এইখানে এসে মোটরটা দাঁড়াল।

বীরেন্দ্র সিং নেমে বললেন—"চলুন ডাক্তারবাবু, এইবার একটু হাঁটা যাক।... আপনিও আসবেন, না, মোটরেই থাকবেন বসে।?"

একটু হেসে বললেন—"অবশ্য এ জঙ্গলে বাঘ-ভালুকের ভয় নেই, ড্রাইভারও রইল।"

সুকুমারও সরমার দিকে চাইলে। সরমা বললে—"না, আমিও যাব"

লোক লেগে রয়েছে, জঙ্গলটা পরিষ্কার করছে, আগাছা কেটে, কোথাও কোথাও গাছ কেটে—যেখানে বেশি ঘন সন্নিবিষ্ট। মাঝে মাঝে কাটা আগাছা পড়ে রয়েছে বলে এরা দৃষ্টি নিচু করেই চলছিল, জায়গাটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় সুকুমার চোখ তুলে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাত দূরে একটি ভদ্রলোক তাদেরি দিকে এগিয়ে আসছেন। বৃদ্ধ বেশ দীর্ঘ, কতকটা স্থুল দেহ,

অনাবৃত বুকের নিচে পর্যন্ত দাড়ি নেমে এসেছে, মাথার চুল ঠিক বাবরি না হলেও একটু বড। মুখে একটি প্রসন্ন হাসি নিয়ে এগিয়ে আসছেন ভদ্রলোক ; সুকুমারের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই নমস্কার করলেন, তারপর সরমাকেও। এরা দুজনে একটু অপ্রতিভভাবেই প্রত্যাভিবাদন করলে।

একটু আশ্চর্য যে হয়ে গেছে সুকুমার তার কারণ, এই আশ্রমের মতো জায়গায় নিতান্তই আশ্রম-পুরুষের মতো একজনকে হঠাৎ দেখা এভাবে। তারপর কোঁচা করে কাপড পরার ঢঙে মনে হোল যে বাঙালী।

একেবারে কাছাকাছি হোতে বীরেন্দ্র সিং পায়ে হাত দিয়ে অভিবাদন করলেন, বললেন—"আপনার স্কুলে নোতুন লোক নিয়ে এলাম স্যার।"

ভদ্রলোক একটু হাস্যের সঙ্গে বললেন—"সুখবর ; টেঁকবেন তো ?"

বীরেন্দ্র সিং একটু অপ্রতিভ হয়ে বললেন—"না, সেভাবে নিয়ে আসা নয়, উনি শুধু দেখতে এসেছেন।"

"সেকি ! লোক টেঁকা দূরের কথা, সুখবরটুকুও এক সেকেণ্ড টেঁকল না ?"—ব'লে ভদ্রলোক বেশ উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। তারপর সুকুমারের দিকে চেয়ে বললেন—"আসুন, কিছু মনে করবেন না। ফেঁদেছি তো বড় করে, কিন্তু লোক কই ? যা পাণ্ডববর্জিত দেশ বীরেন্দ্রের, কেউ থাকতেই চায় না, তাই ঐ আতঙ্কের কথাটাই সময়ে-অসময়ে বেরিয়ে পড়ে মুখ থেকে।"

সরমার দিকে চেয়ে বললেন—"এসো মা।"

ঘুরে অগ্রসর হলেন। এদিকটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, শাল বনটা নিয়েছে শাল বাগানের রূপ। ছাড়া ছাড়া গাছের ছায়ার মধ্যে এখানে ওখানে ছড়ানো কতকগুলা ঘর। এইগুলা স্কুল। এখন ক্লাস বসে নি, তবে কিছু কিছু ছেলে বেঞ্চের ওপর বসে নিজেদের সকালবেলার পড়া করছে। একটি ঘরে গুটি চার মেয়ে। খানিকটা সরে একটা একটানা চালা ঘর ; এটা বোর্ডিং। এর ঠিক উলটা দিকে আর একটা ঐরকম চালা ঘর, এটা মেয়েদের জন্যে। প্রত্যেকটির পাশে একটি ছোট চালার মধ্যে রান্না আর খাবার ঘর, ওরই মধ্যে ভাঁড়ারও। রান্না

হচ্ছে, তিন চারটি করে ছেলেমেয়ে সাহায্য করছে। সমস্ত বোর্ডিংএ ছেলেমেয়ে আছে বোধ হয় জন পঞ্চাশেক।

ভদ্রলোক গল্প করার সাথে সাথে সব দেখালেন। তারপর অন্যদিকে নিয়ে গেলেন। এখানটা শিক্ষকদের বাসা, একটু দূরে দূরে ; বাসার চারিপাশে খানিকটা করে জায়গা। খান আষ্টেক বাসার মধ্যে তিনটিতে তালা লাগানো। ভদ্রলোক সুকুমারকে দেখিয়ে হেসে বললেন—'ঐ দেখুন, যে আতঙ্কের কথা আপনাকে বলছিলুম।"

নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন। এইখানে বসে বীরেন্দ্র সিং প্রথম কালকের রেল দুর্ঘটনার কথাটা বললেন, সেই সঙ্গে সুকুমারদের পরিচয়টাও দিলেন। তারপর বিদায় নিয়ে উঠে পড়লেন, অবশ্য সবমার অসুখের কথা উল্লেখ করলেন—বললেন —"এবার এঁদের ওটাও দেখিয়ে দিগে, এখনও রোদটা সেরকম তাতে নি। আপনি স্যার একটি ছেলেকে পাঠিয়ে দেবেন ? ড্রাইভারকে বলবে, মোটরটা ঘুরিয়ে নিয়ে ওদিকে দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসবে।"

এ বনের পরে বিঘে পনর নিয়ে একটা ফাঁকা জমি, একেবারেই নিষ্পাদপ, তারপর আবার একটা শালের বন দেখা যায়। জায়গাটা পেছন দিকে একটু গড়িয়ে গেছে, তারপরেই সেই নদীটা, হ্রদ থেকে বেরিয়ে যেটা বাইরে চলে গেছে।

এসে দেখা গেল এখানটা আরও অপরূপ। দূর থেকে যেটা জঙ্গল বলে মনে হচ্ছিল সেটা আরও ভালো করে সাজানো একটা বাগানই। শালই বেশি, তবে ঢালুর দিকটা যত্ন করে লাগানো ঝাউ, ইউকালিপটাস, বট্‌লপাম—এসবেরও সারি আছে, একটা ফুলের বাগানও, গোলাপ তো আছেই, কয়েকরকম মরশুমি ফুলও ; সবচেয়ে বাহার দিয়েছে দুটো বড় বড় বোগেনভিলিয়ার ঝাড়, সবুজ ঘাসে ভরা একটা বড় বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রাশি রাশি ফাগের-রঙের ফুলে সমস্ত জায়গাটা যেন আলো করে রয়েছে।

খানিকটা দূরেই নিচে নদীটা, অল্প এঁকে বেঁকে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে একটা বড় বাঁকের পর অদৃশ্য হয়ে গেছে। বিস্তৃত বালুচরের ওপর সূর্যের কিরণ ঝিকমিক করছে, মাঝখানের নীলজলের রেখাটা, কোথাও চওড়া, কোথাও সরু, কোথাও বা

কয়েকটা ধারায় ভাগ হয়ে গেছে।…নদীটার নাম শুনলে বুলানী। ডানদিকে হ্রদটা, তারপরেই দূরে দূরে পাহাড়ের নীল রেখাগুলো—কোথাও ফিকে, কোথাও গাঢ়।…আর চোখের সামনেই ঐ বোগেনভিলিয়ার ফাগের স্তূপ দুটো।

সুকুমার এত অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে যে বীরেন্দ্র সিং যে খানিকটা এগিয়ে গেছেন সে হুঁস নেই। ঘুরে জিগ্যেস করলেন—"দাঁড়িয়ে পড়লেন যে ডাক্তারবাবু?"

সুকুমার নিজের মুগ্ধতায় একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল, সরমাও পড়েছে দাঁড়িয়ে ওর দেখাদেখি, আর দাঁড়িয়েছেও দুজনে একটা শালের ছায়ায়। এইতেই সুকুমারের একটা ভালো উত্তর জুগিয়ে গেল, বললে—"এতখানিটা খোলা জায়গার মধ্যে দিয়েই এলাম তো, সরমার বোধ হয় তাত লেগে গিয়ে থাকতে পারে রোদে!"

বীরেন্দ্র সিং অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বললেন—"সত্যিই তো! এই দেখুন, ভয়ানক অন্যায় করে ফেলেছি, ঝোঁকের ওপর আপনাদের এক সঙ্গেই সবটা দেখাতে গিয়ে। বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে। একটু বসুনই না হয় উনি ঐ পাথরের চাঁইটার ওপর, আমি হাসপাতাল থেকে একটা ছাতা জোগাড় করে নিয়ে আসছি। সত্যিই বড় ভুল হয়ে গেছে। এঃ!"

—একেবারে অস্থির হয়ে পড়লেন।

সরমা সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেল যেন,—"আমার কিছু হয় নি; আমি তো মনে করছিলাম নদীর চরে নামব; বলব আপনাদের। আমায় একেবারে বাবু করে দিয়ে উনি সেটুকু নষ্ট করে দিলেন, এইটুকুতে এমন কি রোদ লাগবে?"

একটু হেসে জোর করেই ছায়ার মধ্যে থেকে চলে এল। সুকুমারও অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে, এতটা যে চঞ্চল হয়ে পড়বেন বীরেন্দ্র সিং তা ভাবতে পারে নি। এগিয়ে এসে চলতে চলতে বললে—"তবে ঠিক আছে। চলুন, আর সত্যি রোদের তাত সেরকম হয়নি তো।"

একটু ঘুরে, বাগানটা দক্ষিণে রেখে ওরা হাসপাতালের দিকে গেল। এটা আগাগোড়া ইটের বাড়ি, পাশাপাশি চারখানা বড় বড় ঘর, দুদিকে বারান্দা,

সমস্তটা বেশ তকতকে ঝকঝকে। এটা ইন্‌ডোর, আউটডোরের জন্যে একটু সরে আর একটা ঘর।

এদের দুজনের বলা সত্ত্বেও বীরেন্দ্র সিং ভেতরে ভেতরে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাড়াতাড়ি একটু দেখিয়ে, ডাক্তার নার্স যে দু'একজনের সঙ্গে দেখা হোল তাদের পরিচয় দিয়ে নেমে এলেন ; গাড়িটা ঘুরিয়ে অন্যদিক দিয়ে নিয়ে এসেছিল, সকলে গিয়ে উঠে বসলেন।

সাত

রাত্রে আহারাদির পর দুজনে বারান্দায় বসেছিলেন। কালকের পথশ্রান্তি তো নেই-ই, দুপুরে গা ঢেলে আরামও করছেন দুজনে, সুতরাং বিছানার টান নেই, বসে বসে গল্প হচ্ছিল। প্রথমটা এলোমেলো ভাবেই হচ্ছিল, যখন যে-বিষয়টা আপনি এসে পড়ছিল তাই নিয়ে, তারপর বীরেন্দ্র সিং এক সময় হঠাৎ প্রশ্ন করে উঠলেন—"আমার স্কুল আর হাসপাতাল কেমন লাগল বলুন ডাক্তারবাবু?"

প্রশ্নের ভঙ্গির মধ্যে কোথায় কি একটু ছিল, সুকুমারের যেন মনে হোল, হঠাৎ করলেও এই প্রশ্নেই ওঁর মনটাকে এতক্ষণ পর্যন্ত যেন আলোড়িত করছিল ; উত্তর করলে—"শুধু ভালো বললে সবটা বলা হয় না, বীরেন্দ্রবাবু। আপনি যেন একটা স্বপ্নপুরীর মধ্যে রয়েছেন—যার সবই ভালো, সবই কল্যাণ। আমি অবশ্য সমস্ত জায়গাটা মিলিয়ে বলছি—শুধু হাসপাতাল বা শুধু স্কুল তো বহু জায়গায়ই আছে—আশ্রম-স্কুলও।"

বীরেন্দ্র সিংয়ের দৃষ্টিটা একটু ভাবাবিষ্ট হয়ে উঠল, বাইরের জ্যোৎস্নায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে, সুকুমারের দিকে চেয়ে বললেন—"আপনার 'স্বপ্নপুরী'র কথাটায় আমার মনে পড়ে গেল—সত্যিই আমি এখানে স্বপ্ন দেখি ডাক্তারবাবু, কিন্তু আমার স্বপ্ন মাঝে মাঝে ভেঙে যায়। এ যা স্বপ্ন, এর সাথী চাই, সেইখানেই হয়েছে আমার অভাব। একেবারে যে নেই তা বলব না, ঐ মাস্টারমশাই আছেন,

যাঁকে দেখলেন ; উনি স্বপ্নটা আমার চেয়ে আরও বেশি করেই দেখেন, উনি রয়েছেন বলেই এটুকু দাঁড়িয়েছে আর বজায় রয়েছে ; কিন্তু বয়েস হয়েছে ওঁর, মনের সঙ্গে দেহ সব সময় পাল্লা দিতে পারে না। বাকি যা সব—তারা আসছে যাচ্ছে; বিশেষ করে ডাক্তার ; প্র্যাকটিসের জায়গা নয় এতো বুঝতেই পারছেন, কাজেই তাঁদের ধরে রাখা দায়, হাসপাতালের আমার খুবই ক্ষতি হয়।

চুপ করে রইলেন ; কথাটার মধ্যে যে একটা ইঙ্গিত রয়েছে তাতেই যেন সঙ্কুচিত করে দিল খানিকটা, সুকুমার চুপ করে রইল। একটু পরে চেষ্টা করে সঙ্কোচটা কাটিয়ে উঠে বললেন—"একটা কথা ভাবছিলাম ডাক্তারবাবু, ভরসা দেন তো বলি।"

—মুখে একটু মৃদু হাসি লেগে রয়েছে। কি কথা সেটুকু আন্দাজ করতে দেরি হোল না সুকুমারের, বললে—"বলুন, অত কিন্তু হয়ে লজ্জা দিচ্ছেন।"

সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বললে—"বোধ হয় হাসপাতালে কাজ করবার কথা বলছেন···"

"হ্যাঁ, আমি অনেক ভেবেছি ডাক্তারবাবু। এর মধ্যে যে আমার নিজের স্বার্থ নেই তা বলতে পারি না, তবু বিশ্বাস করুন আপনার দিক থেকেও আমি কথাটা ভেবে দেখেছি—সেদিকে নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবেই···যখন থেকে আপনার স্ত্রীর এই অদ্ভুত অসুখটার কথা শুনলাম, আর যখন থেকে আপনি আমাদের সঙ্গে আসতে অনুগ্রহ করে রাজি হলেন।"

সুকুমার একটু অন্যমনস্ক হয়ে শুনছে। পরশু থেকে যা হচ্ছে তার পেছনে যেন একটি অদৃশ্য হস্ত কাজ করে যাচ্ছে, সেই সমস্যা টেনে আনছে আবার সেই করে দিচ্ছে সুরাহা। এতবড় একটা সুযোগ সুকুমার তো কল্পনাও করতে পারত না।

তবু সমস্যা যা নিয়ে—তা তো সঙ্গের সাথী হয়েই থাকবে। সেই কথাটা ভালো করে জানিয়ে রাখাই উচিত ; বললে—"আপনি যে এত চিন্তা করছেন আমার কথা নিয়ে, তার উপায় করেও দিতে প্রস্তুত, সেজন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ বীরেন্দ্রবাবু! কিন্তু আপনার যেমন স্বার্থের কথা বলছেন, তেমনি আমারও তো একটা স্বার্থ আছে। বরং আপনার স্বার্থ নিঃস্বার্থ, আর আমার যা স্বার্থ—এই

আমার ভালো-মন্দ, এটা আমার জীবনের একটা অঙ্গ; এই প্রতিবন্ধক সঙ্গে নিয়ে আমি পারব কি পূর্ণভাবে আপনার কাজে আত্ম-নিয়োগ করতে ?"

"এও তো আমারই স্বার্থ ডাক্তারবাবু, এঁকে আরোগ্য করে তোলা। আর সব রোগীর মতোই ইনি তো অসুস্থ হয়ে আমার আশ্রয়ে এসেছেন; না হয় হাসপাতালে নাই রইলেন। আপনি যদি আর কোনও দিকে না চেয়ে শুধু ওঁকে নিয়েই থাকেন, আমারই স্বার্থ রক্ষা হবে না কি ?"

বীরেন্দ্র সিং মুখের পানে চেয়ে একটু হাসলেন। উত্তরটা এত চতুর, তার সঙ্গে এত স্নিগ্ধভাবে মধুর যে সুকুমারও না হেসে থাকতে পারলে না; একটি সুমিষ্ট পরাজয়ের সঙ্গে সে হাসিতে আছে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা। হেসেই বললে—"বেশ, রইলাম, কিন্তু কতদিনের জন্যে বলুন ?—বাস্তবিক, চিরকালের জন্যে তো দস্তখৎ লিখে দেওয়া যায় না।"

এর উত্তরটাও বেশ চতুরতার সঙ্গেই দিলেন বীরেন্দ্রবাবু, হেসেই বললেন—"আপনার রোগী সুস্থ হয়ে উঠলেই চলে যাবেন···ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব যেন দু'দিনেই সেরে ওঠেন উনি···"

জয়-পরাজয়ে উভয়ের মুখেই হাসি বেশ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল।

আশ্রম-স্কুলে শিক্ষকদের যে ঘর খালি পড়ে ছিল, তার মধ্যে একটি বেছে নিলে সুকুমার। বীরেন্দ্র সিং তাঁর ভবনের একদিকে থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছিলেন, সুকুমার চায় তো একেবারে আলাদা করেই, সে-ই কিন্তু রাজী হোল না। তার কারণ সরমার সুস্থ হয়ে ওঠাটাও তো একটা বিপদ; হঠাৎ কোন্ সময় স্মৃতির ওপরকার কুহেলী যাবে গুটিয়ে, তার পরেই সর্বনাশ। সুকুমার অবশ্য প্রত্যাখ্যান করলে অন্য কথা বলে, এ যে—ধরণের রোগী, তাতে তার এমন স্থানেই থাকা উচিত এবং এমন অবস্থার মধ্যেও—যার সঙ্গে তাব পূর্বজীবনের, সম্পূর্ণ না হোক, তবু খানিকটা মিল আছে। কথাটা সত্য নাও হতে পারে, কিন্তু ডাক্তারের মুখ থেকে বেরোনয় বীরেন্দ্র সিং আর জিদ করতে পারলেন না। হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ডাক্তারের একটি ভালো বাসা খালি ছিল; সেটাও নিল না। অসুখের কথাটা

গোপনই রাখতে হবে, এক যা বীরেন্দ্র সিং জানলেন—সুতরাং অপর ডাক্তারের দৃষ্টি থেকে যত দূরে থাকা যায় এবং যতক্ষণ থাকা যায় ততই নিরাপদ।

যে-বাসাটা বেছে নিলে সেটি আশ্রমের হয়েও আশ্রম থেকে একটু আলাদা। তার ঠিক পিছনটিতে শালবনের খানিকটা এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে, এইটুকু আশ্রমের অন্যান্য অংশ থেকে বাসাটিকে কতকটা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, খানিকটা ঘুরে গিয়ে পৌঁছুতে হয়। সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, এখানে-ওখানে কয়েকটা শিলাস্তূপ—এসব জায়গায় যা খুব সাধারণ—তারপরেই বেশ খানিকটা নিচু ঢালুর পর বিস্তীর্ণ হ্রদটা। বাসাটা তেমন কিছু নয়, তবে জায়গাটি মনোরম, বিশেষ করে তার পক্ষে—যে মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে একটু ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে থাকতে চায়। আশ্রমেব শিক্ষক হরিশঙ্করবাবু ছিলেন একটু কবি-ভাবাপন্ন, তিনিই জায়গাটি পছন্দ করে বাসাটা করান আশ্রমের গোড়াপত্তনের সময়; তারপর একবার ছুটিতে গিয়ে কি কারণে আর ফেরেন নি।

বাসাটার একটা সুবিধে এই যে, এখানে যে থাকবে তার গায়ে পড়ে কেউ ঘনিষ্ঠতা করতে চাইবে না; ধবে নেবে লোকটা কবিই হোক মানব-বিদ্বেষী সিনিক্ই (cynic) হোক্, ভেজাল পছন্দ করে না।

রুশুই করবার জন্যে রাখলে একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক, বিলটুর-মা—এদিককার ব্রাহ্মণী, বীরেন্দ্র সিংই ব্যবস্থা করে দিলেন। দৈবও একটু অনুকূল হোল; স্ত্রীলোকটি কালা। তাকে বোঝাতে একটু বেগ পেতে হয় বটে, তবে সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বোঝবার চেষ্টা করে না, কান ঠিক থাকলে যা করতই স্ত্রীসুলভ কৌতূহল বশে। বিলটুর-মা'র শোবার ব্যবস্থা হোল সরমার ঘরে।

নির্বাচনটা যে চারিদিক দিয়েই ভালো হয়েছে—জায়গার দিক দিয়ে, আবার মানুষের দিক দিয়েও, তার প্রমাণ পাওয়া গেল, এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সরমার মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা গেল। সে এসেই নিজের ঘর-সংসার পাতার কাজে লেগে গেল, মেতে উঠল বলাই বরং আরও ঠিক হবে। এও এক আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করলে সুকুমার, নীড় রচনার সহজ প্রেরণাটা মেয়েদের মধ্যে যে এত প্রবল, তা এরকম প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে দিয়ে আর কখনও উপলব্ধি করতে পারে নি সুকুমার।

মনের মধ্যে কিসের যেন একটা জোয়ার এসে গেছে সরমার, তারই অদম্য প্রবাহে বিস্মৃতির ওদিক থেকে স্মৃতির টুকরা-টাকরাও আনছে ভাসিয়ে। ঘর সাজাবার জিনিসপত্র এখানে আব কি পাওয়া যাবে ?—বৈঠকখানার সোফা-সেটী থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘরের বঁটি পর্যন্ত সমস্তই সরববাহ হোল বীরেন্দ্র সিংয়ের বাড়ি থেকে। সেগুলো যথাস্থানে সন্নিবেশ করতে আরম্ভ করলে অবশ্য সুকুমারই, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সরমা তার পাশে এসে দাঁড়াল, ক্রমে সাহায্যও করতে আরম্ভ করলে।

এই ধরণের বিস্ময়কর ব্যাপারও ঘটতে লাগল—

বৈঠকখানাটি সাজানো হয়েছে। একটি বেশ ভালো কার্পেট, মাঝখানে মিনার কাজ-করা পিতলের টপ্ বসানো একটি ছোট গোল টেবিল ; একদিকে একটি সুদৃশ্য সোফা, বাকি তিন দিকে তিনটি কুশন-চেয়ার। পর্দা ঝোলানো হয়েছে, গোটাকতক ছবিও হয়েছে টাঙানো ; ঘরটি ফিট-ফাট।

সাজানোর মধ্যে সরমা ববাবর ছিল ; সোফাটা কোন মুখে বসানো ঠিক হবে সে-সম্বন্ধে মত দিয়েছে, কোন্ ছবিটা কোনখানে, সে সম্বন্ধেও ; উৎসাহের মুখে এমন দু'-একটা কথাও ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, যা একেবারেই আশা করা যায় না। সাজানো গোছানো সব কিন্তু যখন শেষ, চারিধারে চেয়ে চেয়ে মাঝে মাঝে ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল।

সুকুমার ওর সব গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রেখেছে, অবশ্য প্রচ্ছন্নভাবে, দেখলে কয়েকবারই ঘর থেকে বারান্দায় গিয়ে কপালে চারটি আঙুল চেপে দাঁড়িয়ে রইল, কিছু চেষ্টা করে মনে করবার হ'লে যেমন করে, তারপর আবার ঘরে এসে ঘুরে ফিরে কি যেন একটা খুঁজতে লাগল।

দরকার ব'লে চেষ্টা করতে দিলে একটু সুকুমার, তারপর বললে—"তোমার হিসেবে কিছু যেন একটা খুঁৎ রয়েছে ঘরে এখনও, ধরতে পারছ না ? আমার তো মনে হচ্ছে সব ঠিক আছে।"

সরমা আর একবার ভালো ক'রে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ওর মুখের পানে চাইল, বললে—"না, একটা কিছু খুঁৎ আছেই, আমি বের করবই, এই বলে রাখলাম।"

একটু হাসল।

সুকুমার একটু হেসে বললে—"এই নিয়ে আমাদের না হয় একটা বাজি রাখা যাক, আজ সমস্ত দিন সময়, তার মধ্যে যদি না ধরা যায় তো···"

বলতে বলতে পকেট থেকে সিগারেটের কেসটা বের করে একটা ঠোঁটে চেপে ধরেছে, সরমা উৎফুল্লভাবে বলে উঠল—"দাঁড়াও, জিৎ! পেরেছি ধরতে!···"

সঙ্গে সঙ্গেই আবার মুখের দীপ্তিটা গেল নিভে, হারানো জিনিসটা যেন বিদ্যুৎ বিকাশে একবার ঝল্‌কে উঠেই আবার গাঢ়তর অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে গেল।

সোফা-চেয়ারের চারিদিকে চোখ দুটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কি খুঁজতে লাগল আবার, দৃষ্টি বড় করুণ, তারপর কি ভেবে প্রজ্জ্বলিত সিগারেটটার দিকে চাইতে সেই দৃষ্টি আবার ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সোফার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বললে—"জিতেছি! ছোট, কাচের টপ দেওয়া টুল—তার ওপর থাকবে অ্যাশ-ট্রে—তিনটে লাগবে—সোফার দু'ধারে দুটো আর ওদিকে একটা···কেমন, ঠিক ধরি নি?"

—ব্যাপারটা খুবই সামান্য, এমন কি এই আসবাবের টুকরাটুকু খুব প্রয়োজনীয়ও নয়, আজকাল একটু বেশি চালু হয়েছে এই যা; তবু বিস্মৃত অতীত থেকে এই জিনিসটা খুঁজে বের করা নূতন ফ্যাসানের এই অসামঞ্জস্যটুকু ধরা সামান্য কথা নয় সরমার পক্ষে, তার ওপর ঐ "অ্যাশ-ট্রে" কথাটা, ঐটেই বেশি আশ্চর্যজনক বলে মনে হোল সুকুমারের, প্রশ্ন করলে—"কি রাখবার জন্যে বলছিলে?"

"অ্যাশ-ট্রে গো, অ্যাশ-ট্রে, সিগারেটের ছাই ঝাড়বার জন্যে; দরকার তোমাদের, অথচ মনে করে রাখতে হবে আমায়!···"

ষোল আনা বিজয়; তারই হাসি হাস্‌লে সরমা।

যেন এই ছিদ্র-পথেই জীবনের আরও কতগুলা বিস্মৃত জিনিস ধীরে ধীরে স্মৃতির আলোয় বেরিয়ে এল। বাসায় আসবার সপ্তাহ খানেক পরেই সরমা নিজের ঘর গুছিয়ে নিয়ে একরকম পরিপূর্ণভাবেই তার অধিষ্ঠাত্রী হয়ে বসল।

আট

অবশ্য অতীত জীবনের মূল অংশটার কিছু সন্ধান পাওয়া গেল না এখনও, তবে বর্তমানের দৈনন্দিন জীবনটা অনেক সহজ হয়ে এল, নয়তো প্রথম ভাগের মতো প্রতিপদে অক্ষর-পরিচয় করিয়ে এগুনো তো সোজা কথা নয়। নূতন কথা শেখবার, জীবনকে চারিদিক দিয়ে দেখবার একটি পরিবর্ধমান কৌতূহল ঠেলে উঠতে লাগল মনের ভেতর থেকে, অতন্দ্রভাবে ঘুরে-ফিরে, দেখে-শুনে, কাজ ক'রে, প্রশ্ন ক'রে, পরীক্ষা ক'রে সেই কৌতূহলকে চরিতার্থ ক'রে যেতে লাগল সরমা। বাড়িটি, সংসারটুকু ধীরে ধীরে একটি সুস্মিত মাধুর্যে বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল ওর চারিদিকে, পাশে রইল সুকুমার। দেখে যাচ্ছে ডাক্তারের দৃষ্টি দিয়ে; ওর সফলতার যা আনন্দ তার পাশে একটি আশা, একটি অপরিস্ফুট ভীরু বাসনাও এসে জমা হচ্ছে।

বীরেন্দ্র সিংকে বললে কথাটা দু-একদিন লক্ষ্য করবার পরই।... আশ্চর্য ব্যাপার নয়? নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই নিজের সংসার পাতবার যেই সুযোগটুকু হোল, অমনি ধীরে ধীরে হারাণো জিনিস সব যেন ফিরে আসতে লাগল স্মৃতিব মধ্যে!

বীরেন্দ্র সিং হেসে বললেন—"আপনারা ভাবেন আপনাদের হোমরা-চোমরা নামওলা ডাক্তারী ওষুধগুলোই যা-কিছু ডাক্তারবাবু, এক আধটা টোটকারও যে কী অসীম ক্ষমতা! স্বীকার তো করবেন না আপনারা।"

সুকুমার প্রায় প্রতিদিনের ইতিহাসটুকুই জানায়! অকৃত্রিম সুহৃদ, দুর্দিনে দৈবানুগ্রহের মতোই পাওয়া, জানিয়ে আনন্দ পায়, কৃতজ্ঞতায় মনটি পূর্ণ হয়ে ওঠে। আর এ আনন্দের ভাগ দেওয়ার মানুষও তো ঐ একটি এখানে। করছেনও যতদূর করা যায়, একটি মোটর সুকুমারের জন্যেই আলাদা করে দিয়েছেন। এদিকে দুবেলাই আসেন আশ্রম আর হাসপাতালের খোঁজ নিতে, অন্তত একবার আসেনই এ-বাসাতে। এরাও দুজনে যায়।

অভিজ্ঞ মানুষ, চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি আছে,—এই যে নিত্য যাওয়া-আসা, নব পরিচিতের সঙ্গে এই যে ঘনিষ্ঠতা—যার গৃহে নবপরিণীতা সুন্দরী স্ত্রী—সংসারের কাছে এর একটা কদর্থও তো দাঁড়িয়ে যায়। সেইজন্য স্বামী-স্ত্রীতে একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে নিয়েছেন এদের সঙ্গে। সরমাকে বলেন—'বিটিয়া' অর্থাৎ মেয়ে। কথাটা শুদ্ধ হিন্দী নয়, এ অঞ্চলের ঘরোয়া হিন্দী, সেই জন্যেই যেন অন্তরের সমস্ত স্নেহ-মাধুর্য ঢেলে দেওয়া থাকে তার মধ্যে। সরমাও খুঁজে পেতে এখানকার প্রতি-সম্পর্কের কথা দুটি সংগ্রহ করে নিয়েছে, আদরের সম্বোধনে বীরেন্দ্র সিংকে বলে 'বুবুয়া', ওঁর স্ত্রীকে বলে 'মৈয়া'। ··বাবা ও মা।

দিন দিন এমন হয়ে দাঁড়াচ্ছে—আগে ছিল একজন বিপন্ন আশ্রয়াগতের প্রতি অনুকম্পা, এখন যে উৎকণ্ঠিত আগ্রহে বীরেন্দ্র সিং রেল-দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে নিজের ছেলে আর পুত্রবধূর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন সেদিন, কতকটা সেই ধরণের আগ্রহ নিয়েই সরমার নিয়াময়তার দিকে আছেন চেয়ে।

একদিন এই ভাবেরই একটা কথা বেরিয়েও গেল মুখ দিয়ে। সরমার উন্নতির আলোচনাই হচ্ছিল দুজনে, বীরেন্দ্র সিংয়ের বাড়ির বারান্দাতেই; সরমা গেছে দেউড়ির ভেতরে, বীরেন্দ্র সিং একটু ম্লান হেসেই বললেন—"আমার কি আশঙ্কা জানেন ডাক্তারবাবু।—হ্যাঁ, শত আনন্দের সঙ্গে আশঙ্কাই বলব—আশঙ্কা এই যে যে-পথে অল্প অল্প করে, মাঝে মাঝে, এক আধটা পুরাণো স্মৃতির টুকরা বেরিয়ে আসছে বিটিয়ার, সেই পথে সমস্ত ওর অতীত জীবনটাই এইবার সামনে এসে দাঁড়াবে শীগ্‌গির কোন্ দিন।"

একটু বিরতি দিয়ে, আরও একটু স্পষ্টভাবে হেসে বললেন—"আমার, কোন প্রার্থনাই তাড়াতাড়ি মঞ্জুর করেন না ভগবান, সেই সাহসেই এই প্রার্থনাটা করে-ছিলাম, ডাক্তারবাবু।"

কথাটার ওপরে-ওপরে আছে হাসিই, সুকুমার উঠল হেসে; কিন্তু ভেতরে ভেতরে আছে অপরিসীম দরদ, বেদনা, তারই স্পর্শে হাসির মধ্যে দুজনেরই চোখের কোণ একটু চক্‌চক করে উঠল।

এই আন্তরিকতার স্পর্শেই সুকুমারের ঠোঁট পর্যন্ত একটা কথা ঠেলে

এসেছিল—একটা প্রতিজ্ঞা, কিন্তু কি ভেবে, চেষ্টা করেই সেটাকে কণ্ঠের নিচে নামিয়ে দিলে।

সুকুমারও এই আশঙ্কার কথাই ভাবছিল বাড়ি আসতে আসতে। যত উন্নতি হচ্ছে সরমার, এই আশঙ্কাই ধীরে ধীরে ওর মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, অবশ্য বীরেন্দ্র সিংয়ের থেকে অন্য ভাবে। সুকুমারের ভয়, সেই জীবন যেদিন সামনে এসে দাঁড়াবে, সেদিন ওরও সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে না কি?…এ-এক মহা বিক্ষোভ মনের মধ্যে—একদিকে কঠোর কর্তব্য, যাদের জিনিস তাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসা, বা সরমা যেখানে ফিরে যেতে চায় সেখানে, আর এক দিকে…

এই অন্যদিকে যা, তাকে ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে অনুভব করছে সুকুমার—জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর একটি নীরব মুহূর্তে—আতপ্ত সমীরে শালমঞ্জরীর মৃদু একটি শিহরণে, নব-বসন্তের একটি অস্ফুট নিঃশ্বাসে, দূর সৈকতে দুটি বনকপোতের সঞ্চরণে, ঘুম-ভাঙা রাতে অতি দূরাগত নাম-না-জানা কোনও একটি পাখীর ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে—কখনও কর্ম্মের মাঝে অন্যমনস্ক করে দিয়ে, কখনও আবার অলস অবসরের মধ্যে একটি অব্যক্ত বেদনার আকারে এই তো ধীর-সঞ্চারে সুকুমারের মনটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। সুকুমার একে চেনে—যুগযুগান্ত ধরে এর কাছে আর সব কিছুই পরাজিত—ধর্ম, বিবেক, কর্তব্য, ন্যায়—জগতের শ্রেষ্ঠ যা—যে-নাম নিয়েই আসুক, এর কাছে চিরদিনই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছে; চেষ্টা করেছে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে, কিন্তু সফল হয় নি।

সুকুমারও করবে চেষ্টা; সরমাকে দেবে ফিরিয়ে, নিয়ে যাবে। সেই জন্যেই তো এত দ্বন্দ্ব মনে। কিন্তু পারবে না।

তাই, বিবেক যাই বলুক, যাতে পারা-না-পারার প্রশ্নই না ওঠে সেই দিকেই প্রয়াস সুকুমারের। হয়তো মনের খুব জ্ঞাতসারে নয়, তবু ক'রে যাচ্ছে চেষ্টা। ওর ডাক্তারের মন, এই নূতন অভিজ্ঞতাও কাজে লাগছে—বুঝছে, নিবিড় মোহের মধ্যে দিয়ে যদি সরমার মনটা এই নূতন জীবনে ধরে রাখতে পারে তবে চেষ্টার অভাবেই, কৌতূহলের অভাবেই ওর মূল অতীত জীবন চিরকালের মতোই বিচ্ছি

হয়ে থাকবে এ-জীবন থেকে।· সুকুমার সেই চেষ্টাই করছে, এই জীবনটাকে হাজার রকমে মোহনীয় করে রাখবে সরমার কাছে, যাতে এর ওদিকে দৃষ্টি ফেলবার অবকাশ না হয়। জীবনে কী হারিয়ে এল ভেবে দেখবার ইচ্ছাও না হয়।··· নিরতিশয় নিষ্ঠুর ব'লে মনে হয়, একটা ক্রুব যাদুবিদ্যা যেন। কিন্তু কি করবে? ভালোবাসা যে আরও নিষ্ঠুর।

শুধু বাড়ির ছোট গণ্ডীটুকু নিয়েই নয়, দুজনে দুজনকে নিয়েই নয়, জীবনের পরিসর বাইরেও যাচ্ছে ক্রমে বেড়ে। সুকুমার হাসপাতালের কাজে ডুবে থাকে। দুদিক থেকে আরম্ভ করেছে; প্রথমত বীরেন্দ্র-সিংয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা, সরমা যতই ভালো হয়ে আসছে, সে কৃতজ্ঞতা ততই যাচ্ছে বেড়ে। অন্য দিক থেকে আছে সেবার একটা স্পৃহা। এক সময় সব ডাক্তারই এ স্বপ্নটা দেখে—ছাত্র জীবনে, তারপর জীবন সংগ্রামেব হানাহানিতে ফেলে হারিয়ে। দৃষ্টি-কোণই যায় বদলে। সুকুমারের মনে পড়ে কলকাতায় নিজের ডিস্‌পেনসাবিতে বসে রোগীর প্রত্যাশায় পথের দিকে চেয়ে চেয়ে কি মনে হ'ত···পাড়ার অন্য ডাক্তারের ওপর মনোভাবটাই বা কি ছিল। সে তো একই মিশনের সহ-যাত্রী নয়, অর্থাগমের পথে একটা অন্তরায় মাত্র। এই জন্যই, নাকি শোনা যায়, পুরাকালে চিকিৎসকদেব অর্থ নেওয়া বারণ ছিল, যেমন ছিল শিক্ষাব্রতীদের; দেশের রাজাই এঁদের অন্নবস্ত্র যোগাবার ভার নিতেন। তাই সমাজসেবার এই দুটো জিনিস চিরকালই ছিল ব্রতের আসনে প্রতিষ্ঠিত, কখনও উপজীবিকার স্তরে নামতে হয়নি।

সেই সুযোগটি বীরেন্দ্র সিং দিয়েছেন। একদিনের স্বপ্ন আরও রঙিন হয়ে ফিরে এসেছে। সেবা করে যেন আশ মেটে না। হাসপাতালে যে সব রোগী ভর্তি হয়ে আছে, নিত্য যারা আসে যায়—ইনডোর আর আউটডোরের চিকিৎসার্থী—তাদের ছাপিয়ে তার মনটা বাইরে গিয়ে পড়ে। মনের প্রসারটা দিনদিনই যাচ্ছে বেড়ে—ইচ্ছা করে বাইরে পর্যন্ত এই সেবাকেই দিই এগিয়ে, চিকিৎসাকে অর্থের গ্লানি থেকে মুক্ত করে।

এটা যে সর্বত্র সম্ভব নয় এ-যুগে, এটুকু স্বীকার করে সুকুমার—জীবনের

অন্য দিকও দেখেছে, নিতান্তই একজন আদর্শবিলাসী নয় সে। কিন্তু এখানে যখন সম্ভব, একজন যখন এর জন্যে নিজের অনেক কিছুই পণ করে বসে আছে, তখন জীবনের এ-সার্থকতা থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করে কেন?

শেষে একটি সুযোগ পাওয়া গেল, কিন্তু তার পরিণামটা ভালো হোল কি মন্দ হোল সুকুমার ঠিক বুঝতে পারলে না।

নয়

হাসপাতালে দুজন ডাক্তার, দুটি নার্স, একজন কম্পাউণ্ডার। ইনডোরে রোগীর বিছানার সংখ্যা বারোটি।

ডাক্তারদের মধ্যে একজন এম্.-বি; নাম পুরুষোত্তম সাক্সেনা। ইনিই হাসপাতালের চার্জে। অপরটি একজন বাঙালী যুবক, কলিকাতার ক্যাম্বেল-স্কুল থেকে পাশ-করা। সুকুমার নিজে একজন এম্.-বি।

সে এখানে থাকতে রাজী হলে বীরেন্দ্র সিং যখন তাকে নিয়ে গিয়ে সাক্সেনার সঙ্গে পরিচিত করে দিলেন, সে লোকটা বাইরে বাইরে বেশ অভ্যর্থনা করে নিলেও, অন্তরে বেশ সন্তুষ্ট হোল বলে মনে হোল না সুকুমারের; বীরেন্দ্র সিং অতটা লক্ষ্য করলেন কিনা বলা যায় না, তবে সুকুমার করলে। মার্জনাও করলে; শিক্ষার দিক দিয়ে এক, তারপর প্রভুর বিশেষ অনুগ্রহভাজন, এমন লোককে যদি সুকুমারকেও অভ্যর্থনা করতে হোত, সেও মনে মনে লাঠিতে তেল মাখাতে মাখাতেই করত।

তার প্রথম কাজই হোল সাকসেনার মনের ভেতর থেকে সমস্ত সন্দেহ বিদূরিত করা। কথাবার্তায় নিরুদ্দিষ্টভাবে জানিয়ে দিলে স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য সে বীরেন্দ্র সিংয়ের অতিথি হয়ে এসেছে—আগে থাকতে পরিচয় ছিল—কিছুদিন এখন থাকতে হবে, তবে স্থায়ীভাবে থাকবার কোন সম্ভাবনাই নেই। কাজ যে করতে লাগল সেও নিজের দূরত্বটা রক্ষা করে, একরকম প্রতিপদেই সাক্সেনার আদেশ নির্দেশের

ওপর নির্ভর করে। আরও একটু নিচু করে রাখলে নিজেকে—একদিন অনুগ্রহ-প্রার্থীর মতোই জানালে, সাক্সেনা একজন অভিজ্ঞ লোক, সুকুমার নিজে নবাগত, তার পরিচালনায় কাজ করতে পাওয়া সে একটা সুযোগ আর সৌভাগ্যই মনে করে'।

লোকটার বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ করে গেছে, এর মধ্যে দশবারো জায়গায় চাকরি করেছে, সুতরাং ধীরে সুস্থে বসে অভিজ্ঞতা অর্জন করবার সুবিধা কতটুকু পেয়েছে বোঝে সুকুমার। ডাক্তারির নমুনা ত দেখে, কিন্তু অনধিকার-চর্চা জ্ঞানে নাক গলাতে যায় না; বরং বিরাগ-বিরক্তিটাকে চাপা দেবার জন্যই নিজের কথাগুলা আরও মিষ্ট করে রাখে।

বাঙালী যুবকটি 'ফিল্ড'-এর আশায় এসেছিল; রোগীর সংখ্যাল্পতা দেখে বিমর্ষ হয়ে থাকে। একদিন মনের কথাটা বলে ফেললে সুকুমারকে—"কোথায় শুনেছিলাম বেহারের এ-সব পাহাড় অঞ্চলও ম্যালেরিয়া-কালাজ্বরে ছেয়ে গেছে; এই তার চেহারা মশাই? বারোটি বেড হাসপাতালে—এসে রাজার হালে থাকবে, তাও ভর্তি হয় না।"

হাসি চাপতে না পারার জন্যই সুকুমার বললে—"আগে অসুখ হবে তবে তো রাজ-সুখ?"

"সেই কথাই বলছি; কেস কোথায়? তারপর যদিবা এক আধটা কল্ এল কালেভদ্রে—ইন্‌ডোর হাসপাতাল সম্বন্ধে এদিকে আবার একটা সুপারস্টিশন আছে কিনা, বলে যমের বাড়ি যাবার মাঝপথে একটা পান্থশালা—তাই যদিবা এল এক আধটা কল্ তো ঐ সাকসেনাকে ডিঙিয়ে এদিকে আসবার জো আছে?"

ছোকরা টেঁকল না, মাসতিনেক আগে এসেছিল, সুকুমার আসবার দিন পনর পরে একদিন ইস্তাফা দিয়ে উর্বর 'ফীল্ড' এর সন্ধানে চলে গেল।

যেটা ছিল কতকটা সখের কাজ, সুকুমারের পক্ষে সেটা দায়িত্বের আকারে এসে পড়ল। ও ঠিক দুঃখিত হোল না, কিন্তু দুঃখিত হবার লোক ছিল।

দিনকতক পরে আরো একটা ব্যাপার হোল। ডাক্তার সাকসেনা অসুখে পড়ে

গেল। একলা পড়ে গিয়ে স্থকুমারের খাটুনিটা গেল অত্যধিক বেড়ে, কিন্তু অবাধে কাজ করবার আনন্দে তার শক্তির উৎসও যেন গেল খুলে। এদিকে আউটডোরের দৈনন্দিন রোগী, ইনডোরের ন'টা তার মধ্যে গোটা তিনেকের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন; সাকসেনাকেও দেখতে হয়, তারপর অষ্টপ্রহরের ভাবনা, বাড়িতে সরমা। সে ভালো আছে, একটা না একটা কাজ নিয়েই থাকে, মাঝে একটু খোঁজখবর না নিয়ে গেলে যেন অশান্তি লেগে থাকে।

এর ওপর বাইরেও যেতে হয়। সাকসেনার হাতের দুটো কেস আছে, একজন বড় গৃহস্থ, বেশ চাষবাস আছে, আর একজনের বাজারে চালডালের আড়ৎ, সবচেয়ে এখানে যেটা বড়। দুজনেই চারটাকা করে দর্শনী দেয়, স্থকুমার সেটা সাকসেনার হাতেই দিয়ে যায়।

সাকসেনা যে খুব সন্তুষ্ট থাকে এমন মনে হয় না স্থকুমারের। নীরবে টাকাটা নিয়ে মুখটা ফিরিয়ে নেয়। একদিন জিজ্ঞাসা করলে—"আছে কেমন?···দেখবেন, আমার কেসটা খারাপ করে দেবেন না যেন।"

স্থকুমার বললে—"আছে অনেকটা ভালোই।"

"I mean, he can pay" (আমার বলবার উদ্দেশ্য লোকটার টাকা-কড়ি দেওয়ার সামর্থ্য আছে।)

একধরণের অর্থপূর্ণ চাহনি নিক্ষেপ করলে একটু।

সঙ্কেতটা বুঝলে স্থকুমার—কেস্ খারাপ করে দেবার মানেটা কি। গা'টা ঘিনঘিন করে উঠল, তবে বললে না কিছু।

দুদিন বাঙালী ডাক্তারটির একটা রোগীও দেখে এল। একটি ছোট মেয়ে, বাজারে বাপের একটা কামারশালা আছে; একটি টাকা করে দিত। নিলে স্থকুমার, ভেবে দেখলে তার বাজার নষ্ট করবার অধিকার নেই, আরও একজন ডাক্তার যখন রয়েছে।

এরপর আলাদা করে তার নিজের হাতে কেস এসে পড়ল।

আউটডোরের কাজ শেষ করে একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে যাবে,

দেখলে সিঁড়ির নিচে একপাশে একটি আধবুড়ো গোছের সাঁওতালী দুটি হাঁটু একত্র করে মাথা গুঁজে বসে আছে। জিজ্ঞাসা করলে—"কে? কি চাও তুমি?"

লোকটা মুখের পানে চেয়ে রইল, বললে—"ডাগডর বাবু—"

সুকুমার বললে—"হ্যাঁ, আমিই ডাগডরবাবু, বলো কি চাই?"

মুখের পানে চেয়েই রইল। সুকুমার একরকম ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে কথাটা বলেছিল, ওর মনে হোল, ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না লোকটার। একজন মালীকে ডাকলে, সে সাঁওতালী, স্থানীয় হিন্দী আর কতক কতক বাংলা মেশান যে এক-ধরণের কথা প্রচলিত আছে এ-প্রান্তে তাইতে বুঝিয়ে বললে—প্রশ্নে উত্তরে যাহা বোঝা গেল—তা এই যে কোটপ্যাণ্ট হ্যাট পরে যে ডাক্তারবাবু আছেন, সায়েবের মত দীর্ঘ আর গৌর, সে তাঁকেই চায়। তিনি তার ছেলেকে দেখছিলেন, টাকা ফুরিয়ে যাওয়ায় আজ এগার দিন হোল আর যাননি। ছেলের অসুখ পরশু থেকে বেড়ে উঠছে—তিন হাত দু'মুঠোর জোয়ান ছেলে তার—একেবারেই চ্যাটাইয়ের সঙ্গে মিশে গেছে—গিয়ে দেখতে পাবে কি না জানে না। সে তার হালের মহিষটা বেচে টাকা নিয়ে এসেছে, ডাক্তারবাবু চলুন দয়া করে। না হয় কদিনের দর্শনী আগাম নিয়েই চলুন, শুধু ওষুধপথ্যের দরুণ গোটাকতক টাকা বাদ দিয়ে—তা ডাক্তারবাবু য'টা দরকার মনে করেন—কেননা তাঁর কাছে ঘটটা ছাড়া বেচবার আর কিছু নেই!

আরও প্রশ্ন করিয়ে সুকুমার টের পেলে, ওর বাড়ি পশ্চিমের পাহাড়টার ওদিকে আরও ক্রোশ দুই দূরে। পাহাড়ে উঠতে হয় না, পাশ দিয়ে একটা রাস্তা আছে। পাহাড়টা প্রায় ক্রোশখানেক পথ, এর মাঝামাঝি পর্যন্ত মোটর যাবে, তারপর বরাবর গোরুর-গাড়ি, তার ব্যবস্থা লোকটা করে এসেছে।

দর্শনীর কথা বললে—প্রতি ক্ষেপে দশটা করে টাকা সে দিয়ে এসেছে ডাক্তারবাবুকে।

এদিককার অবস্থাটা জানানো হোল; সে-ডাক্তারবাবু সপ্তাহখানেক থেকে পীড়িত; তার যাবার উপায় নেই। সুকুমার তাঁর জায়গায় কাজ করছে, যদি তার

গেলে চলে তো যাবে। তবে দেরি হবে, হাসপাতালে অনেকগুলো কাজ আছে ; সেরে নিতে দুপুর গড়িয়ে যাবে।

লোকটা সুকুমারের পা জড়িয়ে ধরলে ; তার ঐ একটি ছেলে, তাকে বাঁচিয়ে দিক, 'বোঙা' ঠাকুর তার ভালো করবেন।

সুকুমার আর বাসায় গেল না, যেটুকু সময়, বাঁচাতে পারে।

এই সময়টায় সরমা ওর পথ একটু চেয়ে থাকে, মালীকে বললে খবরটা দিয়ে আসতে—তাকে দূরে যেতে হবে, হাসপাতালের কাজগুলো একেবারে সেরেই আসবে।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে যখন বাসায় গেল, দেখে সরমা খাতা-কলম নিয়ে বারান্দায় একটা উইকারের চেয়ারে বসে ; নিচে ডানদিকে মালী আর বাঁদিকে সেই সাঁওতালী লোকটি। সুকুমার যেতেই ছেলেমানুষের মতো একটা সঙ্কুচিত উল্লাসের সঙ্গে বলে উঠল।—"আমি সাঁওতালীও শিখব, এই দেখোনা লিখে নিয়েছি—মাকে বলে গো ; বাবাকে,—বাবা, ভাইকে, বোয়েহা, বোনকে মিসেরা, ছেলেকে কোরা গিদরে, মেয়েকে কুরি গিদরে, জলকে দা, শোফা ওদের নেই, কথাও নেই ; গাছকে বলে দাড়ি ; আশ্চর্য নয় ? এই আমি এতগুলো লিখে নিয়েছি ; শিখব ; তুমি কিছু বলতে পারবে না ; কেন, বাঃ ! তোমার বাংলাও তো শিখছি এদিকে।"

বড ভালো লাগে এটুকু সুকুমারের ; কিছু দিন আগে সব ভুলে-ভালে যে শিশু হয়ে গিয়েছিল সরমা—সেই ভাবটা যখন এইরকম হঠাৎ আনন্দে এক একবার ফিরে আসে ক্ষণিকের জন্য। শিশুকে উৎসাহ দেবার মতো করেই চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে খাতার ওপর দৃষ্টি ফেলে একটু হেসে বললে—"দেখি, তাইতো ! দু'পাতা ভরিয়ে ফেলেছ। আর বাকিই বা কি ? ··ও বেচারিদের সম্বলই হদ্দ তিন পাতা কি চার পাতা।"

মালীর কথা শুনে নিজেই লোকটাকে ডাকিয়ে এনেছে সরমা, সমস্ত কাহিনী শুনেছে ওর, ভালো করে নিজে বসে খাইয়েছে, তারপর এই বসে শিষ্যগিরি করছিল। তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে সুকুমার লোকটাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ফিরল রাত যখন সাড়ে ন'টা। মোটর থেকে নামল নিজে, রোগীর বাপ সেই

লোকটা, একটা বছর পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের সাঁওতালী যুবতী—লোকটার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, আর একটি শিশু কন্যা। ছেলেটিকে স্ট্রেচারে করে খুব সন্তর্পণে নামাতে হোল, অবস্থা খুবই খারাপ, তার ওপর এই পথশ্রমটাও গেল। উপায় ছিল না, এ রোগীকে অতদূরে রেখে চিকিৎসা করার কোন অর্থই হয় না।

পরিণামটা ভালো হোল না কিন্তু—অন্তত সদ্য সদ্য।

সাকসেনা বললে এইরকম ক'রে ঘর থেকে রোগী টেনে এনে যদি হাসপাতাল বোঝাই করা হয় তো সে হাসপাতালের হ্যাপা সে বইতে পারবে না। তার অসুখটা কমে এসেছিল, আবার গেল বেড়ে, ভালো হবার দিন চারেক পরেই কাজে জবাব দিয়ে রাগারাগি করে চলে গেল।

হাসপাতালের সমস্ত দায়িত্বটা এসে পড়ল স্থকুমারের ঘাড়ে। সেবাটা এমন করে হঠাৎ শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়াতে একটু বেশ বিচলিত হয়েই পড়ল প্রথমটা।

দশ

নূতন সংসার পাতা নিয়ে সরমার কাজ অনেকটা কমে এসেছিল, অন্তত তাতে বৈচিত্র্যের অভাব একটু এসেই পড়েছিল, আবার যেন জোয়ার ঠেলে এল। সাঁওতাল পরিবারটিকে সে বাড়িতেই টেনে নিলে, তারপর তাদের নিয়ে উঠল মেতে ; বিশেষ করে মা আর মেয়েকে নিয়ে।

পুরুষটার নাম ঝংড়ু ; বয়স হোক, বুড়োই বলা চলে এক রকম, কিন্তু খুব কর্মঠ। এত বড় উপকারের জন্য অন্তরের কৃতজ্ঞতাটুকু কি করে প্রকাশ করা যায় সেই নিয়ে একটা দিন গবেষণা করলে ঘুরে ফিরে একটু দেখে শুনে ; তারপর দিন সকালে দেখা গেল, শালবন থেকে এক গোছা ডালপালা কেটে নিয়ে এনে ফেলেছে। জিগ্যেস করতে জানালে, বাগান করবে, ডাগদরবাবুকে যে তরিতরকারি কিনে খেতে হচ্ছে সেটা আর হতে দেবে না। এই থেকে সরমার কাজের পরিধিটা

একেবারে অনেকখানি বেড়ে গেল। তরিতরকারির জন্যে ওর মাথাব্যথা ছিল না, প্রতিদিন সকালে বীরেন্দ্র সিংয়ের বাড়ি থেকে যে ডালি আসে ফল-ফুল আনাজের—তা ওর সংসারের প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশি। ঝংড়ুর উৎসাহ থেকে ওর মাথায় নিজেদের একটি ছোটখাট ফুলের বাগানের কথা উদয় হোল।...বাসা থেকে আরম্ভ করে ঝিলের ধার পর্যন্ত সমস্ত জায়গাটুকু নিজের বন্য আকৃতি থেকে এমন একটি সুষমায় বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল যে ওর রুচির আভিজাত্য দেখে সুকুমার, বীরেন্দ্র সিং সবাই বিস্মিতই হলেন। জায়গাটাকে বেশি যে খোঁড়াখুঁড়ি করলে এমন নয়, যেখানে একটি পুরানো গাছ আছে থাকতে দিলে; যেখানে কতকগুলা শিলার স্তূপ একটা ছোটখাট পাহাড়ের আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, নাড়াচাড়া করলে না; যেখানটা উঁচু, কাটলে না; যেখানটা নিচু, ভরাট করলে না; একটু আধটু চেঁচে-ছুলে, বীরেন্দ্র সিংয়ের বাগান থেকে, হাসপাতাল প্রাঙ্গণ থেকে পছন্দ-মাফিক অল্প স্বল্প কয়েক রকমের গাছ আনিয়ে এখানে ওখানে বসিয়ে, সমস্ত জায়গাটুকু একটু একটু করে সবুজ ঘাসে মুড়ে দিয়ে, জায়গাটার চেহারা বদলে ফেললে। সরমা এটা করলে একটা অদ্ভুত দরদ দিয়ে, মাটির প্রতি কণাটির আকাঙ্ক্ষা যেন ও বুক দিয়ে অনুভব করছে; বন্য প্রকৃতিকে এতটুকু রূঢ় আঘাত দিলে না, ওর মায়া স্পর্শে সে যেন নূতন হয়ে বেরিয়ে এল।

মানুষ ওর মতো একেবারে নিজেকে বিস্মৃত হলে এমনি করে আদি-জননী প্রকৃতির মর্মের কাছে গিয়ে পড়ে কিনা কে জানে?

ঠিক এই রকম একটি পরিবর্তন অন্যত্রও ঘটালে, ঝংড়ুর পঁচিশ বছরের তরুণী বধূ রুস্মার মধ্যে।

সেদিন রাত্রে সরমা বাড়ির ভেতরের বারান্দায় বসেছিল সুকুমারের প্রতীক্ষায়। এই একটু আগে মোটরের হর্ণ শুনলে, সুকুমার তাহলে এসে গেছে হাসপাতালে। ও বেরিয়ে গেলে মালীটা থাকে বাড়িতে, তাকে খবর নিতে পাঠিয়ে হাতের বইটায় আবার মন দিয়েছে এমন সময় রুস্মাকে নিয়ে মালী এল, তার পাশে বছর আটেকের একটি মেয়ে। রুস্মা থমকে একটু দাঁড়াল, মনে হোল কিছু যেন বলবার আর করবার ছিল—বোধ হয় মাটির ওপর গড়িয়ে পড়ে ছেলেকে বাঁচিয়ে তুলতে বলা—

ভুলে গিয়ে আস্তে আস্তে এসে সিঁড়ির নিচের একটা ধাপে মেয়েটাকে আলগাভাবে কোলে চেপে হাঁ করে চেয়ে বসে রইল।

সরমারও সেই রকমই অবস্থা; চোখ ফেরাতে পারলে না। ওর মনে হোল অন্ধকারেরই খানিকটা যেন অপরূপ এক মায়ারূপ ধরে কড়া বিদ্যুতের আলোর মাঝখানটিতে জমাট হয়ে বসল। একটুখানি বিভ্রম হয়েই ছিল ওর, তারপর মালী বললে—বাবু যে রোগী দেখতে গিয়েছিলেন, সেখান থেকেই এরা এসেছে সবশুদ্ধ, রোগী এরই ছেলে। বুড়ো এখনও হাসপাতালেই আছে।

পরিচয় কতটা সরমার কানে গেল বোঝা গেল না, হয়তো মাত্র বিভ্রমটুকু দিলে ভেঙে; ও কিন্তু চেয়েই রইল। স্বাস্থ্যে-গঠনে এত সুন্দর এর আগে কাউকে দেখেনি। একটু আঁট-করে-পরা মোটা খাটো একখানি সাঁওতালী শাড়ী, দেহের জায়গায় জায়গায় একটু চেপে বসে গেছে, তাতে সুকুমার দেহের রেখা-তরঙ্গ আরও বেশি করে তুলেছে ফুটিয়ে। চোখ দুটি টানা, একটু বিহ্বল, হয়তো যে-বিপদ মাথায় করে আসা তার জন্যেই; একটা টকটকে রাঙা জবা সুপুষ্ট এলো খোঁপার ওপর গোঁজা, তার পরতে পরতে বিজলির আলো সেঁদিয়ে সমস্তটায় যেন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

দৃষ্টিটা বিহ্বল, সেই সঙ্গে অপলক। সেও তো সরমার মতো আর কাউকে এর আগে দেখেনি, রূপে এত সুন্দর, বেশভূষায় এত সমুজ্জ্বল, এই আলো, এই অপূর্ব পরিবেশ·

কথা কইলে প্রথমে সরমাই। মেয়েছেলের একটা স্বভাবই আগে তার দৃষ্টি যায় রূপের দিকে, তারপর রূপ থাকলে চরিত্র সম্বন্ধে কুতূহলী হয়ে ওঠে। সরমা মালীকে বললে—"জিজ্ঞেস করো, খোঁপায় ফুলের ঘটা কেন? ছেলের অসুখ এদিকে;—তাকে এই হাসপাতালে নিয়ে এল·"

প্রশ্নটাতে যে একটু ব্যঙ্গ ছিল, মালী সেটাকে আরও একটু ফুটিয়েই দিলে জিগ্যেস করবার সময়। মেয়েটা মালীর দিকেই বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে জানালে—বোঙা-ঠাকুরে পুজো করা ফুল, ছেলের কল্যাণে; মাথার নিচে তো কোথাও রাখতে নেই··

কথাগুলো বলে তার যেন খেয়াল হোইল ; মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি কোল থেকে এক রকম ঝেড়ে ফেলেই, সে সেইখানে বসেই সমস্ত শরীরটা সরমার পায়ের কাছে লুটিয়ে দিলে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠে নিজেদের ভাষায় অনর্গল-ভাবে একরাশ কি বলে গেল।

ব্যাপারটা এতই আকস্মিক যে প্রথমে সরমা কিছু যেন ভাববার সময়ই পেলে না, তারপর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মালীর দিকে চাইলে।

মালী জানালে, বলছে—তুমি স্বর্গের দেবী, আমার ছেলেকে বাঁচাও, তোমার কাছে এনে ফেলেছি—আমার ঐ একটি ছেলে—ওর বাপের পর ওই সর্দার হবে, আমি সর্দারের মা হব—ছেলের জন্যে আমরা সব বেচেছি, নগদ টাকা দিয়ে তোমাদের পূজো দেব, ফুরিয়ে গেলে ঐ ছেলেকে তোমাদের গোলাম করে দেব, ডাগডববাবু—দেবতাকে বলে ওকে বাঁচাও—ততদিন আমরা স্বামী-স্ত্রীতে কায়ে খেটে তোমাদের দুজনের সেবা করব—একটি কুটো নাড়তে দেব না তোমাদের ··

সরমা কি রকম যেন হয়ে গেছে ; কি করা দরকার, কি বলা উচিত কিছু ঠিক করে উঠতে পারছে না, তারপর মেয়েটা একটু পরে মায়ের দেখাদেখি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এর-ওর মুখের পানে চেয়ে কেঁদে উঠতেই সে যেন একটা কিছু পেয়ে বাঁচল, তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলে।

এই সময় সুকুমার এসে পৌছুল।

দৃশ্যটা নিশ্চয় অদ্ভুত, অনেকটা বিসদৃশই ; একটু দাঁড়িয়ে দেখতেই হোল, কিন্তু ভালো লাগল কি মন্দ লাগল সে-সম্বন্ধে কিছু বললে না। জানালে ছেলেটির অবস্থা নিতান্ত খারাপ দেখে নিয়ে এল, এরা দুজনেও ছেলে ছেড়ে থাকতে চাইলে না, ঘর দোর বন্ধ করে চলে এসেছে ; আজকের রাত্রিটা এদের একটু খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, কাল থেকে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবে ওরা।

সরমা একটু যেন নিরাশভাবে প্রশ্ন করলে—"কেন, ওদের এখানে থাকতে বললে থাকবে না ?"

সুকুমার একটু হাসলে, সরমাই এদের সাহচর্য পছন্দ করবে কি না করবে সেই

ভেবে কথাটা বলা ; শিশুটির দিকে চেয়ে বললে—"ঐ ওকে দেখেই বোঝ না, কোল পেলে কেউ যেতে চায় ?

ওর মা'টা পড়েই আছে, তবে কান্না নরম হয়ে এসেছে, সরমা একটু অপ্রতিভ হয়ে মেয়েটিকে তার পাশে বসিয়ে দিলে, বললে—"কি তুলতুলে ! অথচ দেখতে যেন কালো পাথর কেটে তৈরি। আমি বলছিলাম এরা থাক—যদি থাকতে চায়, বুবুয়া যে চাকরটাকে দিয়েছেন তাকে ফিরিয়ে দিলেই হবে। আব বউটাকে দেখেছ ? কী যে চমৎকার ! অমন দেখিনি কখনও !"

সুকুমার কান পেতে শুনছিল, যেমন ক'রে ওর এই ধরণের কথাগুলা শোনে, শেষের কথাটায় একটু স্পষ্টভাবেই হেসে উঠল, বললে—"আমি সেই দুটোব পব আর কিছু মুখে দিইনি ; এর ওপর ওরা যদি থাকতে বাজি হয় তো আমাব কথা আরও একেবারেই ভুলে যাবে দেখছি যে !"

এই সবের মধ্যে আবার শিক্ষকতাও করতে হয়, কোথায় কি ভুল-ত্রুটি হয়ে গেল দেখিয়ে দিতে হয়, কোনটা আগের, কোনটা পরের দিতে হয় বুঝিয়ে , সবমা একটু অপ্রতিভ হয়েই খাবারের আয়োজন করতে যাচ্ছিল, সুকুমার বললে—"তুমি ওদের ছেলেটির কথা একবারও জিগ্যেস কর নি ।"

সরমা আবার একটু অপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, শুধরে নেবার চেষ্টা করে বললে—"এই দেখো ! এমন হাঁউ-মাঁউ করে কেঁদে পড়ল মাগিটা !···তাই· ভাবছিলাম—কি যেন একটা দিলে ভুলিয়ে···সত্যি, কেমন আছে ?···ভালো আছে নিশ্চয় · এমন পড়ল কেঁদে মাগি ! · যেন কী !"

অথচ ছেলের জন্যেই তো কেঁদে পড়া। ··সে-কথা অবশ্য সুকুমার বলে না। আহা, বেচারি সরমা, তবু ভগবানের দয়া, কতো পরিষ্কার হয়ে এসেছে ওর জগৎ— এরই মধ্যে।

বললে—"অনেকটা ভালো ; মানে, এতটা নিয়ে আসবার জন্যে আমার যে একটা ভয় ছিল সে-দিক দিয়ে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি। তুমি ততক্ষণ মালীকে দিয়ে কথাটা ওকে বুঝিয়ে বলাও, আমি ধড়াচুড়াগুলো খুলে নি।"

এগার

আরও মাসতিনেক কেটে গেল—তীব্রতর কর্মস্রোতের মধ্যে দিয়ে। বর্ষাঋতু শেষ হয়ে এসেছে। এবারে এ প্রান্তে বৃষ্টি ভালো হোল না, একেবারে এই শেষের দিকে একটু ঘটা করে নেমেছে। সকাল থেকেই আবাব মেঘ বেশ জমে আসছিল, একটু তাড়াতাড়ি হাসপাতালে বেরিয়ে পড়বে এমন সময় মুষলধারে বৃষ্টি নামল। যাওয়া চলত, ছাতা রেনকোট সবই নিয়ে বেরিয়েছে, তেমন দূরও নয় হাসপাতাল, কিন্তু কি ভেবে আর গেল না, বৈঠকখানার বাইরের দিকের বারান্দায় একটা ডেকচেয়ার পেতে বসে রইল।

দূরের পাহাড়গুলা গেছে মুছে, ক্রমে ক্রমে কাছের গুলাও গেল; বৃষ্টির কুয়াসা ঝিলের ওদিককার তটরেখা গ্রাস করে ফেললে, তারপর ধীরে ধীরে ঝিলের প্রায় সমস্তটাই, শুধু একেবারে এই কোলের কাছে খানিকটা রইল জেগে। পরশু বিকাল থেকে হচ্ছে বৃষ্টি, জল অনেকখানি উঠে এসেছে।

সুকুমার কি ভেবে একবার উঠল, ঘরের এদিককার দোরজানলা বাইরে থেকে সবগুলা দিলে টেনে বন্ধ করে। মনে হোল ভেতর-বার সবদিক থেকেই আলাদা হয়ে একটি নিরিবিলি অবসর রচনা করে বসল সে।

ভেতরে একবার সরমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"রুম্মা, তোর বাবু চ'লে গেল?"

"গেলেন তো দেখছি।" রুম্মা বাংলা শিখেছে একটু, ছোটখাট কথাগুলা আটকায় না, শিক্ষাটা চলছেও দু'দিক দিয়ে—নিত্য কথাবার্তা, তা ভিন্ন বই।

এর পরে আবার সরমার কণ্ঠস্বর—"মানুষের একটা আক্কেল থাকতে হয়; এই পাহাড়ে বৃষ্টি মাথায় করে···তুই দোরজানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে আয়।"

স্কুমার একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে মনে মনে। রুম্মা কিন্তু দোর খুলে বাইরের দিকে দেখলে না; ভেতর থেকে ছিটকিনিটা তুলে দেবার সময় শুধু নিজের মনেই বললে—"আক্কেল থাকতে হয়!"

—হয়তো কথাটা নূতন তার পক্ষে, আয়ত্ত করে নিলে; কিম্বা ছিটকিনি দিতে যে শক্তিটুকু লাগল, তার সঙ্গে যুক্তাক্ষরের ঝোঁকটা মিলল ভালো, তাই বলে দিলে।

তা ভিন্ন আক্কেলের দোষটা তো দেওয়াও যায়, নানা কারণেই; কেউ শুনতে পাচ্ছে বলে যখন ভয় নেই।

যে-ভাবে—নিঃসংশয়ের মধ্যে রুম্মার কথাটা এসে কানে পড়ল তাতে স্কুমারের ঠোঁটে আপনিই একটু হাসি ফুটে উঠল; তারপর এই রুম্মাকে অবলম্বন করেই তার চিন্তা স্রোত আরম্ভ হয়ে গেল।

রুম্মা সরমার জীবনে একটি অদ্ভুত পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছে, শুধু, ও একা নয়, ওর ছোট সংসারটি নিয়ে, যার কেন্দ্র অবশ্য রুম্মাই। সরমার নারী-জীবনের একটা অভাব মিটেছে ওর দিক্ দিয়ে, ওর ছেলেটিকে আর মেয়েটিকে আশ্রয় করে, এরপর তাই থেকে অনুচরী, দাসী হয়েও রুম্মা সরমাব সাথী হয়ে উঠেছে অনেকখানি। একেবারে যে হয়ে ওঠেনি তার কারণ সরমার দিক থেকে কিছু নয়—ওর নিজের জীবনের অর্ধেকটা নষ্ট হওয়ার সঙ্গে ছোট বড়র পার্থক্যটাও গেছে মিটে একরকম; পূর্ণ সখীত্বের মর্যাদায় রুম্মাই নিজেকে এসে দাঁড়াতে দেয়নি; ওর দৃষ্টিটা সেদিকে খুব প্রখর, সীমাজ্ঞানটা খুব সজাগ।

ছেলে বুধাই আর মেয়ে দুলার এ-বালাই নেই, মায়ের চেয়ে রাঙা-মায়ের কাছে আদর-আস্কারা বেশি পেয়ে তারা দিনদিন তারই অনুগত হয়ে উঠছে বেশি।

সেরে উঠতে মাস খানেক লাগল, ছেলেটা এখন আশ্রমের ছাত্র। সরমার নিজের স্কুলের দুটি ছাত্রী, রুম্মা আর দুলা। সবাইকেই নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলছে, চলা-বসা, পোষাক-পরিচ্ছদ, সব দিক দিয়েই; পারেনি শুধু ঝংড়ুকে, সে বাগান নিয়েই রইল, গাছপালা মাটি-কাঁকরের মধ্যে ভদ্রতার অশুচি থেকে সন্তর্পণে নিজের জাত বাঁচিয়ে রেখে।

ধীরে ধীরে কেমন করে পরিবর্তনটুকু হোল, ঝংড়ুর বেলা কেমন করে হোলও না, অনেকদিন পরে আজ এই অবসরটুকু পেয়ে তার ধারাটুকু স্থকুমারের দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠছে।

এরপরে, সংসারে যখন পরিপূর্ণতা এসে গেল (হোক গিয়ে তা পরকে নিয়েই) সরমার মনটা বাইরের উপরে পড়ল। ততদিনে বাইরের যোগ্য অভিজ্ঞতা, শব্দ-সম্ভার দুই-ই বেড়েছে তার, স্বভাবের মধ্যে সেই নীরব দিশেহারা ভাবটা নেই, তাই থেকে সেই সঙ্কোচ—যার জন্য সরমাও মানুষের সাহচর্য পরিহার করত, স্থকুমারেরও তাকে পাঁচজনের মধ্যে নিয়ে যেতে মন সরত না। ইতিমধ্যে ওর পুরণো অধিগত বিদ্যা স্মৃতির মধ্যে কোথাও একটু ছিদ্র পেয়ে যেন বন্যার স্রোতেই ওর কাছে এসেছে ফিরে। বাংলা ইংরাজী বেশ ভালোই জানা; ইতিহাস, ভূগোল সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান বেশ গভীর, এর অতিরিক্তও দু'একটা বিষয়ে এমন কথা মাঝে মাঝে বলে ফেলেছে, যার জন্যে মনে হয় কলেজেও বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত এগিয়েছিল ও। এদিকটা ওর গোপন কববার চেষ্টা, তাই সেটা কতদূর কী বৃত্তান্ত টের পায়নি স্থকুমার।

এখন সংসার ছাপিয়ে আশ্রমে গিয়ে পড়েছে সরমা, তারপর আশ্রম ছাপিয়ে খানিকটা হাসপাতালেও, সেবার কাজে। অপরিসীম ওর উৎসাহ, আশ্রমের চেহারা দিয়েছে অনেক বদলে, স্থকুমারকেও খানিকটা টেনে নিয়েছে এদিকে। ঠিক ব'লে ক'য়ে টানেনি; আশ্রমে সরমার এই যে রূপ তাইতে আকৃষ্ট হয়ে স্থকুমারও কখন্ যেন অজ্ঞাতসারেই এইদিকে এসে পড়েছে।

এখন একটি সহজ কর্মময়, পরিপূর্ণ জীবন চলছে ওদের। দেখাশোনা, যাওয়া-আসা, আলাপ-পরিচয়; সবাই এক জায়গায় বসে আলোচনা, পরিকল্পনা— এই সব নিয়ে সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যায়, বোঝা যায় না। বৈঠক হয় তার বাসায়, মাস্টার মশাইয়ের বাসায়, কখনও বীরেন্দ্র সিংএের নিজের ভবনে, কখনও বা সন্ধ্যার মুখে হাসপাতালের প্রাঙ্গনটায়, বোগেনভিলিয়া গাছটার সামনে চেয়ার পেতে। থাকেন বীরেন্দ্র সিং, মাস্টার মশাই, আশ্রমের কয়েকজন শিক্ষক, দু'জন যে শিক্ষয়িত্রী আছেন তাঁরা, আর স্থকুমার সরমা তো থাকেই, বীরেন্দ্র সিং বলেন ওরা আশ্রমের

প্রাণ। এ প্রশংসায় কথা কাটাকাটি চলে এক এক সময়। সামনে এতটা প্রশংসা সহ্য হয় না, একদিন, সুকুমার বললে—"আমরা বনের পাখি, আটকে গেছি, আবার কবে উড়ে যাব, এত প্রশংসা করবেন না। আর প্রাণ যদি হয়ই তো সে আপনার মেয়ে।" ছল ধরার জন্যে লুকিয়ে থাকেন মাস্টারমশাই, উনি ছিলেন কলেজে বীরেন্দ্র সিংয়ের গৃহশিক্ষক আর অভিভাবক, সেই সম্পর্কে এদের ঠাকুরদাদা। বললেন—"প্রশংসার নিজের পাওনাটুকুও তুমি সরমার ওপর চাপিয়ে দাও আপত্তি নেই সুকুমার, আর দেওয়াই 'তো উচিত, তবে দুটো প্রাণ যেখানে এক—সেখানে আলাদা আলাদা নাম করে বলা বীরেন্দ্রের অন্যায় বৈকি।"

নিজে প্রচণ্ড বেগে হেসে ওঠেন, বয়স্থ দু'একজন যারা ঐ সম্বন্ধ ধরে আছে তারা যোগ দেয়, বাকি সবার মধ্যে একটা মৃদু সবসতা ছলছলিয়ে ওঠে।

আলোচনা হয় যেন এই ছোট্ট শহর লখমিনিয়া নিয়ে সমস্ত নূর-বেগম পরগণাটা সবার যৌথ সম্পত্তি—আশ্রম, হাসপাতাল, বাজার, পথঘাট সম্বন্ধে তো এই ভাবের আলোচনা হয়ই, এমন কি বীরেন্দ্র সিংয়ের প্রাসাদ নিয়ে কিছু পরিকল্পনার কথা উঠলেও আলোচনার ভাবটা বদলায় না।

অদ্ভুত এ লোকটি। ইতিমধ্যে আরও জেনেছে এর সম্বন্ধে। লখমিনিয়া এ-প্রান্তের এক বড় রাজপুত রাজ-পরিবারের শাখা। কিন্তু বীরেন্দ্র সিংয়ের কানে কি এক মন্ত্র পড়েছে, উনি যেন সব শুদ্ধ নেমে এসে আপামর সবার মধ্যে চারিয়ে পড়লে বাঁচেন। ওঁর স্বপ্নের অন্ত পায়নি সুকুমার এখনও।

ভেবেই চলেছে।

বৃষ্টি আরও জোর হয়ে উঠেছে; হাত পঞ্চাশেক দূরে ঝিলের জলটুকুও আর দেখা যায় না। সমস্ত লখমিনিয়া যেন বাইরে মুছে গিয়ে সুকুমারের অন্তরে প্রবেশ করেছে। একটা মায়া বসে গেছে—সেটা, অবসরের অভাবেই, এতদিন ভালো করে উপলব্ধি করতে পারেনি, আজ করলে।·· একে গড়ছে তাতে আর সরমাতে মিলে। আজকে এই তাদের এক কাজে মিলে যাওয়ার ব্যাপারটাও বড় অদ্ভুত মিষ্ট লাগছে।

সরমা বৈঠকখানায় কি কাজে এসেছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কাজ নয়, ঘুরে বেড়ানর সঙ্গে সঙ্গে গুণ গুণ করে একটা গান ধরেছে, জোরে না হলেও বিশেষ আস্তেও নয়; স্থকুমার তো নেই! যেন শোনা গান, কিন্তু ধরতে পারছে না স্থকুমার বাইরে থেকে।

সরমার দিকেই মনটা গেল। আশ্চর্য এই যে সরমা অনেকখানিই ফিরে পেয়েছে আগের জীবনের, শুধু মূল জীবনটা পেলে না এখনও। এরকম তো হবার কথা নয়। শিক্ষা, জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা—সব আসবে ফিরে, অথচ বুঝতে পারবে না কোথায় ছিল বাড়ি, কাদের সন্তান, কি ছিল আত্মীয়-স্বজন! এক এক সময় মনে হয় যেন ইচ্ছা করেই ও এদিকটা লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু তা করবার উদ্দেশ্য কি হতে পারে? আর ওর মুখের সবলতা, ওর ব্যবহারের স্বচ্ছতা দেখে মনে হয় না ঠিক লুকোচুরি খেলার মানুষ সরমা।

রোগটা সম্বন্ধে বই পড়েছে অনেক আনিয়ে। একটা অপেক্ষাকৃত নূতন বিজ্ঞান, এখনও মণীষীরা হাতড়াচ্ছেনই, পুরো সন্ধান কেউ দিতে পারেন না।...হয়তো সম্বন্ধ-নির্ণায়ক কতকগুলা আলাদা কোষই মাথার মধ্যে আছে, সেইগুলা গেছে নষ্ট হয়ে, কিম্বা আঘাত পেয়ে এখনও হয়ে আছে মুহ্যমান।

কবে আবার সেগুলা সজীব হয়ে উঠবে তার জন্য অসীম ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করে আছে স্থকুমার। আজকাল সরমার মস্তিষ্কের ক্ষমতা বেড়েছে, তাকে ভাবতে বললে অন্যায় হয় না। দু'একদিন বলেছিলও; কি রকম এক ধরণের অন্যমনস্কতা এসে যায় ওর দৃষ্টিতে, বড় কষ্ট হয় দেখলে। ঠিক বুঝতে পারে না স্থকুমার, ওর অসহায় ভাবটা কেন—যা ফিরে পাওয়া যাবে না তার জন্যে, না, ফিরে পাওয়া গেলে এই যা ছেড়ে যেতে হবে তার মায়ায়?

আর ওকে বলে না ভাবতে।

ভেতরের গানটা আরও জোর হয়েছে; আজ সরমাকেও বর্ষায় পেয়েছে। বৈঠকখানা থেকে ভেতরের দিকে চলে গেল, বারান্দা থেকে ডাকলে—"তুলা! বই রেখে এদিকে আয়, একটা গান শিখবি।"

[illegible] হঠাৎ যেন একটা মূর্তি পরিগ্রহ করে ঝিলের জল থেকে উঠে

এল।··ছাতাটা স্পষ্ট হোল, তারপরেই টুপি, রেন-কোট ; কাঁকরের পথ বেয়ে ছপ ছপ করতে করতে বীরেন্দ্র সিং এগিয়ে এলেন, ছাতা মুড়ে বারান্দায় উঠলেন।

"একি কাণ্ড!"—বলে অতিরিক্ত বিস্ময়ে স্থকুমার উঠে দাঁড়াল। "এ বৃষ্টিতে মানুষে বেরোয়!"

বন্ধ দোরজানলার দিকে বীরেন্দ্র সিং একবার ঘুরে চাইলেন, হেসে বললেন—"বাড়ি থেকে নিজেকে বের ক'রে এনে একরকমভাবে বারান্দায় বসে থাকাটা আরও অদ্ভুত নয় কি ?"

নিজেই গিয়ে জোরে কয়েকবার নড়া কাড়লেন। এসে খুলে দিলে সবমাই। দৃষ্টিতে তার বিস্ময়ের আর সীমা নেই।

"একি কাণ্ড বুবুয়া আপনার!—এই পাহাড় বৃষ্টিতে আর তোমার একি!—একেবারে শুকন, অথচ—"

বীরেন্দ্র সিং ঠাট্টা করে কিছু বলবার আগেই স্থকুমার তাড়াতাড়ি আমতা আমতা করে বলে দিলে—"বেরুই নি তো ; বেরুব কিনা ভাবছিলাম।"

"শুনুন কথাটা একবার বুবুয়া! বেরুবে কিনা মানুষে তা ঘরে ব'সে ভাবতে পারে না! দাঁড়ান্, জল লেগে যাবে, আমি আলগাভাবে খুলে দিচ্ছি রেনকোটটা·· "

ছাতা, কোট, টুপি বারান্দার র‍্যাকে টাঙিয়ে—চটি, তোয়ালে এনে দিলে, রুক্মাকে শীঘ্র চায়ের ব্যবস্থা করতে বলে নিজেই আবার দেখতে যাচ্ছিল, বীরেন্দ্র সিং বললেন—"তুমি থাকো বিটিয়া, ও করছে, একটা দরকারি কথা আছে।"

কুশন চেয়ারে বসে হাত পা মুছতে মুছতেই আরম্ভ করলেন—"দেখলে তো কি ধরণের জায়গা এটা ?—বর্ষা নেই তো নেই, মাঠ ফেটে চৌচির হচ্ছে, নামলো তো এই দুদিনের জলেই সব ভাসিয়ে দেবে, নদীগুলো উপচে পড়ে!···আমি ঠিক করে ফেলেছি—ঝিলের ওদিকের পাহাড় দুটো এইবার বেঁধে ফেলব মাঝখানে একটা দেয়াল তুলে ; এত অপচয় আর সওয়া যায় না।"

স্থকুমারও বেশ ধরতে পারেনি কথাটা, কিন্তু সরমা আর নিচু

চাপতে পারলে না, চোখ দুটো বড় বড় করে প্রশ্ন করে উঠল—"এই বৃষ্টির মধ্যে!"

বীরেন্দ্র সিং স্নেহভরে তার মাথায় হাতটা দিলেন, বললেন—"তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি কবে যে হবে বিটিয়া!...আমার সেই হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রজেক্টের কথা.. আপনাকে বোধ হয় বলে থাকব এর আগে ডাক্তারবাবু—সামনের ঐ পাহাড় দুটোর মাঝখানে একটা ড্যাম তুলে দিয়ে পাশের আরও দু-একটা জায়গা বন্ধ করে দিলে এই ঝিলের তিনগুণ একটা ঝিল হবে, তার জলটা কনট্রোল করতে পারলে সারা নূর-বেগম চাকলায় সেচের অভাব কখনও হবে না, তেমনি থাকবে না বন্যারও ভয়। এটা গেল ইরিগেশনের দিক। হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার যে পাওয়া যাবে তাতে শহরটাতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা তো হবেই (শহর বাড়বেও আরো)—আমার আরও বড় প্রজেক্ট্ আছে—একটা কাপড়ের কল—আপাতত ছোটখাট—তারপর...বিটিয়া তুমি হাঁ করে রয়েছ—কেন বেশ মনে ধরছে না?"

"তা নয় বুবুয়, সবই তো ভালো - আমি শুধু ভাবছি আপনি এইটুকু বলতে এই বৃষ্টি মাথায় করে এসেছেন!"

আবার সস্নেহে মাথায় হাত দিলেন বীরেন্দ্র সিং, বললেন—"তাই কেউ আসে রে পাগলী? আমি এসেছিলাম, মাস্টার মশাইয়ের কাছে, বৃষ্টির আগেই। বৃষ্টি দেখেই আলোচনাটা উঠল ওখানে, ভাবলাম ডাক্তারবাবুকে একবার বলতে হয়। বৃষ্টি ধরে না দেখে চলেই এলাম, এইতো দু'রশি পথ। মোটর? · ইয়ে...নেমে পড়বার পর মনে পড়ল মোটরটাও রয়েছে—তখন কিন্তু অনেকটা এগিয়ে পড়েছি।"

বারো

বর্ষার পরেই বাঁধের কাজ আরম্ভ করে দেওয়া হয়েছিল, শীতের শেষাশেষি এসে কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেল। পরিকল্পনাটা বরাবর বীরেন্দ্র সিংয়ের মাথার ভেতর ছিল, ওঁর একটা 'স্বপ্নের' মধ্যে, কিন্তু আশ্রম আর হাসপাতাল সামলে উঠতে পারছিলেন না বলে ওদিকে মন দিতে পারেননি, নিতান্ত আলগাভাবে এক আধবার কথাটা তুলে থাকবেন মাস্টার মশাইয়ের কাছে। এবার এদিককার চিন্তা থেকে অনেকটা মুক্ত; সামনে ছিল বর্ষা, সেটাও গেল কেটে, বীরেন্দ্র সিং বাঁধের কাজ নিয়েই পড়লেন একেবারে। কাজও এমন নয় যে, একবার হাত দিয়ে গড়িমসি করা চলে, আবার বর্ষা নামবার আগেই সব শেষ করে ফেলতে হবে।

এতদিন পর্যন্ত কতকটা পুরাতন যা ছিল--রাজবাড়ি, বাজার কেন্দ্র করে ভালোয়-মন্দয় খানিকটা বসতি, তারপর নূতনে পুরাতনে আশ্রম-বিদ্যায়তনটুকু, তারপরে হাসপাতাল—ঝিলটিকে অর্ধচন্দ্রাকারে পরিবেষ্টন করে এই যে একটু শহরের মতো, এটা নিতান্ত অলসভাবে ধীরে সুস্থে নিজেকে প্রসারিত করছিল, হঠাৎ এল এই আধুনিক। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মাসের মধ্যে শহরটুকু ফেঁপে উঠল। বাঁধ প্রায় শেষ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে উঠছে তার আফিস, তার পাশেই পাওয়ার হাউস; বাঁধ আর ঝিলের মাঝখানে যে জমিটুকু তারই একপাশে। তার পাশেই শহরের উল্টা দিকে ঝিলের ধারে উঠছে কাপড়ের কল; খুব বড় নয়, আপাতত অল্পসংখ্যক তাঁত নিয়ে। কলের পাশে শ্রমিকদের বস্তি। সব মিলিয়ে ঝিলের চারিদিকে বৃত্তটি প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে, ব্যবধান মাত্র বুলানী নদীর প্রসারটুকু, যেটা ঝিল থেকে বেরিয়ে হাসপাতালের নিচে দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে।

কলের যন্ত্রপাতি অনেক এসে পড়েছে, আরও আসছে। অনেক লোক খাটছে, অনেক লোক খাটাচ্ছে তাদের—ইন্‌জিনিয়ার থেকে আরম্ভ করে ফোরম্যান মেট

পর্যন্ত। বাজার গেছে বেড়ে, একের টানে অন্যের আমদানি, এই করে বাজারের পেছনের চাষ-জমিও বাড়িতে উঠছে ভরে। লখ্‌মিনিয়ার চেহারা যাচ্ছে দিন দিন বদলে।

এরই একপাশে একটি ক্ষুদ্র পরিবারের ইতিহাস দিনের পর দিন রচিত হয়ে চলেছে। এদের কেউ কারুর নিজের নয়—সুকুমার, সরমা, আর স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে রুম্মা, এরা তিনজনেই পাহাড়ে তিনটি ধারার মতো তিন দিক থেকে এসে এক জায়গায় হয়েছে; তারপর এখন এক। এই সংসারের বাইরের রূপটা আনন্দের রূপ; পরস্পরের স্বার্থকে আপন করে নিয়ে, পরস্পরের জীবনকে পূর্ণ করে এদের বেশ কাটছে। এইভাবে কেটে যেতে পাবত শেষ পর্যন্ত—সুকুমারের মনে কি বেদনা আছে, সরমার মনে কিছু আছে কিনা, পরিবর্ধমান কর্মের আনন্দের মধ্যে এ প্রশ্নটা ওদের জীবনেই একদিন বোধ হয় অবান্তর হয়ে পড়ত; কিন্তু হঠাৎ এই বাইরের রূপটিতে এক দিক দিয়ে বাধা এসে উপস্থিত হোল—

বাঁধের দিকে আর ভালো জায়গা নেই, নূতন যে কৃত্রিম হ্রদটা হোল তাইতেই সব টেনে নিয়েছে, সেইজন্য বাজার আর আশ্রমের মাঝামাঝি যে শালবনের টুকরাটুকু দাঁড়িয়েছিল সেটাকে একটু কাট-ছাঁট করে তার মধ্যে বিদ্যুৎ আর কাপড়ের কলের অফিসারদের গুটিকয়েক বাসা করতে হোল। সবার ওপরের অফিসার—জেনারেল ইন্‌জিনিয়ার একজন পাঞ্জাবী ছিলেন। বিলাত-ফেরৎ আর মোটামুটি বেশ কাজের লোক। কিন্তু তার কায়দাও ছিল অতিরিক্ত বিশেষ ধরণের; বীরেন্দ্র সিংয়ের এই যে পদ্ধতি সবাইকে নিয়ে সব ব্যাপারের আলোচনা, আর সব আলোচনাই ঘরোয়া—এটা সে বরদাস্ত করতে পারছিল না। তার মনের ভাবটা যখন একটু স্পষ্ট হোল, সুকুমার, মাস্টারমশাই দুজনেই তার যুক্তির সারবত্তা বীরেন্দ্র সিংকে বোঝাবার চেষ্টা করে সরে দাঁড়াতে চাইলেন। বীরেন্দ্র সিং বললেন—"আপনাদের দুজনকে বাদ দিয়ে লখ্‌মিনিয়ার কোন কাজই হয় না; না হয় নিতান্ত যা টেক্‌নিক্যাল তা আপনারা নাই বুঝলেন—সে তো আমিও বুঝি না—কিন্তু সাধারণভাবে কি হচ্ছে না হচ্ছে, কি হওয়া উচিত—এসব তো বোঝেন

…আর বিটিয়া তো থাকবেই—কতো দরকার চারিদিক দিয়ে ওর মনের খোরাক !"

মাস পাঁচেক কাজ করবার পর একটা ভালো জায়গায় কাজ পেতেই লোকটা চলে গেল। তারপরে এল একজন বাঙ্গালী, মৃন্ময় চৌধুরী, বৈদ্যুতিক আর সাধারণ দুদিকেরই কলকব্জার সম্বন্ধে জার্মানির শিক্ষা আছে উভয় কাজেই কিছু অভিজ্ঞতাও সংগ্রহ করেছে এদিকে এসে, বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ এই রকম।

একটা দিকে সুকুমারের দৃষ্টি খুব সতর্ক, এই যে এতগুলা লোক রাখা হোল—অফিসার থেকে কেরানি পর্যন্ত—এতে সাধ্যমতো বাঙ্গালী বাদ দিয়েই রেখেছে বা রাখিয়েছে—আর কলকাতা থেকে তো একজনও আমদানি হতে দেয় নি। খুব সন্তর্পণে করে এটা, চেনা মুখের বা মুখচেনে এমন লোকের ভয়, তারই হোক বা সরমারই হোক। একদিক দিয়ে এটা যে অন্যায় তা বোঝে। সরমার কবে বাকি স্মৃতিটুকু ফিরে আসবে, ও সেই প্রতীক্ষায় আছে ধীরে সুস্থে একটা ব্যবস্থা করবে, প্রয়োজন হয় তো এখান থেকে চলে গিয়েও কিন্তু হঠাৎ এই অবস্থার মধ্যে, এতখানি সম্মান প্রতিষ্ঠার মধ্যে চেনাচেনি হয়ে একটা কদর্য সোরগোল ওঠে—এটাকে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে ভয় করে, যতদূর সাধ্য ওপথ বন্ধ করেই চলেছে এখন পর্যন্ত।

মৃন্ময় এসেছে এলাহাবাদ থেকে, সেখানেই বাড়ি। বীরেন্দ্র সিংয়ের নিয়ম—নূতন যারা আসবে তাঁর অতিথি হয়েই উঠবে তাঁর ভবনে। দুপুর বেলা এলো, বিকালে একটু তাড়াতাড়িই আলাপ পরিচয় করতে গেল সুকুমার, নাই হোক কলকাতার তবুও বাঙ্গালীই তো, একটা ধুকপুকুনি লেগেই থাকে। · নাঃ, কখনও দেখে নি ; এটাও বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল, তারও মুখ নবাগতের এই প্রথম দেখা। একটু পরিচয়েই বেশ ভাল লাগলো ; খুব স্মার্ট, একটু বোধ হয় বিদেশী স্টাইল আছে, কিন্তু সেটাও মনে হোল প্রথম পরিচয়ের জন্যেই, একটু দহরম-মহরম হোলে কেটে যাবে। কাজের লোক বলেই মনে হোল, খানিকটা আলাপ পরিচয় হবার পর নিজেই উদ্যোগী হয়ে একবার ঘুরে আসবার কথাটা বললে। পাওয়ার হাউস আর কাপড়ের কল যতটা বসেছে, বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে, বেশ টের পাওয়া যায় বোঝে। ওইখানেই এতটা সময় কেটে গেল যে আশ্রম আর হাসপাতালের দিকে

সেদিন আর যাওয়া হোল না। সন্ধ্যার পরে ওরা ফিরলো। সুকুমার আরও খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে ওঠবার সময় বীরেন্দ্র সিংকে উদ্দেশ্য ক'রে বললে—"তাহলে মিস্টার চৌধুরীকে ছাড়বেন কবে?"

বীরেন্দ্র সিং হেসে বললেন—"কই আমি তো কাউকে ধরে রাখি নি।"

"সেই জন্যেই তো জিজ্ঞেস করছি, মুক্তি দিয়ে বেঁধে রাখেন বলেই তো বেশি ভয় কিনা, আমি তো ভুগেছি।"

হেসেই জবাবটা দিয়ে মৃন্ময়ের পানে চাইলে। সেও হেসে বললে—"নিমকের বাঁধন আরও শক্ত, যত কম হয়, কি বলেন? · এমনি অবশ্য যেখানেই থাকি, ওঁর নিমকই পেটে যাবে…"

ওঠবার মুখের কথা, ওখানেই শেষ হোল, মনে চমৎকার একটি ছাপ নিয়ে ফিরছিল, নেমে মোটরের কাছে এসেছে, মৃন্ময় ওপর থেকে নামতে নামতে বললে—"একটু অপেক্ষা করবেন ডক্টর সেন, একটা প্রফেসনাল এডভাইস্ নিতে হবে।"

নেমে এসে একটু চাপা গলাতে বললে—"আমি কালই বাসায় চলে আসছি একটা ছুতোনাতা ক'রে, হাজার ভাল হোক, কেমন যেন পোষায় না মশাই… বুঝতেই তো পারেন…বাঙ্গালীর জন্যে মনটা কেমন হাঁপিয়ে পড়ে…সকালের ব্যবস্থা আপনার ওখানেই ক'রে রাখবেন।"

মনে যে মিষ্টতাটুকু নিয়ে ফিরছিল সেটা অনেকখানিই নষ্ট হয়ে গেল। সুকুমার কোন রকমে একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে—"সে তো আমার পরম সৌভাগ্য।"

বাঙ্গালী বলে আর সবাইকে বাদ দিয়ে যে আত্মীয়তা সে সম্বন্ধে কিছু বললে না, আর প্রফেসনাল এডভাইস সম্বন্ধে তো ভেবেই আকুল হতে লাগল—এতগুলো কথার মধ্যে কোনটে তার মধ্যে পড়ে।

তারপর দিন এল সকালে, কিন্তু বীরেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে, তিনি প্রাতঃভ্রমণ উপলক্ষ ক'রে ওকে এদিকটা দেখাতে নিয়ে এসেছেন। আশ্রম হয়ে যখন সুকুমারের বাসায় এসে পৌছলো, সে তখন বেরুবার জন্যে তোয়ের হচ্ছে। মৃন্ময় নমস্কার করে প্রথমেই বললে—"আজ মনে করেছিলাম চলে আসবো ডাক্তারবাবু, এদিকটা যা

চমৎকার, লোভও বেড়ে গেছে শীগ্‌গির চলে আসবার, কিন্তু রাজভোগ কপালে আছে, খণ্ডাবে কে ?"

কোন রকম ব্যবস্থা করতে ইঙ্গিতে মানা ক'রে দিয়ে বীরেন্দ্র সিংয়ের পানে চেয়ে প্রশ্ন করলে—"এবার ওঁর হাসপাতাল তো ?" বীরেন্দ্র সিং সুকুমারের দিকে চেয়ে বললেন—"আপনি তো তোয়েরই রয়েছেন..." সুকুমার উত্তর করলে—"তা তো রয়েছি.. কিন্তু একটু বসবেন না ? প্রথম এলেন মিস্টার চৌধুরী..."

মৃন্ময় বললে—"না, এখন আর বসব না ডাক্তারবাবু, তবে আপনার বাগানটা একবার না ঘুরে দেখে পারছি না।...বসার কথা—আপনাদের আশ্রয়েই তো আসছি—একলা মানুষ, পাঁচজন প্রতিবেশীর দয়াই ভরসা আমার—এত বেশী এসে বসব যে আপনারাই পালাই পালাই করবেন।"

নেমে পড়তে ওঁরা দুজনেও নেমে এলেন। বাগানটি সত্যই চমৎকার হ'য়ে উঠেছে। একটু ঘুরে ফিরে মৃন্ময় প্রশংসায় মুখর হ'যে উঠল—বললে—"অল্প একটুখানি জায়গাকে এত সুন্দর ক'রে তোলবার ক্ষমতা আমি এক শুধু জাপানীদের দেখেছি—শুধু তো সুন্দরে নয়, অল্পর মধ্যে বিরাটের প্রতিচ্ছবি এনে ফেলা। আপনার বাগানে আপনি তাই এনেছেন ডাক্তারবাবু, আপনার রুচির জন্যে কন্‌গ্রাচুলেট করছি আপনাকে।"

যেখানে একবার যায়, যেন নড়তে পারে না। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আকাশ, ঝিল, দূরের গাছের পাহাড়—সমস্ত পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে কি মিলিয়ে দেখে, তারপর আবার সুকুমারের রুচির প্রশংসা। সুকুমার কি রকম হয়ে গেছে—কালকের সেই অভিজ্ঞতা, অথচ আজকে সেই মানুষেরই মন স্বচ্ছতায় যেন জ্বল জ্বল করছে। তারও সৌন্দর্যমুগ্ধমন, বেশ বুঝতে পারছে আজ মৃন্ময়ের মনে এতটুকু কৃত্রিমতা নেই। বীরেন্দ্র সিং আস্তে আস্তে পেছনে পেছনে চলেছেন। মুখে একটু হাসি লেগে আছে, আর প্রশংসার সময় সেটা মাঝে মাঝে অধর কুঞ্চনের সঙ্গে একটু তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে, দাঁতে নখ খুঁটছেন—যেন কি একটা বলতে চান, অথচ মনস্থির করে উঠতে পারছেন না ; শেষে বলেই ফেললেন—

মৃন্ময় একবার ঐরকম প্রশংসার সঙ্গে আবেগভরে সুকুমারের হাতটা একটু

চেপে ধরেছে—একটা কৃত্রিম ক্ষুদ্র পাহাড়ের গায়ে কতকগুলা নূতন ধরণের ফার্ন দেখে, সুকুমারও লজ্জিত হয়ে কি রকম হয়ে গেছে, বীরেন্দ্র সিং হাসিটা একটু স্পষ্ট ক'রে বললেন—"নাঃ, আর পারা গেল না, বলতেই হোল আদৎ কথাটা, আপনি যে এরকম ক'রে পরের প্রশংসা আত্মসাৎ ক'রে যাবেন ডাক্তারবাবু···এ বাগানের ষোল আনার মধ্যে অন্তত বারো আনা যশ আমার মেয়ের মিস্টার চৌধুরী ; আমার বাগানও—এখন যা—তা তারই রুচির পরিচয় দেয়।"

সুকুমার বেশ জোরে হেসে উঠলো, বললে—"আপনি বাঁচালেন, প্রশংসার বোঝা অসহ্য হয়ে উঠছিল আমার।···কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি জ্ঞানতঃ পাপটা করিনি, মিস্টার চৌধুরী যে কত সৌন্দর্যভক্ত এইটেই আমায় অবাক করে রেখেছিল। নৈলে, ও বাকি চার আনাও তো আমার প্রাপ্য নয়, প্রাপ্য হচ্ছে ঝংড়ু সর্দারের।"

তারপর তার নজর গেল মৃন্ময়ের মুখের পানে, বীরেন্দ্র সিংয়ের কথায় একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেছে, বললে—"বুঝেছি, ওঁর মেয়ের কথায় আশ্চর্য হয়ে গেছেন। সেটা—কি বলব ?—এমন অনেক জিনিস আছে যা প্রশংসাও নাগাল পায় না··· আমার স্ত্রীর কথা বলেছেন উনি। ওঁর অসীম দয়া, উনি তাকে ওঁর মেয়ে হবার গৌরব দিয়েছেন।"

"গৌরবটা কার বুঝতেই তো পারছেন মিস্টার চৌধুরী · এ'রকম একটি মেয়ের বাবা হতে পারা ফাঁকতালে ”

এই সময় খানিকটা দূরে বাসার কাছাকাছি বাগানের একটা ছোট ফটক ঠেলে রুম্মা প্রবেশ করলে। বেড়ার বাইরে ঝংড়ুর ঘরটা, স্বামীর প্রাতঃকালীন তদারক সেরে আবার ফিরে যাচ্ছিল, বাগানে অপরিচিত লোক দেখে কৌতূহলভরে একটু দাঁড়িয়ে পড়ল ; তারপর আবার বাসার দিকে চলে গেল।

বাগানের ঐখানটায় যেন কিছু একটা ঘটে গেল, ওরা তিনজনেই একটু না চেয়ে থেকে পারলে না। রুম্মার পরণে একটা সাঁওতালী শাড়ি, সাঁওতালী ঢঙেই দেহের অনেকখানি অনাবৃত করে পরা, পায়ে রূপার কড়া, হাতে রূপার কাঁকন, এলো খোঁপায় বোধহয় জবার অভাবেই বেশ বড় একটা রাঙা গোলাপফুল।

বীরেন্দ্র সিংয়ের তাকিয়ে থাকার একটু অন্য কারণও ছিল, এবেশে রুম্মাকে এই কয়েক মাসের মধ্যে এই প্রথম দেখলেন; বাঙ্গালী মেয়ের বেশেই থাকে ও। সুকুমারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—"রুম্মা না?"

সুকুমার একটু হেসে বললে—"হ্যাঁ, রুম্মা সর্দারণী। ··জানেন না?—" রাত্তির থেকে নিয়ে আর এই সকালে আমাদের বাসায় ফিরে যাওয়া পর্যন্ত ওর এই বেশ—বোধহয় তো ঝংড়ু সর্দারের শাসন—ওরা আবার জাতের মোড়ল কিনা—এর পর ওখানে পা দিয়েই আপনার মেয়ের শাসন ওকে পুরোদস্তুর বাঙ্গালী মেয়ে হয়ে যেতে হবে।"

একটু হাসি উঠল; তাতে মৃন্ময় যে একটু অন্যমনস্ক হয়েই যোগ দিলে এটা ওরা কেউ টের পেল না, কেননা সঙ্গে সঙ্গে একটা মন্তব্য ক'রে সে হাসিটা একটু বাড়িয়েই দিলে, বললে—"দ্বৈতশাসনে বেচাবা নাজেহাল হ'চ্ছে বলুন!"

সুকুমার বললে—"সেই আমাদের হয়েই গেল একটু দেরি, অথচ মিস্টার চৌধুরী বসলেন না; আর কিছু না হোক আপনার মেয়ের কাছে এর জন্য জবাবদিহি দিতে হবে।"

বুধাই আর দুলাই এসে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়েছে, সুকুমার জিজ্ঞেস করলে—"তোদের রাঙামা কি করছে রে?

বুধাই বললে—"একটু আগে স্নানের ঘরে গেলেন।"

বীরেন্দ্র সিং বললেন—"তাহলে চলুন যাওয়া যাক হাসপাতালে, দেরি হবে, নয় আমরা এসেছি টের পেলে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসবে।"

বাগান থেকে বেরুতে বেরুতে বললেন—"ঐ দেখলেন তো?—রুম্মার ছেলে আর মেয়ে, চেনবার জো আছে? এই বুনো জমির মতো, বনের মানুষকেও রি-ক্লেম করবার অদ্ভুত ক্ষমতা মায়ের আমার।"

এই সময় এক হাতে নিড়ানী আর এক হাতে ডালকাটা একটা বড় কাঁচি নিয়ে ঝংড়ু বেরিয়ে এল, হাঁটুর উপর পর্যন্ত মালকোঁচা করে কাপড় পরা, ডান ওপর হাতে একটা রূপার অনন্ত, কাঁচাপাকা বাবরি চুল, চওড়া লাল সালু দিয়ে বাঁধা,

বোধহয় সর্দারীর মানচিহ্ন; দূর থেকেই সেলাম ক'রে একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইল।

সুকুমার বললে—"এইখানে কিন্তু আপনার মেয়ে হার মেনেছে···"

আবার একটু মৃদু হাসি উঠল।

মৃন্ময় আগেকার চেয়েও আশ্চর্য হযে চেয়েছিল, বেটাছেলে ব'লে তত সঙ্কোচেরও কারণ নেই; ওদের হাসিতে ঘুরে বললে—"কি বললেন? ··ও! ··তা ওকে মিসেস সেনের হার বলা যায় না, বুড়ো তোতাকে কেউ পড়াতে পারেনা।"

খুব সতর্ক থেকে বরাবর যোগ দিয়ে গেল, কাউকে সন্দেহ করবার অবসর না দিয়ে; কিন্তু খুবই অন্যমনস্ক হয়ে গেছে।

তেরো

সেদিন বিকালবেলায় জলসাটা বসেছিল হাসপাতালের প্রাঙ্গণে। চৈত্রের কয়েক-দিন কেটে গেছে, এ সময়ে এ জায়গাটাই বসবার পক্ষে ভালো। তা ভিন্ন সকালে মৃন্ময় আশ্রম হাসপাতাল একটু করে দেখে গেছে মাত্র, কারুর সঙ্গে বিশেষ আলাপ-পরিচয় করতে পারে নি; কলের দিক থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরলে ওকে এখানেই নিয়ে এলেন বীরেন্দ্র সিং। পরিশ্রমী লোক, কাজ বোঝেও মনে হয়, উনি একটু আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন।

সুকুমার আর মৃন্ময়কে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আগে বীরেন্দ্র সিং এসে বসেছিলেন, তারপর যেমন যেমন সবাই আসতে লাগল, মৃন্ময়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। আলাপ বেশ জমে উঠল। প্রথমটা নূতন পরিচয়ের এলোমেলো কথাবার্তা। তার মধ্যেই সাধারণভাবে লথ্‌মিনিয়ার বিষয়, তারপর প্রায় সবাই এসে গেলে যখন পরিচয়ের দিক দিয়ে নূতন কিছু রইল না বিশেষ, তখন শুধু লথ্‌মিনিয়ার আলোচনাই চলল। মৃন্ময় একটা নূতন প্রশ্ন তুলেছে, আর বিশেষ করে তার দিক দিয়ে প্রশ্নটা অপ্রত্যাশিত বলে প্রসঙ্গটা মতামতের মধ্যে বেশ জমে উঠল। ওর

জিজ্ঞাসা, এমন একটি শান্তিপূর্ণ মনোরম জায়গায় বীরেন্দ্র সিং হাঙ্গাম এনে ফেললেন কেন? এসে পর্যন্ত ও এই কথাই ভাবছে—আর যতই দেখছে জায়গাটাকে—ততই বেদনার সঙ্গে প্রশ্নটা ওর মনে যেন জেঁকে বসছে। কেন প্রশ্নটা করলে ঠিক বলা যায় না, ইন্‌জিনিয়ার হলেও সত্যই বোধহয় ওর রস-চেতনাটাই বেশি প্রবল, ওর ভেতরের কবি-প্রকৃতি আঘাত পেয়ে থাকবে; কিম্বা হয়তো এটা নিতান্ত আধুনিক স্টাইল একটা—লোকের যা প্রত্যাশা তার ঠিক উল্টটি বলে বা ক'রে তাক লাগিয়ে দেওয়া—যার জন্যেই বোধহয় ইউরোপ-ফেরত হযেও গলায় ফাঁপা চাদর সুদ্ধ অতিরিক্ত বাঙ্গালীপনার সাজগোজ ক'রে উপস্থিত হয়েছে সে। উত্তর দিলেন বীরেন্দ্র সিং-ই—কথায় কথায ধর্মঘট, বস্তির নোংরামি, নেশাভাঙ—এই সবেব ভয় তো?—তিনি ভেবে দেখেছেন; শিল্প যখন আধুনিক পদ্ধতিতে বাণিজ্য, তখনই তার ব্যাভিচার: যেখানে তা নয়, পরন্তু যে টাকাটা ঢাললে—আর যারা তাদের উৎপাদন শক্তি দিয়ে সেই টাকাটাকে বাডাবে—শিল্প-অনুষ্ঠানটা যেখানে এদের উভয়েরই সম্পত্তি, সেখানে এ ভয় তো থাকবার কথা নয়। থিয়োরীটা তাঁর নিজেব নয়, দেশে দেশে পরীক্ষাও হচ্ছে এ নিয়ে, বীরেন্দ্র সিং শুধু তাঁর নিজের দেশে এ পরীক্ষাটা করতে চান। তাঁর লখ্‌মিনিয়া সুন্দর, সবাব সমবেত চেষ্টায় আরও সুন্দর হয়ে উঠছে দিন দিন—তিনি জানেন কারুব কারুর ভয় যন্ত্রদানবে এ-সৌন্দর্য নষ্ট করবে; তাঁর কিন্তু বিশ্বাস, সুন্দর বলেই ভয় কম, যা সুন্দর তাই জয় করে। ঠিক এই স্বপ্নই কবি দেখেছিলেন শ্রীনিকেতনেব মধ্যে। সে যে মাত্র কুটীরশিল্প নিয়ে, আধুনিক কল-কব্জা নিয়ে নয়, এতে কিছু আসে যায় না।

মৃন্ময় ঠিক তর্কের জন্য তোলেনি প্রশ্নটা; আগেই বলা হয়েছে, নয় স্টাইল, নয় সত্যিই ওর একটা আশঙ্কা। এব পরে এই দিক ধরেই আলোচনাটা চললো।

বীরেন্দ্র সিং কিন্তু খানিকটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবার পর একটু স্তিমিত হয়ে গেলেন। তিনি দুজনের অনুপস্থিতিটা একটু বেশি করে অনুভব করছিলেন—মাস্টারমশাই আর সরমার। আসলে সুকুমার আর এরা দুজন উপস্থিত না থাকলে তিনি যেন বেশ উৎসাহ পান না; আজ যখন আশা হচ্ছে যে ঠিক এই ধরণের আর একজনকে পেলেন, তখন যতই ওঁদের দেরি হতে লাগল ততই যেন ওঁর মনটা

ঝিমিয়ে যেতে লাগল, আলোচনায় যোগ আছে, কিন্তু ক্রমেই যেন বেশি অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে লাগলেন।

ওঁদের দুজনের ক'দিন থেকে দেরি হচ্ছে, তার কারণও জানেন বীরেন্দ্র সিং। সরমার পড়াশুনা এখন সুকুমারের বিদ্যার গণ্ডীর বাইরে গিয়ে পড়েছে। আশ্রম-স্কুলের ছাত্রী-বিভাগে ওর খানিকটা কাজ আছে, তারপর স্কুল বন্ধ হয়ে গেলেই ও মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে তাঁর বাসায় চলে যায়, সেখানে পড়ে তাঁর কাছে। কি পড়ে, কোনও পরীক্ষার জন্য তোয়ের হচ্ছে, কি এমনই জ্ঞানার্জন, সেটা বোধহয় সঙ্কোচ-বশতই ভাঙেনি কারুর কাছে, মাস্টারমশাইকেও বলতে মানা করে দিয়েছে। তবে নিয়মিতভাবে পড়ছে এবং আজকের মতো এক এক দিন বেশি দেরিও হয়ে যায়। কিন্তু আজকের বৈঠকে একটু নূতনত্ব ছিল, এমন প্রসঙ্গটাও উঠল। যা নিয়ে আলোচনা করবার মাস্টারমশাই-ই সবচেয়ে বেশি অধিকারী, যতই সময় যাচ্ছে অভাবটা বেশি করে অনুভব করছেন বীরেন্দ্র সিং। সন্ধ্যা হয়ে এল; ক্রমে সেটা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একটু গাঢ় হয়ে উঠল। হাসপাতালে আলো জ্বলে উঠল। মিলের দিকেও জায়গায় জায়গায় বিদ্যুতের আলোয় রাত পর্যন্ত কাজ হয়, সেই আলো-গুলোও উঠল জ্বলে। ঝিলের ধারে লথ্‌মিনিয়ার যে নূতন রূপটা খুলবে রাত্রিসমাগমে, আকাশের সঞ্চীয়মান অন্ধকারে তার একটা আভাস উঠল ফুটে।

এমন সময় সরমাকে সঙ্গে নিয়ে মাস্টারমশাই উপস্থিত হলেন, আসছেন সুকুমারের বাসার দিক থেকে। উনি আসতেই সবাই উঠে দাঁড়াল, উনি হাসতে হাসতে বেশ সহজ গতিতে গিয়ে একখানি চেয়ার দখল করলেন, ওঁর চেয়ারটাই বিশিষ্ট বলে সেটা খালিই থাকে; সরমা গিয়ে ওঁরই পাশে একখানিতে বসল।

মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়টা সকালেই হয়ে গিয়েছিল, বীরেন্দ্র সিং মৃন্ময়ের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে সরমার পানে হাতটা একটু বাড়িয়ে বললেন—এরই কথা সকালে হচ্ছিল মিস্টার চৌধুরী—সরমা, আমার মেয়ে বা ডাক্তারবাবুর স্ত্রী—যে ভাবেই পরিচয়টা বুঝতে চান···

মাস্টারমশাই গম্ভীর ভাবে দাড়িতে একবার হাতটা বুলিয়ে নিলেন, তারপর

সবার উপর দৃষ্টিটা একবাব বুলিয়ে নিয়ে বললেন—"বাঃ, আর সবচেয়ে যার সঙ্গে সম্বন্ধটা ঘনিষ্ঠ সেই বাদ পড়ে গেল।"

হো-হো করে হেসে উঠলেন এবং তাবই মধ্যে সবমাব কাঁধে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে মৃন্ময়ের পানে চেয়ে বললেন—"আর আমারও নাতনী মশাই!· ·বিয়ে, সেতো দুটো মন্তর পড়লেই হয়ে যায় · তার জন্যেই যে একজনেব বেশি আপন হয়ে যাবে তা মানব কেন?"

মৃন্ময় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, সেই জন্যই তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে যে উত্তরটা দিলে, এত অল্প পবিচয়ে বোধহয় সেটা দিত না, বললে—"সেটা কিন্তু না বললেও বুঝতে পেরেছি, যে-ভাবে মিসেস সেনকে দখলেব মধ্যে রেখেছেন আপনি।"

হাসি চলল, এর গায়েই মাস্টাবমশাইয়েব উত্তরটা সেটাকে দিলে আবও বাড়িয়ে, বললে—অথচ 'মিসেস সেন' ব'লে ডাক্তাবের সঙ্গে সম্বন্ধটাকেই আপনি এখনও দিচ্ছেন বাড়িয়ে!"

মাস্টারমশাইয়ের ঠাট্টা যখন তখন চলে, লথ মিনিয়াব এই যে গোষ্ঠীটি—এব মধ্যে সবার সঙ্গে সবার এমন একটা মুক্ত আত্মীয়তাব ভাব আছে যে, সময়ে সময়ে উত্তর দিতেও বাধে না সরমার, আজ কিন্তু একেবারে নূতন লোকেব সামনে বলে অতিরিক্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে—তার ওপব একেবারে বিয়েব উল্লেখটা পড়ল এসে —সে ঠিক যেন মাথা সোজা রাখতে পারছে না।

ক্রমে প্রসঙ্গান্তর এসে পড়ল, ঠাট্টা নিয়ে যে জড়তা সেটা কেটে গেল সবমাব। কিন্তু অন্যধণের একটা সঙ্কোচ এসে তাকে ক্রমে অভিভূত করে ফেললে—যতবারই কথাবার্তায় যোগ দেবার জন্যে চোখ তুললে—দেখে মৃন্ময় তার দিকে চেয়ে। ওর পক্ষে এটা বোধ হয় সুবিধে হয়েছে এই জন্যে যে মাস্টাবমশাই আসার সঙ্গে কথাবার্তা আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, হাসির সবসতার মধ্যে দিয়ে আরও বৈচিত্র্য এসেছে, তাতে সবার মন এখন ঐদিকেই; দ্বিতীয়ত, অন্ধকারটাও আরও হয়ে উঠেছে ঘন। মোট কথা, সরমার আব সেদিন একবকম মুখ খোলাই হোল না।

একটু পরে এটা বীরেন্দ্র সিংয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, প্রশ্ন করলেন—"তোমার শরীরটা কিছু খারাপ বোধ হচ্ছে না কি মা?"

সরমা বললে—"কৈ, তেমন কিছু না তো।"

মাস্টারমশাই চঞ্চল হয়ে উঠলেন একটু, বললেন—"তা হ'য়ে থাকবে, কিছু আশ্চর্য নয়; ফাগুন চোত—পরিবর্তনের সময় তো। না, একটু খারাপ হ'য়ে থাকবে—কৈ, তুমি তো কিছু বলছ না আজকে ..."

কথা কমে গেছে মৃন্ময়েরও; কিন্তু সেদিকে কারুর মনোযোগ যাবার আগেই সে সাবধান হয়ে গেল, বললে—"আমার শরীরটাও হঠাৎ যেন . "

"ঐ দেখো মিলিয়ে; উনি নূতন লোক তো, আগেই অ্যাফেকট্ করেছে।... আপনি তাহলে উঠুন...বীরেন্দ্র, এঁকে নিয়ে যাও তুমি তাহলে। ..তুমিও বাসায় যাও সরমা—স্বকুমারের সঙ্গে। আমরা একটু না হয় বসি।"

বীরেন্দ্র সিং বললেন—"আপনারাও উঠলেই পারতেন, অন্তত আপনি; ঠাণ্ডাটা পড়ে আসছে, দো-রসার সময়..."

"আমার জন্যে ভেবো না, আমি সিজন্‌ড্ (seasoned), ছিয়াত্তর পার হলাম, এখনও বাহাত্তরেও ধরতে পারেনি। ..জিগ্যেস করো সরমাকে, প্রায় বলি কিনা যে আমার স্বাস্থ্যটা তোমরা আয়ত্ত করবার চেষ্টা করো .."

স্বকুমার উঠতে উঠতে বললে—"মাফ করবেন—ডাক্তারকে মুখ খুলতে হোল—তাহলে কিন্তু রাতারাতি আপনার বিদ্যেটা আয়ত্ত করে ফেলবার এই যে অমানুষিক চেষ্টা এটা বন্ধ করতে হয় ওকে।"

ওঠবার মুখে এই যে আর একটা হাসি উঠল তাতে সরমা আবার সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। স্বকুমার দুপা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—"আপনারা তাহলে বসবেন, আমি ওঁকে পৌঁছে দিয়ে আসছি এখুনি।"

মাস্টারমশাই ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন—"না, না, ওর কাছ-ছাড়া হওয়া তোমার এখন মোটেই উচিত নয়.. তাহলে আমায় গিয়ে বসতে হবে।...এঃ, এই ক'রেই তোমরা নিজের দাবি-দাওয়া পরের হাতে তুলে দাও।"

বর্ধিত হাসির মধ্যে এরা বিদায় নিলে। তার একটু পরেই সেদিনের বৈঠকেও গেল ভেঙে।

চৌদ্দ

ঋতু পরিবর্তনের কথাটা যে উঠল এতে ভালো হোল মৃন্ময়ের পক্ষে, অসুস্থতার ভান ক'রে সরে থাকবার একটা সুযোগ পেলে।

সকালে রুম্মাকে দেখা পর্যন্ত তার সমস্ত দিনটা চিন্তায় কেটেছে। একা রুম্মাই চিন্তার পক্ষে যথেষ্ট, তার ওপর একটু পরেই দেখলে তার স্বামীকে, পরিচয়ও পেলে ; সেই থেকে চিন্তা হয়ে উঠেছে আরও জটিল।

এক শ্রেণীর লোক আছে যাদের চরিত্র গৌরব করবার মতো নয়, কিন্তু সে-রকম পরিবেশের মধ্যে পড়লে স্বার্থের খাতিরে নিজের বৃত্তিগুলিকে সংযত ক'রে কাজ চালিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতাটা তাদের থাকে। মৃন্ময় এই শ্রেণীর লোক। তার অনেকগুলো গুণ আছে—লেখাপড়া, অভিজ্ঞতা, সৌন্দর্যজ্ঞান, সর্বোপরি চমৎকার একটি সামাজিক বোধ, যার জন্যে পাঁচজনের বৈঠকে সে যে শুধু মানানসই তাই নয়, অচিরেই নিজেকে অপরিহার্য ক'রে তোলবার ক্ষমতাটা রাখে, ওর অভাবটা অনুভব করতে সবাই বাধ্য হয়।

কিন্তু বাইরে যাই হোক, এধরণের লোকের নিজের আভ্যন্তরিক জীবনটা সুখের হয় না। ক্রমাগতই নিজের খানিকটা প্রচ্ছন্ন ক'রে দিনের পর দিন কাটিয়ে যাওয়া তো আনন্দের নয়। এরা সুখী হয়, ভাগ্য যদি এদের এমন কোন পরিবেশের মধ্যে বসিয়ে দেয় যেখানে এই রকম প্রচ্ছন্নতার অন্তঃসলিলাই চলছে। তখন তারা আস্তে আস্তে পরিচয় ক'রে নেয়, আস্তে আস্তে এগোয়, তারপর এক হয়ে যায়, সুখে থাকে।

এসে প্রথম দিনে বীরেন্দ্র সিং আর সুকুমারের যে পরিচয় পেয়েছিল, তাতে ওর আশঙ্কা হয়েছিল বোধ হয় বরাবর সামলেই চলতে হবে ওকে। সকালের অভিজ্ঞতায় ও যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠল, মনে হোল 'ভাগ্য ওকে অনুকূল আবহাওয়ার

মধ্যেই এনে বসিয়েছে। শুধু যে সুকুমার সম্বন্ধেই নিশ্চিন্ত হোল তাই নয়, নিতান্ত গণিতের হিসাবেই ও বীরেন্দ্র সিংকেও এই দলে নিলে টেনে সুকুমারের সঙ্গেই তাঁর দহরম-মহরম বেশি—তার পরিবারের রূপও এই, সুতরাং তারই আড়ালে বীরেন্দ্র সিংয়ের যে একটা প্রচ্ছন্ন জীবন চলছে না এটা কে বলবে?

কিন্তু তবুও ওদের দুজনেরই সাক্ষাৎ ব্যবহারে, কথাবার্তায় যেন সন্দেহটা কাটিয়ে দেয়। মৃন্ময় ব্যবহার আর কথাবার্তার রূপ চেনে, কোথায় খাঁটি কোথায় মেকি সেটা বোঝে, সমস্তদিন কাজের মধ্যে, আলাপের মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে রইল। তার বাকি রইল সুকুমারের এই নববিধ পরিবারের মধ্যে তার স্ত্রীকে—বীরেন্দ্র সিংয়ের "মেয়েকে" দেখা। সমস্তদিন একটা তীব্র কৌতূহল নিয়ে কাটালে, বাড়িতে যে আর কেউ নেই—শ্বশুর শাশুড়ী ননদ, এমন কি সুকুমারের নিজের ছেলেপিলেও—এইটে কৌতূহলকে আরও উদগ্র ক'রে রাখলে।

হাসপাতালের প্রাঙ্গণে সরমা যখন এসে উপস্থিত হোল তখন সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এসেছে। সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের পাশে খানিকটা ব্রীড়ানতা এই তরুণীকে আসতে দেখে মৃন্ময়ের কুৎসিত কৌতূহলটা একটা আঘাত পেলে। কিছু একটা ছিল ছবিটার মধ্যে—এই মুক্ত প্রাঙ্গণ আর ম্লান সন্ধ্যার সময়টা মিলিয়ে, যার জন্যে ওর সেই কুটিল অনুসন্ধিৎসা যেন সাহস না পেয়েই গুটিয়ে গেল।

এটা কিন্তু ক্ষণিক; সরমা একটু এগিয়ে আসতেই মৃন্ময়ের ভ্রূকুটি একটু কুঞ্চিত হয়ে উঠল। সে ভেতরে এসে যখন বসেছে তখন মৃন্ময় খুব অন্যমনস্ক, ভালো হোল যে পরিচয় প্রসঙ্গে খানিকটা হাসি উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠল, তার দিকে কারুর দৃষ্টি গেল না, নয়তে একজন সুন্দরী তরুণী আসবার সঙ্গে সঙ্গে তার এই ভাবান্তরটা কারুর কারুর চোখে পড়তই। ঘনায়মান অন্ধকারটাও তাকে সাহায্য করলে।

এরপর সে নিজেকে সামলে নিলে। একটা সুবিধা এই হোল যে সরমা এসে বসেছে তার সামনাসামনি হ'য়ে, মৃন্ময়কে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে হচ্ছে না। একটা অসুবিধেও কিন্তু এই—যে সরমা বসেছে হাসপাতালটা পেছনে করে, যার জন্যে তার মুখটা পড়ে গেছে ছায়ায়। শুধু তাই নয়, ওর দিকে চাইতে গেলে

হাসপাতালের বারান্দার আলোটা সুকুমারের চোখে পড়ে একটু ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। সরমার মুখের বাইরের রেখা ছাড়া বিশেষ কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

কিছু সে যাই হোক, যত অস্পষ্ট ভাবেই দেখা হোক, মৃন্ময়ের মনে হোল মুখটা যেন চেনা। এর পর থেকেই ও নিজের স্মৃতিকে আলোড়িত করতে লাগল—কবে, কোথায়, কিভাবে দেখেছ? ভাবটা গোপন করার জন্যেই ও বেশি করে আলাপে যোগদান করার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু ততই বেশি যেতে লাগল পিছিয়ে, শেষ পর্যন্ত ও হয়ে দাঁড়াল প্রায় নীরব শ্রোতাই। প্রচ্ছন্নভাবে চেয়ে দেখে—তার কৌশলটা ওর রপ্ত, তারপর মুখ ঘুরিয়ে ভাবে। মুস্কিল হয়েছে—একটু একটু চলার ভঙ্গি আর আবছায়াভাবে মুখের ঘেরটামাত্র পেযেছে দেখতে; যদি কথা বলে, কণ্ঠস্বর আর বলার ভঙ্গি মৃন্ময়ের স্মৃতিকে সাহায্য করতে পাবে, কিন্তু তা কইছে না। যে মানুষটা কথা কইছে, তার দিকে স্পষ্ট দৃষ্টিতে চেয়ে থাকাও যায়, চেনবার চেষ্টা করা যায় কিন্তু সরমা যতবারই কিছু বলবে মনে হয়েছে, মৃন্ময়ের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় গেছে থেমে; ওদিক থেকে কোন সাহায্যই পাচ্ছে না সে।

কিন্তু একটা মানুষ চেনা হওয়া বা না-হওয়া এমন কিছু ব্যাপার নয়—যদি পূর্ব্বে দেখা থাকে, আলাপ পরিচয় করতে সুবিধা হয় একটু। মৃণ্ময় যে অসুস্থতার ভান করে নিজের চিন্তা নিয়ে পড়ে আছে, তার কারণ ওব যেন মনে হোল যখনই সরমার সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়েছে, তার দৃষ্টিতে যেন একট চাপা আতঙ্ক উঠেছে ফুটে। এটা কেন? অবশ্য এটাও স্পষ্টভাবে দেখা নয়, মুখটা কতকটা অন্ধকারে, তার ঠিক পেছনের আলোর ধাঁধানি, তবুও মৃন্ময়েয় বেশ মনে হোল একটা আতঙ্কের ভাব ছিলই সরমার দৃষ্টিতে। যেন প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বারে বেশি ছিল, তারপরে আরও বেশি, মোট বোধ হয় বার পাঁচেক হয়েছিল চোখোচোখি।

কিছু না হোক, এটা তো ঠিক যে চোখোচোখি হবার জন্যই, কথা বলতে গিয়ে থেমে গেছে সরমা। তাই বা হবে কেন?

প্রাসাদের একপ্রান্তে নিরিবিলি ঘর; অসুস্থ বলে বীরেন্দ্র সিং একবার খোঁজ নিতে এলেন, দুচার মিনিট সেই যা একটু ব্যাঘাত হোল, তারপর অনেক রাত্রি পর্যন্ত মৃন্ময় কাটাল। ওর যত গাণিতিক সরঞ্জাম সব মনে মনে একত্র করে—

কাল থেকে সমস্ত অভিজ্ঞতা একত্র করে যেন একটা অঙ্কফল বের করবার চেষ্টা করছে—সেই বন্যহরিণী রুম্মা—বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা—বারান্দায় তাদের একটি ছেলে একটি মেয়ে, সুবেশ, সুসভ্য—সুকুমারকে মাঝখানে রেখে এদের সবার ওপর যে অনুগ্রহ দৃষ্টি তা বীরেন্দ্র সিংয়েরই · সুকুমারও সেই অনুগ্রহে লালিত; সেটা যে অল্প নয় তা তার মোটরে ষ্টেটের মনোগ্রাম দেখে বুঝেছে মৃণ্ময়।···তারপর আবার সন্ধ্যার এই নূতন অভিজ্ঞতা—বীরেন্দ্র সিংয়ের "মেয়ে" সরমা—তার জন্যে অনেকখানি তোয়েরই ছিল মৃন্ময়ের মন; কিন্তু সরমার দৃষ্টিতে আতঙ্ক কিসের? কেউ চিনেই ফেলে তো ভয়ের কি থাকতে পারে?

অঙ্কফল নির্ণয় করতে বাধাও দিচ্ছিল অনেক কিছু—প্রথমত সমস্ত লখ্‌মনিয়ার আবহাওয়াটা—সবাইকে নিয়ে সবাইয়ের সঙ্গে যুক্ত সম্বন্ধ; পরস্পরের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত একটা বিরাট সংসার যেন—তারপর মাষ্টারমশাই, বিশেষ করে মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তির মতো ওঁর বিরাট হাসি—তার কাছাকাছি অন্ধকারের কিছু যেন থাকতেই পারে না মৃন্ময়ও তার সামনে এগুতে পারছে না, নিজেব মনের অন্ধকার নিয়ে·····

তারপরদিন আশ্রমের কাছে নিজের বাসায় আসবার কথা ছিল মৃন্ময়ের, কিন্তু অসুস্থতার জন্যই বীরেন্দ্র সিং আসতে দিলেন না, অনেক রাত পর্যন্ত জাগায় তার মুখ-চোখে অসুস্থতার প্রমাণ ছিলও কিছু কিছু। বাইরে এই, ভেতরে আবার নিজের মনে একটা গলদ রয়েছে বলে বেশি বলতেও পারলে না।

সেদিন কাজে বেরুতে দিলেন না বীরেন্দ্র সিং। বিকেলেও বেরুনো হোত না। বললে, ডাক্তারবাবুকে একটু দেখিয়ে দিলে হোত না?

বীরেন্দ্র সিং বললেন—"তাঁকেই ডেকে পাঠাচ্ছি; আপনার বেরিয়ে কাজ নেই।"

মৃন্ময় হেসে বললে—"শুনেছি ছেলেবেলায় আমার অসুখ হ'লে ছাড়তে চাইত না; সামান্য কিছু হলে বাড়াবাড়িও হয়ে উঠত। পরে আবিষ্কৃত হোল সেটা হোত বাবা আর মায়ের বেশি আস্কারা পাবার জন্যে। ওঁরা করতেন ছেলের যত্ন, বোগ

ভাবতো এ বুঝি আমারই তোয়াজ হচ্ছে।···ভয় আঁকড়ে বসে না থেকে একটু আসিই না বেড়িয়ে, ফল ভালোই হবে।"

যার জন্য আসা, তার কিন্তু কোন সুবিধা হোল না। সেদিনও হাসপাতালের প্রাঙ্গণেই বৈঠক বসল। সুকুমার তখনও কিন্তু হাসপাতাল থেকে বেরোয় নি। ভালোই হোল, মৃন্ময় গিয়ে সেইখানেই করলে দেখা। তাতে সুবিধা এইটুকু হোল যে সুকুমারকে একটু টুকে দিতে পারলে— কাল এখানে চলে আসা সম্বন্ধে যেন সে ডাক্তারি আপত্তি কোন না তোলে। হাসপাতাল থেকে ফিরে যখন এল সুকুমারের সঙ্গেই, দেখে মাস্টারমশাই এসে গেছেন। আজ অনেক আগেতেই যে, তার কারণ সরমা সঙ্গে নেই; বললেন—স্কুলে এসেছিল, ওঁর কাছে পড়েছেও একটু, তারপর মাথাটা একটু ধরেছে বলে সোজা বাসাতেই গেছে চলে।

সেদিন বৈঠক বেশ জমল না। সুকুমারকে নিয়ে বীরেন্দ্র সিং তখনই উঠে গেলেন সরমাকে দেখতে। বাকি যারা রইল তাদের মধ্যে মৃন্ময়ই চেষ্টা করলে একটু জমিয়ে রাখবার, কেননা সেই মনে মনে বেশি চঞ্চল, তার অঙ্ক পরিণতির দিকে আর এক ধাপ যেন এগিয়েছে।

বীরেন্দ্র সিং একটু পরেই ফিরে এলেন, সঙ্গে সুকুমারও এল, চিন্তিতভাবে বললেন—"ওতো বলছে কিছু নয়, গিয়ে দেখি তুলাকে নিয়ে দিব্যি হুল্লোড করছে·· তাই নয় ডাক্তারবাবু?···কিন্তু ও যদি এখন চিকিৎসার ভয়ে আমাদের দেখাবার জন্যে···"

সুকুমার বললে—"আমিও বলছি হয় নি কিছু, চিকিৎসার দরকারই নেই কোন।"

মাস্টারমশাই একটু অধৈর্য্যভাবেই বলে উঠলেন—"আমি কিন্তু বলি একটু কিছু নিশ্চয় হয়েছেই; আমাদের দুজনের কথাই মিলে যাচ্ছে·"

তুলার সঙ্গে হুল্লোড়ের কথার পর মৃন্ময় আরও অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছে; দাঁতে নখ খুঁটছিল, মাস্টার মশাইয়ের কথায় হুঁস হতেই সামলে নিয়ে বললে—"এটা তো কিন্তু ভোটের ব্যাপার নয়, ভোটের জোরে তাঁকে ওষুধও খাওয়াতে পারা যাবে না।"

একটুখানি হাসি উঠে ও প্রসঙ্গটা বন্ধ হোল। ঠাণ্ডার ভাবটা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই উঠে গেলেন।

পনেরো

তারপর দিন মৃন্ময় একটা কাজের ছুতো ক'রে সকালবেলাই কলের দিকে বেরিয়ে গেল, সেখানে কাজের অজুহাতে কাটালেও অনেকক্ষণ—এ সবই যাতে অসুস্থতার কথা না ওঠে, আবার আটকে না যায়; ওর বাসায় এসে পড়াটা বেশি দরকার হয়ে পড়েছে। অধৈর্যের জন্য একটা সন্দেহও মনে উঠেছে—মাথা ব্যথার নাম ক'রে যেমন এল না সরমা, একটা বড় কিছুর নাম ক'রে চিকিৎসার জন্য টপ করে সরেও তো পড়তে পারে এখান থেকে। স্বামী ডাক্তার, কিন্তু সেও তো সাহায্যই করবে।··তার আগে ওকে চিনে ফেলা দরকার, চিনতে হলে কাছে থেকে ওকে চারিদিক দিয়ে যাচাই করতে হবে—চেহারা, হাবভাব, কণ্ঠস্বর আরও অনেক কিছু; দিনের মধ্যে কখন এক আধবার বৈঠকে দশজনের ভিড়ের মধ্যে দেখা হবে না-হবে—সে ভরসায় থাকলে চলবে না।

অফিস থেকে ফিরে একটু জিরিয়ে জলযোগ করেই সে বেরিয়ে পড়ল। এখানে সব বন্দোবস্তই ঠিক। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি সৌখিন ছিলেন. বিলাতী কায়দায় বাড়িটা সাজানো, বাগানটিও বেশ পরিচ্ছন্ন। ভদ্রলোকের তরিতরকারির সখ ছিল, তার জন্যেও একটা মালী আছে আলাদা। এদিকে একজন পাচক আছে, একটা চাকর, তার নিজের আরদালিটাও বাসায়ই থাকবে; এদের জন্যে আউট-হাউসও রয়েছে।

একবার মোটামুটি দেখা ছিল, এখন ঘুরে ফিরে বেশ ভালো ক'রে দেখেশুনে নিতে, চাকর-বাকরদের নির্দেশ দিতে খানিকটা সময় গেল। আসবাবগুলার সংস্থানের খানিকটা রদ-বদল করলে; পড়ার সখ আছে, বৈঠকখানার পাশে একটা লাইব্রেরীর ঘর ঠিক করে ফেললে।

এইভাবে সন্ধ্যা প্রায় উৎরে গেল। খবর নিয়েছে হাসপাতালে সবাই এসে গেছেন, মাঝে মাঝে মাস্টারমশাইয়ের হাসির তরঙ্গও আসছে ভেসে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে বললে—ঠিক করলে সেটুকু খেয়ে নিয়ে যাবে, যদি ততক্ষণ পর্যন্ত ওরা থাকে ব'সে। একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন ক'রে জেনেছে সরমা আসে নি, শুনে পর্যন্ত আর তার ওদিকে যাবার তেমন উৎসাহও নেই। যেটুকু বা আছে, ক্লান্তির মধ্যে সেটুকুও যাচ্ছে কমে। অন্তত চাযেব একটু চাড়া না দিয়ে নিলে স্থবিধে হবে না।

চা খেতে খেতে ওদিকে আবার উৎসাহটা এল আরও কমে, কিন্তু চিন্তায় এল একটা শক্তি। একটা যে গলদ আছে, এতে আব কোন সন্দেহ নেই মৃন্ময়ের, মেয়েটা ক্রমাগতই তাকে পরিহার করে চলেছে। সেই হয়েছে ভাবনা, ও যে সত্যটা উদ্ঘাটন করবে, তার জন্ত দেখা পাওয়া চাই তো। আজকের চান্সটাও নষ্ট হোল ··সময় তো যাচ্ছে চলে, ওদিকে ওদের তুজনের প্ল্যান কি কে জানে?

জিজ্ঞাসা করল—"ঠাকুর, চা আর আছে কি?"

ঠাকুরেরা শুধু মনিবের জন্তই চা করে না।·· তখনও শেষ করে নি, তাড়াতাড়ি এনে হাজির করলে।

দ্বিতীয় কাপটা খেতে খেতে মাথাটা আরও পরিষ্কার হোল, মনে পড়ল ভিজিটের কথা, বিলাতী কায়দায় তারই আগে গিয়ে দেখা করা দরকার।

এখনই উঠবে? · পাতুটো চঞ্চল হয়ে উঠেছে, মৃন্ময় জোর করেই তাদের সংযত করলে—না এখন নয়, রাত্রে নয়, কে জানে কি ভাবে আড়াল বেছে নিয়ে, আলোর দিকে পিঠ ক'রে বসবে, অসুস্থতার ভান চলছেই, হয় তো বসবার ঘরে বেরুবেই না, বেরুলেও অতিথির সামনে নীরব বা স্বল্পবাক থাকতে বাধা নেই; হয়তো মৃন্ময়কেই বাধ্য করাবে বলতে—"আপনি অসুস্থ, একটু আরাম করুন গিয়ে ···ডিসটার্ব ক'রে ভুলই করলাম।"

তার চেয়ে কাল সকালে, স্পষ্ট দিনের আলোকে, একেবারে সম্মুখে রণ···যখন নূতন অজুহাত সৃষ্টি করবার অবসর হয়নি সরমার—সমস্ত দিন কি ক'রে এড়িয়ে চলবে তার প্ল্যানও গড়া হয়ে ওঠেনি।

তারপর সম্মুখে গিয়ে রণের কি কি কৌশল বিস্তার করবে মনে মনে ঠিক করছে এমন সময়, যেন তার বাড়ির চৌহদ্দির অল্প একটু দূরেই মাস্টারমশাইয়ের কণ্ঠের বিরাট হাসি হিল্লোলিত হ'য়ে উঠল। বেশ একটু বিরক্তই হোল মৃন্ময়, তারপর সে-ভাবটা সামলে নিয়ে, চায়ের সরঞ্জামগুলা সরাতে বলে যতক্ষণে বেরিয়ে আসবে ততক্ষণে কয়েক জোড়া জুতার খট-খট খস-খসানির সঙ্গে সমস্ত দলটি বারান্দায় এসে উঠেছে নীরেন্দ্র সিং, সুকুমার, মাস্টারমশাই, সরমা, আরও কে একজন।

সবার আগে মাস্টারমশাই, তাঁর মুখে হাসির জেরটা লেগে রয়েছে তখনও। তাঁর পাশেই সরমা, সেও একটা হাসিকে সংযত করবার জন্যে ঠোঁট দুটো একটু চেপে রয়েছে ; একেবারে সামনে থাকার জন্যে বারান্দার আলোটা, তার সঙ্গে পরদা টেনে দেওয়ায় ঘরের আলোটাও সোজা তার মুখের ওপর এসে পড়েছে।

সরমা হাসিটাকে একটু স্পষ্ট করে কপালে জোড়হাত তুলে বললে —"নমস্কার।"

মৃন্ময় একেবারে থতমত খেয়ে গিয়েছিল, ভুলটাতে একটু অপ্রতিভ হ'য়ে তাড়াতাড়ি প্রতি-নমস্কারটা সেরে বললে—"আসুন।" ওদের হাত তোলবারও আগে সবাইকে নমস্কার ক'রে অভ্যর্থনা করলে।

কথাও আগে আরম্ভ করলে সরমাই, বললে—"আমি এসেছি বলতে আজকে রাত্তিরে আমাদের ওখানেই যা জোটে দুটি খেতে হবে।"

—খুব সপ্রতিভ, সেদিন যে-সরমা সন্ধ্যার অন্ধকার খুঁজছিল, সবার আড়াল খুঁজছিল বলে মনে হচ্ছিল মৃন্ময়ের, আজ সে যেন সবাইকে আড়াল করেই মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথম পরিচয়ের নারীসুলভ একটা ব্রীড়া আছে, কিন্তু জড়তা নেই। একটু হাসিমুখ ক'রে উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

মৃন্ময় আমতা আমতা করে বললে—"আপনি অসুস্থ···আজ হাঙ্গাম না করলেই পারতেন · এমনই তো আপনাদের ভরসাতেই···"

সরমা উত্তর করলে—"অসুস্থ, সে-হেতু সামান্য একটু মাথা ধরাকে বাড়িয়ে বলবার লোক আছেন আমার দিকে—দাদু, বুবুয়া। ··গুরুজন বলে ওঁদের কথা মেনে নিলেও হাঙ্গাম তো কিছু করছি না, যা জোটে খাবেন।"

মাস্টারমশাই ভেতরের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন—"এসো, বসা যাক···আমি করেছিলাম বারণ, কিন্তু শুনলে না। আর সত্যিও, আপনি এই প্রথম দিন এলেন আমাদের পাড়ায়, বেবন্দোবস্ত—পাশেই হিন্দুর মেয়ের গৃহস্থালি—পারে না তো নিজের মুখে গ্রাস তুলতে।"

সরমা একটু রাগের অভিনয় করে বললে—"থামুন দাদু, আবার আপনি বাড়াচ্ছেন, আরও যেটুকু অনুরোধ ওঁকে করবার আছে· শুধু প্রথম দিন বলেই বা কেন?···"

তারপর সুকুমারের দিকে চেয়ে বললে—"তুমিই বলোনা।"

সুকুমার বললে—"হ্যাঁ, সরমা বলছিল—এখন কয়েক দিন আমাদের ওখানেই ব্যবস্থা হোক, তারপর আপনার ঠাকুরটা ট্রেন্‌ড্‌ হয়ে গেলে···"

বীরেন্দ্রসিং তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—"কেন, ঠাকুরটা তো এক্‌স্‌পার্ট!···না, আপনাদের আতিথ্য নেন তাতে আপত্তি করছি না, কিন্তু আমার রাখা ঠাকুর···"

সরমা ঘাড় ফিরিয়ে তাঁর দিকে চাইলে, বললে—"বুবুয়া, আপনি এই বাসার জন্য ঐ এক ঠাকুর বাঁধা রেখে দিয়েছেন! ভেবেছেন এক্‌স্‌পার্ট বলে পাঞ্জাবী এলে তাকে যেমন রুটি মাংস রেঁধে খাওয়াবে—বাঙালী এলে তেমনি শুক্ত-ঘণ্ট রেঁধে দেবে, আবার মাদ্রাজী এলে ঠিক তেমনি করেই লঙ্কা-তেঁতুলের চিন্তাপাণ্ডু না কি বলে ·"

মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে অন্য সবাইও হো-হো করে হেসে উঠলেন, তার মধ্যেই এগিয়ে গিয়ে এক একটা আসন নিয়ে বসলেন।

কিন্তু মেলামেশার এত বড় সুযোগ মৃন্ময় কি ভেবে প্রত্যাখ্যানই করলে, অবশ্য খুব বিনয়ের সহিতই। বললে—সে যাযাবর, পৃথিবী ঘুরে এসে লখ্‌মিনিয়ার পাচককে ভয় করলে তার চলবে না। আরও তর্ক-বিতর্কের পর একটা রফা হল, তার পাচক আগে থাকতেই গিয়ে রোজ সরমার কাছ থেকে রাঁধবার ফিরিস্তি নিয়ে আসবে, পদ্ধতিটাও আসবে জেনে; শুধু সে ঠিক তোয়ের হচ্ছে কিনা মেলাবার জন্যে ততদিন পর্যন্ত মাঝে মাঝে মৃন্ময়কে সরমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হবে

এ কথাবার্তাগুলো হল—ঘুরে ফিরে বাসার ঘর-দোর, আসাবপত্র, নূতন করে

সাজানোর স্টাইল—এই সব দেখতে দেখতে ; তর্ক হচ্ছে, মন্তব্য হচ্ছে, মাঝে মাঝে হাসি উঠছে। এবপর কিন্তু সরমার ঠিক এই ভাবটা রইল না। সে বাড়ির গৃহিণী, সেই হিসাবে নিমন্ত্রণ করাটা তারই ছিল দরকার, সেটুকু সেরে সে যেন নিজের জায়গাটিতে ফিরে গেল। অবশ্য সেদিনকার মতো সঙ্কোচের কিছুই নেই, সামনেই মাস্টাবমশাইযেব পাশে স্পষ্ট ভঙ্গিতে রইল বসে ; আলাপ আলোচনায় যোগ দিলে, মুক্তকণ্ঠে হাসলেও যেখানে হাসবার, তবে এখন আর সবতাতেই সেবকম অগ্রণী হয়ে নয়। গল্প জমে উঠল, বোঝা গেল চলবে খানিকক্ষণ। বোধহয় সেইটে আন্দাজ কবেও সবমা এক সময় দাঁড়িয়ে উঠল, বললে—"আমায় তাহলে যদি যেতে দেন · ওদিকে আবাব···"

বীরেন্দ্রসিং বিস্মিত হয়ে বললেন—"বাঃ, উঠলে যে! বোস, নৈলে উনি ভাববেন বুঝি যা-জোটে তাই খেতে বলে শেষে সত্যিই হাঙ্গাম করতে চললে।"

মাস্টাবমশাই বললেন—"হ্যাঁ, কথায় বিশ্বাস হ'লে আবাব ভাববেন এই লোকেরই নেমতন্ন তো, যাওয়াটা উচিত হবে কি না – কী আছে অদৃষ্টে···"

প্রচণ্ড যে হাসিটা উঠলো তাতে সবমা রাঙাই হয়ে উঠল এবার, মৃণ্ময়ই তাকে উদ্ধাব করলে, বললে—"না, আপনি যান, শুধু ঠাকুর-চাকবেব হাতে ছেড়ে দিলে যে ধরনের হাঙ্গামাটা বাঁধতে পাবে তাব জন্য আমি প্রস্তুত নই।"

মাস্টাবমশাই বীরেন্দ্রসিংকে নিয়ে আরও জন দশেকের নেমতন্ন ছিল। সেখানেও জমাট মজলিস, খাবাব আগে, খাবাব সময়, খাবার পরও খানিকটা। সবমা এসে বসল অবশ্য শেষ কালটায়। ও'দিকে তদারক করতে, পরিবেশনে সাহায্য করতে লেগে গেল। ঘোবাফেবা করতে হচ্ছে, ব্যস্ত, কিন্তু স্বচ্ছন্দগতি ; তার মধ্যে কথাও হচ্ছে, নূতন অতিথি বলে মৃন্ময়েব সঙ্গেই বেশি, অল্প আহারের জন্যে অনুযোগ, এটা-ওটা খেতে অনুরোধ—মোটকথা প্রথম দেখা হওয়া থেকে গভীর রাত্রে বিদায় নেওযা পর্যন্ত সবরকমেই তাকে দেখবার সুযোগ হল, মৃন্ময়ের মনে হল—সবমা যেন ইচ্ছে করেই দিলে সুযোগ—কথায়-বার্তায়, হাসিতে, গাম্ভীর্যে, গতি-ভঙ্গিতে ; তাকে চিনে নেবার কিছু লুকিয়ে রাখলে না সরমা।

কিন্তু আজই যেন তাকে সবচেয়ে কম দেখা হল।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে সেই কথাই ভাবছিল মৃন্ময়।

সে ভাবছিল সম্মুখরণে নামবে, কাল সকালেই ; কিন্তু তার আগেই এমন উগ্র স্পষ্টতায় সরমা নিজেই তার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল যে মৃন্ময়ের চোখ দুটো যেন দিলে ধাঁধিয়ে একেবারে। তাই হয়েছে, ও যখন কথা কয়েছে—মৃন্ময় তখন ভালো করে মুখের উপর চোখ রেখে দেখতেই পারে নি আজ ; ও যখন তার দিকে চেয়ে হেসেছে, একটা তিরস্কারেই যেন তার নিজের হাসি এসেছে স্তিমিত হয়ে, এমন কি যখন সুবিধাও ছিল দেখবার—সরমার দৃষ্টি ছিল যখন অন্যদিকে, সে যখন কাজের মধ্যে ঘোরাফেরা করে বেড়িয়েছে, তখনও আজ কি একটা অদম্য সঙ্কোচে মৃন্ময় মুখ তুলে চাইতে পারেনি তার দিকে।

অদ্ভুত মনে হচ্ছে মৃণ্ময়ের। সমস্তটাই যদি নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে অর্থাৎ সরমা যদি সত্যই ছিল অসুস্থ, তারপরে সুস্থ হয়ে তার এই সহজ, নিঃসন্দিগ্ধ রূপ, তাহলে আলাদা কথা। যদি তা না হয়, সমস্তটাই যদি সরমার ইচ্ছাকৃত, সম্মুখরণের সন্দেহ ক'রে নিজেই আগে-ভাগে এসে সম্মুখরণ দেওয়া, তাহলে সত্যই বিস্ময়কর। তার সম্বন্ধে মন শতগুণ কৌতূহলী হয়ে ওঠে। চিন্তার ক্লান্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্য—যেন সরমার হাত থেকেই মুক্তি পাবার জন্য, মৃন্ময় এক সময় উঠল, ড্রয়ারের মধ্যে থেকে একটি সুরার বোতল বের ক'রে গেলাসে খানিকটা ঢেলে পান করে ফেললে। এখানে এই প্রথম ; পরিবেশ না বুঝে একেবারে বন্ধ রাখার ক্ষমতা ওর আছে।

পেলে সরমার হাত থেকে মুক্তি—তার জায়গায় যে রঙীন একটি আলো চিন্তার চারিদিকে উঠল ফুটে তার মাঝখানটিতে এসে দাঁড়াল অন্ধকারময়ী রুম্মা।

ষোল

এর পর একটা দীর্ঘ বিরতি গেল এই লুকোচুরি খেলায়।

হঠাৎ এমন একটা বিপদ এসে পড়ল যাতে মনে হ'ল বস্তি আর কল নিয়ে সমস্ত কলোনিটা দেবে ভাসিয়ে।

ওপরের কৃত্রিম নূতন হ্রদটা, যেটা নিচের হ্রদের প্রায় তিনগুণ, সেটা জলে প্রায় কাণায় কাণায় হয়ে উঠেছে পাহাড়ে হঠাৎ কয়েকটা বৃষ্টিতে। এমনি এটা চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল, কেননা সেচের দিকের সব ব্যবস্থা না হয়ে ওঠায় ইচ্ছামতো জল নিকাশের কোন উপায় নেই এখন। এখানে পাঞ্জাবী ইন্‌জিনিয়ারের একটু ভুল ছিল, কিন্তু কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে বলে মৃন্ময় আর কিছু করতে পারলে না। তা' ভিন্ন একবার সমস্ত কাজটা হয়ে গেলে, দুদিক দিয়ে জল নিকাশের ব্যবস্থা হয়ে গেলে আর ভয়ও থাকবে না। দিবারাত্রি কাজ চালিয়ে সেই চেষ্টাই হচ্ছিল। এই সময়, এই অসময়েও হঠাৎ পাহাড়ে কয়েক ঝোঁক দমকা বৃষ্টি হয়ে জলটা হঠাৎ গেল অতিরিক্ত বেড়ে।

এটা, সুকুমারের ওখানে যেদিন নিমন্ত্রণ ছিল তার দু'দিন পরের কথা। এইতেই চিন্তার চাপটা রুম্মা-সরমার দিক থেকে একেবারে এদিকে সরে এসেছিল, তার ওপর তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় হঠাৎ একটা খবরে মৃন্ময়ের মাথা গেল একেবারে ঘুরে।

সমস্তদিন ওদিকে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে বাসায় এসে চা খেয়ে এইমাত্র বেরিয়েছে, হাসপাতালে যাবে, রুম্মার মেয়ে তুলার সঙ্গে দেখা হ'ল। একটি কালো প্রজাপতি যেন স্কুলের মাঠে খেলতে গিয়েছিল, সেই খেলারই জের শরীরে মেখে কখনও চলতে চলতে কখনও নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরছে। ভালো লাগল বলে একটা কিছু কথা কইবার জন্যেই মৃন্ময় প্রশ্ন করলে—"তোর রাঙা মা, রাঙা বাবা কোথায় রে তুলা? বাসাতেই?"

তুলা নাচের ঝোঁকেই থেমে গিয়ে হঠাৎ হাততালি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ; সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটো বুকে জড়ো করে একটু ঝুঁকে কাৎ হয়ে বললে—"হুঁ, বাড়িতেই।"

থাকবার তো কথা নয়। তবু কি মনে হতে প্রশ্ন করলে—"ঠিক জানিস ?"

তুলা ইতিমধ্যে একটা চক্কর দিয়ে দিয়েছে, "হুঁ ।"—বলে ঘাড়টা একটু বেশি কাৎ করলে।

অগ্রাহ্য করে এগিয়েই যাচ্ছিল, হঠাৎ খেয়াল হোল, আবার অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে তো সরমা। থেমে গিয়ে প্রশ্ন করলে—"অসুখ করেনি তো ?"

"না, অসুখ কেন করবে ?"

মৃন্ময় এ খবরটা গ্রাহ্য করলে না, ছেলেমানুষ অসুখের বোঝে কি ? অনেকগুলা কথা মনে হ'ল, তার জন্যে সরমাকে আর একবার অসুস্থতার মধ্যে যাচাই করবার লোভটা হয়ে উঠল প্রবল। বললে—'চল্, তোদের বাসা হয়েই যাই !"

বাইরে থেকে সাড়া শব্দ না পেড়ে অসুস্থতারই সন্দেহ ক'রে একেবারে ভেতরে গিয়ে উঠল। তুলা বৈঠকখানা পেরুতে পেরুতেই উৎসাহভরে বলে উঠল—"রাঙামা, দেখো কাকে নিয়ে এসেছি !" রান্নাঘরের দিক থেকে উত্তর এল—"যাই, বসা।"

"আপনি বসবেন ততক্ষণ ; হ্যাঁ তো ? আমি মুখে-হাতে সাবান দিয়ে আসছি।"

কথাগুলো বলে হাতটা ছেড়ে দিয়ে তুলা বাথরুমের দিকে ছুটে গেল। এরা যে নেই এতক্ষণে টের পেয়েছে মৃন্ময়, তুলা হয় খেলতে যাবার সময় দুজনকে দেখে গিয়েছিল, সেই ধারণাতেই কথাটা বলেছে, না হয় টেনে নিয়ে আসবার আনন্দেই এনেছে টেনে। রান্না ঘরের দিক থেকে উত্তর যে এল তাও সরমার নয় রুম্মার। ফিরে আসবে, ততক্ষণে রুম্মা এক রকম ছুটতে ছুটতে উঠান পেরিয়ে রকে উঠেছে।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে—"আপনি ! আমি ভাবলাম···কেউ কেউ এসে পড়েন তো কখনও কখনও ?"···

উত্তর দিতে মৃন্ময়ের একটু দেরি হ'ল, কথাগুলা যেন গলায় আটকে গেছে।··· "বললে—তোমার মেয়ে আমায় ধরে নিয়ে এল, বললে ওঁরা আছেন।"

"দেখুন তো !"—বলে রুম্মা বিস্ময়ে গালে দুটো আঙুল চেপে ধরলে, তারপর হাঁক দিলে—"দুলা !"

মৃন্ময় হেসে বললে—"তাতে হয়েছে কি ? ভুল করেছে—খেলতে যাবার সময় যে দেখে গিয়েছিল তাঁরা আছেন, সেইটেই মনে ছিল বোধ হয় ?"

রুম্মা রাগতভাবেই মুখটা ভার করে বললে—"ভুলের একটা সীমা থাকা চাই তো···মিছিমিছি টেনে আনা আপনাকে কষ্ট দিয়ে · "

এবারেও একটুখানি বিলম্ব হ'ল উত্তরটা দিতে মৃন্ময়ের, তারপর কতকটা যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"কষ্ট আর কি, ওর ভুলে আমার বরং লাভই হ'ল একটা "

আবার একটু বিরতি দিয়ে রুম্মার মুখের ওপর দৃষ্টি ফেললে, তারপরই বললে—"মানে...আমি ভেবেছিলাম তাহলে সরমা দেবী বোধ হয় অসুস্থই হয়ে পড়ে থাকবেন আবার ; বাড়িতে রয়েছেন—তা—তাহ'লে নয়...মনটা হালকা হ'ল। আচ্ছ , আমি যাই।"

যেতে যেতে আবার ঘুরে বললে—"তুমি ওকে কিছু বোলনা যেন—আমার অনুরোধ।"

হালকা পেগের গোলাপী নেশার মতো মাথাটা ঝিম ঝিম করছে।...'লাভের' অর্থটা রুম্মা কি ধরতে পারলে ? · পেরেছে নিশ্চয় ; ওর মুখে-চোখে বুদ্ধির দীপ্তি ; কিন্তু সে-দীপ্তির অন্তরালে আছে কি তাতো বোঝা গেল না।···একটা কথা ঠিক, আবার ফিরে যখন দুলাকে কিছু না বলতে অনুরোধ করলে তখন দেখে—রুম্মা তার দিকে চেয়েই দাঁড়িয়ে ছিল—স্থির দৃষ্টিতে···

সেই বিহ্বল, শান্ত বন্য হরিণীর দৃষ্টিতে কি ছিল—রাগ কি অনুরাগ, চিন্তা করতে করতে অলসচরণে হাসপাতালের দিকে খানিকটা এগিয়েছে, এমন সময় পেছনে খানিকটা দূরে ত্রস্ত কণ্ঠস্বর কানে গেল—"হুজুর ! ··বড়া সাহেব ! ইঞ্জিনিয়ার সাহেব"।

মৃন্ময় ঘুরে দাঁড়াল। জন চারেক লোক প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে এসেছে, হাঁপাচ্ছে, কথা বেরুচ্ছে না মুখ দিয়ে, তারই মধ্যে জড়াজড়ি ক'রে যা জানালে তার

মর্মার্থ এই যে সর্বনাশ হয়েছে, সামনের বড় বাঁধটায় দু' জায়গায় চিড খেয়ে গিয়ে তাই দিয়ে তরওয়ালের মতো পাৎলা জলের ধারা ছিট্‌কে আসছে।

"সে কি! আমি যে এখুনি সব তদারক ক'রে আসছি!"—বলতে বলতেই মৃন্ময় বাসার দিকে প চালিয়ে দিলে। যেমন ছিল সেই অবস্থাতেই গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করে ওদের মধ্যে তিনজনকে তুলে নিলে, একজনকে হাসপাতালে গিয়ে বীরেন্দ্রসিংকে খবর দিতে বলে একেবারেই জোরে মোটর চালিয়ে বেরিয়ে গেল।

গিয়ে দেখলে সত্যই সর্বনাশের উপক্রম। নূতন কলোনির দিকটায—যে দিকটায় কল আব বস্তি—বাঁধের গায়ে দুটো মিহি ফাটলের মধ্যে দিয়ে তীক্ষ্ণ ধাবায জল বেরিয়ে নিচে পড়ছে। বাঁধের নিচেই একটা সরু জমির ফালি বাঁধেব সমান্তরালে এ-মুড়ো ও-মুডো চলে গেছে—কোথাও দশবারো হাত, কোথাও আবার বিশ-বাইশ হাত চওড়', এবই একজায়গায় হাইড্রো-ইলেকট্রিকের ঘরটা, তারপবেই খানিকটা নিচে ছোট ঝিলটা।

বিপদটা এমনিই গুরুতর। আড়াইতলা, তিনতলা উঁচু বাঁধের পেছনে বিবাট জলরাশির চাপ, তাও তিনটে নদীতে অল্পসময়ের মধ্যে জলটা এনে ফেলায় বাঁধেব গায়ে তার জোবটা হয়েছে আকস্মিক। এর ওপর ফাটল দুটো ধরেছে বড় খারাপ জায়গায়, নিচের ঝিল থেকে বাঁ দিকে বাঁধটা যে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেছে তারই দু'জায়গায়; ঠিক এর নিচে, সামনেই পড়েছে কাপড়ের কল আর শ্রমিক বস্তিটা। ফাটল দুটোর মধ্যে তফাৎ প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাত। অর্থাৎ বাঁধ যদি ভেঙে উলটে পড়েতো ওপর থেকে যে প্রচণ্ড জলের তোড় নামবে, তাতে কল বস্তি সব ধুয়ে-মুছে নিঃশেষ করে দেবে।

মৃন্ময় এসে দেখলে চেঁচামেচি খানিকটা হ'লেও বিপদের গুরুত্বটা লোকে ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারে নি। প্রথমেই সে একজন লোককে বস্তির দিকে আর একজনকে কলের দিকে পাঠিয়ে দিলে, বস্তি খালি করিয়ে ফেলতে আর কল যদি ফিট্‌ হয়েছে তার যতটা সম্ভব খুলে সরিয়ে ফেলতে। তারপর সে নিজে টর্চ নিয়ে জনদুয়েক সহকারীকে সঙ্গে করে বাঁধের ওপর উঠল। বীরেন্দ্র সিং, সুকুমাব, মাস্টারমশাই প্রভৃতি কয়েকজনকে সঙ্গে করে মোটরে এসে যখন পৌঁছুলেন, দেখেন

তিনজনে বাঁধের অর্ধেকটা চলে গেছে, মৃন্ময়ের হাত থেকেই টর্চের আলো বাঁধের গা বুলিয়ে এগিয়ে চলেছে। এঁরা উঠতে যেতেই মেট গোছের কয়েকজন সামনে এসে হাত জোড় ক'রে জানালে—বড়সাহেব কাউকে উঠতে বারণ ক'রে গেছেন। বীরেন্দ্র সিং, সুকুমার তবুও পা বাড়াতে যাচ্ছিল, মাস্টারমশাইয়ের কথায় নিরস্ত হ'ল। সমস্ত বাঁধটা ভালো ক'রে তদারক করে ফিরতে মৃন্ময়ের প্রায় ঘণ্টাখানেকের কাছাকাছি দেরি হ'ল। বললে আর কোথাও ফাটল নেই, বাঁধের ফটকটাও পুরোপুরি খুলিয়ে দিয়ে এসেছে, কিন্তু জলের চাপ এত বেশি যে তা দিয়ে জল যা বেরুচ্ছে তাতে কিছু হাল্কা হবার আগেই সর্বনাশটা ঘটে যেতে পারে।

কিছু করবার নেই। বাঁধের একেবারে শেষে পাহাড়ের বিস্তীর্ণ তলদেশে এঁরা সবাই বসে আছেন। জ্যোৎস্না রাত্রি, বাঁ দিকে হ্রদের বিস্তীর্ণ জলরাশি, যতদূর দৃষ্টি যায় চিক চিক করছে ; সামনেই দীর্ঘ পাথরের বাঁধটা একটা বিরাট অজগরের মতো গা আছে পড়ে, তারই গা ভেদ্ ক'রে হাত পঞ্চাশ-ষাটের মধ্যে দুটি জলের ধারা উৎক্ষিপ্ত হয়ে নিচে পড়ছে—রূপার পাতে গড়া দুখানি যেন ঘূর্ণমান চক্র, জ্যোৎস্নায় ঝিক্‌মিক করছে।...অথচ এই নিতান্ত নিরীহ দৃশ্যপটের পেছনেই রয়েছে একটা বিরাট অঘটন, যে কোন মুহূর্তেই তা পড়তে পারে এসে।

কিছু করবার নেই বলে সবাই একরকম চুপ করে আছেন। নিচে, খানিকটা দূরে দূরশ্রুত একটা কোহাহল, বস্তির লোকেরা ঠাঁইনাড়া করছে। রাত খানিকটা এগুতে বাজারের দিক থেকেও কিছু কিছু লোক এল ব্যাপারটা দেখতে—খবরটা সেখানে ছড়িয়েছে ; বিশেষ কিছু দেখতে না পেয়ে নিরাশ হয়ে চলে গেল।

মৃন্ময় বাইরে বাইরে অত্যন্ত স্থির, তার মানে ভেতরটা অতিশয় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ওর অধস্তন অফিসাররা সবাই এসেছে, তাদের সঙ্গে করে ও আরও একবার বাঁধটা ঘুরে এল ফাটল পর্যন্ত, একজন কুলির মেটকে দিয়েছে সমস্তটা পায়চারি করতে। ফাটলের কাছ থেকে ঘুরে এসে বীরেন্দ্র সিংকে বললে—"থলে চাই আমার, যত বেশি হয়।"

বীরেন্দ্র সিং বললেন—"থলে ? বাঁধের সিমেণ্টের গুলো সব লটে বিক্রি হয়ে গেছে, লথ্‌মিনিয়া থেকে বেরিয়ে গেছে।·· বালির বস্তা ফেলবেন ?"

"এখনও ঠিক করিনি, তবে তোয়ের থাকতে হবে। বাঁধের কাজে থলেগুলোর কথা শুনেছি এদের কাছে। তবু বাজারেও একবার পাঠান্ লোক, এদিকে কলে, বস্তিতেও দেখুক, বাড়ি ঘর তোয়ের করতে পারে যা সিমেণ্ট এসেছে তার থলেগুলো থাকতে পারে।

তারপর যে কথাটা সবার মনেই উদয় হয়ে থাকতে পারে, অথচ ভদ্রতার খাতিরে বলতে পারছেন না, তার উত্তরটাও নিজে হ'তে দিলে, বললে—"বস্তি থেকে থলে আনবার কথা এতক্ষণ বলিনি তার কারণ ওদের আগে বাসা খালি ক'রে সরে যাওয়া দরকার ছিল। এবার পাঠান লোক ওদিকেও।"

আর একবার ঘুরে এসে বললে—"বস্তাগুলো সমস্ত রাত ভ'রে ঠিক করে রাখুক। রাত্তিরে ফেলা চলবে না, তার একটা কারণ চাঁদ আসছে ডুবে, ফাটলের মধ্যেকার অংশটিতে কি রকম জোর আছে, এর ওপর ভিড় করা চলবে কিনা তাও রাত্তিরে বোঝা যাচ্ছে না। দিনে দিনে ফেলবার একটা কারণ, ফেলবার আগে ভেতর দিকে ফাটলের অবস্থাটা দেখা একবার বিশেষ দরকার; সেটা যদি বাইরের দিকের চেয়ে খুব বেশি হয় তো অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।"

বীরেন্দ্র সিং প্রশ্ন করলেন—"কি ব্যবস্থা?"

উত্তরটাতে সামান্য যে দেরি হ'ল, তাতে বোঝা গেল ইচ্ছে করেই যেন আসল কথাটা লুকুলে মৃন্ময়, বললে—"কয়েকটা অলটারনেটিভ্ ভাবছি; কিন্তু এখনও ঠিক করি নি।"

হাতঘড়িটা দেখে বললে—"কিন্তু আপনারা আর কষ্ট করছেন কেন? রাত দশটা হয়ে গেছে, আমায় থাকতে হবে সমস্ত রাত। আপনারা যান, যতদূর দেখছি বিপদের সম্ভাবনা নেই।"

স্কুমারের দিকে চেয়ে বললে—"আপনি গিয়ে আমার খাবারটা পাঠিয়ে দেবেন মিস্টার সেন?"

রাত্রিটা নির্বিঘ্নে কেটে গেল।

ভোরে তিনজনেই বাসার দিকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, মৃন্ময় তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে চা খেয়ে বেরুবে, তার আগেই ছুটতে ছুটতে আবার লোক এসে হাজির হ'ল—একটা ফাটল বেড়ে গিয়ে একটা বাঁধ যেন একটু কাৎ হয়েছে।

গিয়ে দেখে রাত্রের তুলনায় দুটো ফাটলই গেছে বেড়ে, একটাতে জলের ধারা বেশ মোটা হয়ে উঠেছে। বাঁধের ওপর গিয়ে দেখলে ফাটলের মুখ সত্যিই প্রায় দেড় ইঞ্চি আগে পিছে হয়ে গেছে, যার মানে মাঝখানের অংশটা ঐ পরিমাণ গেছে হেলে।

নিজের মোটরটাই বীরেন্দ্রসিংহের ওখানে দিলে ছুটিয়ে। তাঁর আসতে একটু বিলম্ব হ'ল। ততক্ষণে খবরটা কি ক'রে বর্ধিত আকারে ছড়িয়ে গিয়ে বাজার থেকেও কাতারে কাতারে লোক আসতে আরম্ভ হয়েছে। এদিকে বস্তির শ্রমিকরা আগে থাকতেই হয়েছে হাজির। মৃন্ময় নিজের সহকারীদের নিয়ে বাঁধটাকে নানাভাবে পরীক্ষা করছিল আওয়াজ নিয়ে, ফাটলের মুখে দড়ি ফেলে, বীরেন্দ্রসিং আসতে নেমে এসে বললে—"কলের কুলিরা তোয়েরই আছে, কিন্তু তাতে হবে না, বাজার থেকেও লোক চাই, আপনি ব্যবস্থা করুন।·· কিন্তু আসল কথা, যার জন্যে আপনাকে খবর দিয়ে পাঠিয়েছি—একজন লোক চাই, ভালো ডুবুরি, সে ফাটলের মুখে নেমে দেখবে ভেতর দিকে গর্ত কি রকম, কহাত চওড়া, ভেতরে কতটা···"

বীরেন্দ্রসিং মনে মনে একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, না ভেবেই বললেন—"তা বোধহয় পাওয়া যেতে পারে; এত লোক, ডেকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখলে···"

মৃন্ময় বললে—"কিন্তু একটা ভাববার আছে—যে নামবে সে নাও উঠে আসতে পারে; সেইজন্যেই আপনার মত নেওয়া, নয়তো আমিই তো ব্যবস্থা করতে পারতাম। ভেতরে ফাটল যদি খুব বেশি হয়—স্রোত ঢুকছে, তাকে একরকম চুষে নিতে পারে···"

স্থির দৃষ্টিতে মুখের পানে চেয়ে থেকে বললে—"দয়া করে শীগ্‌গির আপনাকে ঠিক করে ফেলতে হবে।"

বীরেন্দ্রসিং একবার মমতার দৃষ্টিতে নিচের সমস্ত কলোনিটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন, তারপর বেশ দৃঢ় অথচ কাতর কণ্ঠে বললেন—"যাক সব ভেসে মৃন্ময়বাবু, আমার লখমিনিয়ার জন্যে অন্যের প্রাণ যাবে কেন?"

মৃন্ময়ের সব উত্তর ঠিক করাই ছিল, একবার ঝিলের ওপারে দৃষ্টি বুলিয়ে বললে—"কিন্তু একটার জায়গায় অনেক প্রাণ চলে যেতে পারে বীরেন্দ্রবাবু, এক্ষুনি। এই বাঁধ যদি এখুনি ভাঙে—এটুকু যদি ভাঙে আরও ভাঙবার সম্ভাবনা—তাহলে আপনার ঐ সামনের আশ্রম, হাসপাতাল—এর চেয়ে এত নিচু জমিতে—তায় ঝিলটা ভরা রয়েছেই--বুঝতেই পারছেন—কোটালের বানের মত জল গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে—এখন লোক পাঠিয়ে যে ওদের সরিয়ে ফেলবেন তারও সময় নেই আর।"

এত ব্যাকুল এর আগে দেখে নি বীরেন্দ্রসিংকে, শক্ত লোক বলেই জানত। প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন—"কোন উপায় নেই মৃন্ময়বাবু?"

একবার অসহায় ভাবে দৃষ্টিটা চারিদিকে বুলিয়ে নিয়ে বললেন—"আমি নিজে যে সাঁতারের কিছু জানি না···রাজার বাড়ির অপদার্থ ছেলে···"

মৃন্ময় তাঁর হাতটা ধরলে, বেদনাসূচক কণ্ঠেই বললে—"ওইজন্যে এসেই আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম বীরেন্দ্রবাবু, এমন সোনার জায়গায় এসব এনে ফেললেন কেন?···থাক, আপনি এতটা ভয় পাবেন না, আমি যা হোতে পারে তার কথাই বললাম, হবেই যে এমন কিছু কথা নেই, সেই জন্যেই প্রাণপণে করছি চেষ্টা। চলুন ওই উঁচু জায়গাটায় গিয়ে ডেকে বলতে হবে, আপনি বরং পাশে দাঁড়ান, আমিই বলি, বিপদের কথাটা আমি বুঝিয়েই বলবো, তা সত্ত্বেও যে আসতে চায় আসবে, জোর করা হচ্ছে না তো···"

এত লোকের মধ্যে মাত্র পাঁচজন হাত তুললে, একজন এদেশী আর চারজন সাঁওতাল। দেশী লোকটিকে এ কাজের পক্ষে দুর্বল মনে হওয়ায় তাকে ছেড়ে দিয়ে মৃন্ময় সাঁওতাল চারজনকে এগিয়ে আসতে বললে। তাদের মধ্যে থেকে

একজনকে বেছে নিয়ে, তাকে সমস্ত বুঝিয়ে বাঁধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় একটা কাণ্ড হ'ল।

মৃন্ময় যখন অবস্থাটা বুঝিয়ে সবাইকে আহ্বান করছিল, কতকটা নাটকীয় ভঙ্গিতে, ওদের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করবার জন্যেই, সেই সময়ই তার লক্ষ্য গেল, সাঁওতালদের মধ্যেই, ওরই ভেতর একটু আলাদা হয়ে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ঝংড়ু, আর পাশেই রুম্মা। ঝংড়ুর মাথার রাঙা সালুর পটিটা নবোদিত সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে, রুম্মারও তার সেই সকালের ভূষণ-পরিচ্ছদ —আঁট করে পরা একটা খাটো সাঁওতালী শাড়ি, রূপার মল, হাতে রূপার বালা, খোঁপায় একটা থোকা লাল জবা, ঝংড়ুর সালুর রঙে রঙ মেশানো।…দৃশ্যটা যেমন মাঝে মাঝে একটু অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল তেমনি আবার ভাষাও জুগিয়ে যাচ্ছিল লোকেদের গরম করে তুলতে। রুম্মাকে মনে হচ্ছিল স্বপ্নরাজ্য থেকে নেমে এসেছে—একটু বিস্ময় আর প্রচুর প্রশংসার দৃষ্টিতে অপলক নেত্রে চেয়ে আছে মৃন্ময়ের পানে—মৃন্ময়ের মনে হ'ল তার পৌরুষে অভিভূত হয়েই, কেন না সে-ই তো এখন ত্রাণকর্তা, সেই বিরাট রঙ্গমঞ্চের সেই তো নায়ক এখন।

লোকটাকে সঙ্গে করে নিয়ে বাঁধের দিকে এগিয়েছে, এমন সময় পেছনে কয়েকজনের মুখে আওয়াজ শুনে ফিরতেই মৃন্ময় দেখে ঝংড়ু ভিড় চিরে হন হন করে এগিয়ে আসছে, তার পেছনেই রুম্মা। মৃন্ময় দাঁড়িয়ে পড়ল, ঝংড়ু একেবারে সামনে এসে বললে—"ও নাই যাবে।"

বাংলাটা যেন জিদ করেই শেখেনি ঝংড়ু, রুম্মার ঠিক উল্টো।

বীরেন্দ্রসিং, সুকুমার, আরও অনেকে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের পেছনে ভিড় জমে উঠেছে।

সুকুমারেরই চাকর, সে-হিসাবে সেই বললে—"কেন ঝংড়ু, ও নিজে যেতে চাইছে—এতগুলো লোকের বিপদ…"

"নাই যাবে।"—লোকটার হাত চেপে ধরলে। চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সবাই একেবারে চুপ করে গেছে, বীরেন্দ্রসিং কিছু না বলায় আর কেউ কিছু বলতেও পারছে না।

মৃন্ময় একটু কড়া হয়ে প্রশ্ন করলে—"তোমার কেউ হয় ?"

"হাম ও লোকদের সর্দার আছি ; নাই যাবে।···ও নাই যাবে, ও শকবে নাই, বাচ্চা আছে···চল্।"

শেষের কথাগুলা বলার সঙ্গে সঙ্গে যুবাকে একটা টান দিয়ে পেছনে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল ; সঙ্গে সঙ্গেই পা বাড়ালে।

মৃন্ময় রুম্মার পানে চেয়ে বললে—"তুমি বারণ করো।"

"শুনবে ? করলেন তো আপনারা বারণ।·· তা ভিন্ন আমরা সর্দার, একটা ছেলেকে বিপদের মুখে যেতে দেব কি করে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ?"

সমস্ত জায়গাটা এত নিঃশব্দ হয়ে গেছে, একটা স্থচ পড়লে তার শব্দটা শোনা যায়। অনেকগুলাই কারণ—প্রথম তো সমস্ত ঘটনাটুকুই, তারপর রুম্মার চেহারা, তার ওপর তার এই একেবারে শুদ্ধ উচ্চারণে পরিষ্কার বাঙলা বলা ; বলার ভঙ্গি।···মৃন্ময়ের কাছে আরও কিছু বেশি আছে—রুম্মার দৃষ্টি—তাতে কত ইঙ্গিত, কত ব্যঞ্জনা যে রয়েছে, যেন থৈ পেয়ে উঠতে পারছে না। এতগুলা ভালো মন্দ লোকের মাঝে দাঁড়িয়ে একজন তরুণী যে এত স্পষ্টভাবে চেয়ে বলতে পারে কথা, সব বাদ দিলেও, এইটেই একটা বিস্ময়কর জিনিস।

ঝংড়ু এগিয়ে যাচ্ছে ওদিকে, কি ভেবে আর একবার রুম্মার সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে নিয়ে মৃন্ময় পা বাড়িয়ে বললে—"দাঁড়াও সর্দার, সব বুঝিয়ে দি তোমায়, ওমনি নেমে গেলে চলবে না।"

"সর্দার"-টা বললে একটু ব্যঙ্গ করেই, কথাটার ওপর একটু অযথা জোর দিয়েই।

বাঁধের মুখে দাঁড় করিয়ে ঝংড়ুর কোমরে একটা চৌদ্দ-পনের হাতের কাছি বাঁধা হ'ল শির-দাঁড়ার ওপর দিয়ে যাতে ঠিক মাঝখানটায় থাকে সেইজন্যে একটা পাতলা দড়ি দিয়ে পিঠের ওপরটাও সেটাকে আরেকবার বাঁধা হ'ল, তারপর তার হাতে একটা হাত দুয়েকের বাতা দেওয়া হ'ল, তাই দিয়ে ফাটলের দৈর্ঘ, গভীরতা হবে মাপতে। তাকে ভাল করে সব বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল। বড় দড়ির সঙ্গে একটা ছোট পাতলা দড়িও বেঁধে দেওয়া হ'ল, তার মুখটা রইল ঝংড়ুর হাতে,

বিপদ দেখলেই টান দেবে। মনে হ'ল বিপদের কথাটাই সব চেয়ে বেশি অগ্রাহ্য করলে ঝংড়ু, মুখে কিছু না বলেই। কাপডটা নিজের সুবিধা মতো এঁটে নিয়ে বললে—"বঢ়ো"।—অর্থাৎ এগোও।

বাঁধে কেউ উঠবে না, কতকটা হুকুমের ভঙ্গিতেই জানিয়ে দিলে মৃন্ময়; খালি সে, ঝংড়ু, একজন সহকারী অফিসার, আর চারজন কুলি যারা দড়িটা ধরবে।... বড়ো ফাটলে জলের তোড় আর একটু বেড়েছে।...বাঁধের ওপর কজনে পা দেওয়ার সঙ্গেই কিন্তু রুম্মাও পা তুলে দিলে। মৃন্ময় আরও কড়া হয়ে, দৃষ্টিতে আরও আদেশের ভাব ফুটিয়ে বললে—"না, ও চলবে না।"

রুম্মা মোটেই ভ্রূক্ষেপ না করে বললে—"আপনি চলুন. আমার স্বামীর বিপদটা বেড়েই যাচ্ছে যত দেরি করছেন।"

এদিকটা একেবারে নিস্তব্ধ, সবাই যেন একটা নাটকের খুব রোমাঞ্চকর অংশ উৎকণ্ঠিত হয়ে দেখছে। শুধু বীরেন্দ্র সিংএর গলার স্বর উঠল—"ওকে যেতে দিন।"

ভেতরের দিকের বড়ো ফাটলটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সবাই। জলটা আর একটু জোরে ঢুকছে, বড একটা চাটুর আকারের ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়েছে, আগে এটা ছিল না; অবশ্য বাইরে দেখতে এমন কিছু ভীতিজনক নয়। মৃন্ময় ফাটলের মুখ দুটো মিলিয়ে দেখলে আরও দেড ইঞ্চি বেড়ে গেছে এর মধ্যে, অর্থাৎ বাঁধটা আরও হেলেছে সেই পরিমাণ।

কথাটা রুম্মাকে জানালে, কিন্তু তার মুখে কোন পরিবর্তন দেখতে পেলে না। রুম্মা যেন সেদিকে কান না দিয়েই ঝংড়ুর দিকে এগিয়ে গিয়ে তার সালুর পটিটা খুলে তার মধ্যে আপনার খোঁপার জবাটা বসিয়ে আবার শক্ত করে দিলে বেঁধে। সবাই ফাটলের ওধারে নিরাপদ জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল, শুধু রুম্মা দাঁড়িয়ে রইল ফাটলের মুখের ওপর। ঝংড়ু নেমে গেল।

সেই পঁয়ষট্টি বছরের প্রায়-বৃদ্ধ ঠিক চল্লিশ মিনিট রইল জলের মধ্যে, দুটো ফাটল মিলিয়ে; প্রথম ডুবনে তিন মিনিট, মৃন্ময় ঘড়ি ধরে দেখলে। অদ্ভুতভাবে

অঙ্কগুলা লিখিয়ে গেছে—প্রায় কত হাত নিচে, ফাটলের দৈর্ঘ—গভীরতা কত—তা পর্যন্ত।

যখন উঠে সবাই বাঁধ থেকে নেমে এলো তখনও কোন শব্দ নেই এক রকম, শুধু দুতিনবার সাঁওতালের দল কি বলে একটা বিজয় হুঙ্কার দিয়ে উঠল। বীরেন্দ্রসিং নিশ্চয় কিছু একটা এঁচে রেখেছেন, মন্তব্য করবার মধ্যে শুধু তিনিই বললেন—"ওদের কেউ কেউ জলের মধ্যে ঢুকে কুমীর বেঁধে আসে।"

এরপর সব সহকারীদের নিয়ে মৃন্ময় আলাদা বসে কি একটা পরামর্শ করলে, কাগজ পেন্সিল নিয়ে কিছু কিছু গণনাও হ'ল, শেষ হলে বীরেন্দ্রসিংএব কাছে বসে বললে—"বালির থলে এবাব ফেলুন, কিন্তু হুড়োহুড়ি করা চলবে না।···আসল যা এখন দরকার, বাঁধের একেবারে ওদিকটায় ডিনামাইট করে হাত তিরিশেক উড়িয়ে দিয়ে জলের রাস্তা করে দিতে হবে, হ্রদের অন্য আব এক জাযগাতেও, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ; ডিনামাইট কারখানার ল্যাবরেটারিতে আছেই।"

আঠার

কিছুদিন আর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় রইল না মৃন্ময়ের। চৈত্রমাসের অর্ধেক হয়ে এল, সামনেই বর্ষাকাল, এর মধ্যে বাঁধ না মেরামত করে তুলতে পারলে সমস্তই হবে পণ্ড। এই জন্যই ডিনামাইট যাতে না করতে হয় তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল, কথাটা গোপনও রেখেছিল সেই জন্যই, শুনলে বীরেন্দ্রসিং এই ব্যবস্থাই করতে বলতেন, ওরকম করে রাক্ষসের মুখে লোক নামতে দিতেন না।

সান্ধ্য বৈঠকে এসে বসা, কি সরমার জীবন নিয়ে কৌতূহল, কি রুম্মার জীবন নিয়ে খেলায় নামা—এসবই রইল বন্ধ। সরমার সম্বন্ধে কৌতুহলটা হয়তো কমেই এসেছিল—যে ভাবে সে নিজেকে প্রকাশ ক'রে ধরলে সেদিন ; তার ওপর সেটাকে জীইয়ে রাখবার জন্য এই সময়ের অভাব।··আর একটা কথা, যতদিন পর্যন্ত সরমার সম্বন্ধে একটা সন্দেহ ছিল, একটা রহস্যের আভাস ছিল, ততদিন পর্যন্ত তার সৌন্দর্য্য

সম্বন্ধে ছিল একটা প্রচ্ছন্ন লোভ। এখন সন্দেহটা যত দূরে চলে যেতে লাগল, লোভের ধারটাও এল মরে। এখনও সরমা সুন্দরীই—অপরূপাই, কিন্তু পরের বিবাহিতা স্ত্রী—তাকে আর কোন রহস্য ঘেরে নেই।··তার ওপর এদিকে চিন্তারও নেই সময়।

রুম্মার সম্বন্ধে লোকের অত কুন্ঠিত হবার দরকার নেই। সমাজের নিম্নস্তরের স্ত্রীলোক, আছে সে উচ্চস্তরে, থাকতে রাজি হয়েছে, সেইটেই লোভকে করে উৎসাহিত। বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা।···সেদিন বাঁধের ওপরের দৃশ্যটা একটু দেয় বাধা মনকে—যেভাবে ঐ বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গেই মরবার জন্য পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সে এমন কিছু নাও হতে পাবে, একটা সাময়িক উৎক্ষেপ মনের।··সর্বোপরি একটা ব্যাপার রয়েছে, ঘটনাটার পর রুম্মার সঙ্গে বারকয়েক যা চোখোচোখি হয়েছে; তাতে তার দৃষ্টিতে কি যেন পেয়েছে মৃন্ময়। রুম্মার শান্ত অপলক দৃষ্টির ভাষা বোঝা কঠিন, প্রায় অসম্ভবই, কিন্তু তবুও এটুকু বেশ বোঝা যায় যে মৃন্ময়কে নিয়ে সে যেন কিছু ভাবে, তাকে কিছু একটা বলতে চায়।

কিন্তু সময় নেই মৃন্ময়ের যে এ-সব ভেবে একটা সিদ্ধান্ত করে। কর্মের মধ্যে ক্ষণিক একটি অবসরে সিগারের ধুঁয়ার কুণ্ডলির মধ্যে এক আধটা ছবি ভেসে উঠে, দু-একটা কথা পড়ে মনে, আবার কুণ্ডলির সঙ্গেই ধীরে ধীরে বাতাসে মিলিয়ে যায়।

আশ্রমের বাসায় থাকেও বড় কম আজকাল। পাহাড়ের গোড়ায় একটা তাঁবু ফেলিয়েছে, সমস্ত দিনটা সেখানেই প্রায় যায় কেটে, কখনও কখনও গভীর রাত পর্যন্ত, এমনও হয়েছে যে সারা রাতও গেছে। তিনটে শিফ্‌টে কাজ হচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টাই, বৈশাখের মধ্যে বাঁধ শেষ করে ফেলতে হবে, সেই সঙ্গে কলও। এখানে প্রায় জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝিই বৃষ্টি টেনে আনে পাহাড়ে।

মৃন্ময়ের এই সমাচার, আর ঝিলের ওদিকে তার কর্মক্ষেত্রের।

ঝিলের এদিকের কর্মস্রোত নিজের খাতে বয়ে চলেছে, শান্ত, নিস্তরঙ্গ। আশ্রম-স্কুলের কাজ দিন দিন বেশ গুছিয়ে উঠছে, ছাত্রসংখ্যার সঙ্গে আশ্রমের পরিধিও উঠছে একটু একটু ক'রে বেড়ে। বৃদ্ধির দিক দিয়ে দেখতে গেলে হাসপাতালটা

বেড়ে গেছে বড় বেশি রকম, মিল-কলোনি আর এদিকে শহরটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই। বারোর জায়গায় এখন কুড়িটা বেড, একটা ঘর বাড়াতে হয়েছে, আউট-ডোরের কাজও বেড়ে গেছে ঢের বেশি। তবে সেই আগে নিত্য ডাক্তার ছেড়ে-যাওয়ার যে অশান্তি সেটা আর নেই। সুকুমার দায়িত্ব নেবার পরই একজন ছোকরা বেহারী-ডাক্তারকে নিয়োগ করেছে, বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে ভালভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই অঞ্চলেরই লোক, একটু আদর্শপ্রিয়, বীরেন্দ্রসিঙের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের একটু সেবা করতে চায়। এছাড়া আরও একটা কারণ আছে, সুকুমার নিজের মাইনেটা অর্ধেক কমিয়ে দিয়ে বাকি অর্ধেকটা ডাক্তার, লেডী-ডাক্তার, আর নার্স-কম্প্যাউণ্ডারদের মধ্যে চারিয়ে দিয়েছে; যেটা নেয় মাত্র ভাতা হিসাবে নেয়, অর্থাৎ ওর পুরোপুরিই সেবা।

কাজই ওর আনন্দ, সে কাজ যত বাড়ছে, অবসর যতই যাচ্ছে কমে, সে-আনন্দ কানায় কানায় তার মনটাকে দিচ্ছে ভরে।

কিন্তু অন্যদিক দিয়ে তার মনে একটি ছায়া এসে পড়ছে মাঝে মাঝে, তার মনে হয় সরমা যেন মাঝে মাঝে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। প্রথমটা তেমন গ্রাহ্য করে নি; এই যে তার অক্লান্ত পরিশ্রম, নিজের শিক্ষা নিয়ে, আশ্রমের কাজ নিয়ে, হাসপাতালেও খানিকটা সেবার কাজ ক'রে, তার ওপর আবার ইচ্ছা ক'রেই রুগ্মার সংসারের সমস্ত ভার তুলে নিয়ে—জীবনকে আবার পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবার তার এই যে সাধনা, এ বোধ হয় তারই সাময়িক ক্লান্তি। ভেবে দেখবার বেশি সময়ও পায় না বলে এই ধারণাই নিয়ে রইল কিছুদিন, তারপর হঠাৎ একটা রূঢ় আঘাতে সেটা গেল ভেঙে।

একদিন বিকালের দিকে হঠাৎ বাসায় এসে দেখে বাড়িটা শূন্য, শুধু ভেতরের বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে সরমা ঘুমুচ্ছে। হাসপাতালে সুকুমার মোটা ক্রেপ-সোলের জুতা ব্যবহার করে, বিশেষ কোন শব্দ না হওয়ায় সরমা ঘুমিয়েই রইল। বিকালের ছায়া বারান্দাটার মাঝে প্রবেশ করে সরমার মুখে একটা গভীর প্রশান্তি এনে দিয়েছে। ওপরের ফ্যানটা আসতে আসতে ঘুরছে, তাইতে কপালের চুলগুলি একটু চঞ্চল। আজ অনেকদিন পরে ভালো করে দেখলে সরমাকে,

কর্মচাঞ্চল্যের মাঝখানেই এই ক্ষণিক অবসরটুকু ব'লে স্থকুমারের দৃষ্টিও বোধ হয় বেশি মধুময় হয়ে থাকবে, চোখ ফেরাতে পারছে না।

দাঁড়িয়ে দেখবার একটু স্থযোগও হয়েছে আজ। বুধাই আর তুলা যে বাড়িতে নেই তার কারণ স্কুলে আজ স্পোর্টস্। ঝংড়ুর শরীরটা আজ একটু খারাপ, রুম্মা নিশ্চয় তার কাছে। পাচিকা বিষ্টুর-মাও নেই, থাকেও না বড় একটা; কালামানুষ, যতটা কাজ করে. করে, বাকি সময়টা নিজের ঘরে ঘুমোয়, কিম্বা মোটা চশমা চোখে দিয়ে রামায়ণ পড়ে।

এই নিস্তব্ধতার কোলে স্থপ্ত তরুণীর ছবিটি শুধুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে স্থকুমারের। সামনে দাঁড়িয়েছিল. হঠাৎ চোখ খুললেই নজরে পড়ে যাবে সরমার। স্থকুমারের একবার মনে হ'ল দাঁড়িয়েই থাকুক. চোখ খুললে এই যে দেখে ফেলা—এর মধ্যে দিয়েই আজ সব কথা হয়ে যাক, এই রকম এই অর্থহীনভাবে কত দিন আর থাকবে তুজনে ?

তারপর আবার কি ভেবে চেয়ারের পেছনের দিকটাতে গিয়ে দাঁড়াল, একটা পর্দা থাকা দরকার।

সন্তর্পণে পা ফেলে একটু পাশ ঘেঁষে পেছনে দাঁড়াতেই মনে হ'ল যেন সরমার চোখে শুকন অশ্রুধারার দাগ। একটু ঝুঁকে দেখলে, সত্যই তাই।

একটা রূঢ় ধাক্কা লাগল স্থকুমারে বুকে। যে অবসর, বাড়িব নিস্তব্ধতা এখনই তাব কাছে এত মিষ্ট হয়ে উঠেছিল, একজনের রিক্ততায় তাই যে কি অকরুণ হয়ে উঠেছে তাই দেখে তার বুকের ভেতরটা মোচড দিয়ে উঠতে লাগল। অনেক পরিবর্তন এনে ফেলেছে কাজে ; আগে এই সময়টা নিয়মিতভাবে হাসপাতাল থেকে আসত স্থকুমার, ওদিকে সরমা আসত আশ্রম-স্কুল থেকে। চা হোতো. খানিকটা গল্প হোত। আজকালও আসে, কিন্তু রোজ পারে না আর, আসাটা নিয়ম নয়, সপ্তাহে তুএকবার আসতে পারলে তো পারলে, নয়তো ঝংড়ু গিয়ে চা দিয়ে আসে। ··আজ শুকন তুটি বিন্দু অশ্রুর নীরব অনুযোগে স্থকুমার হঠাৎ বুঝতে পারলে— কত বড় একটা নিষ্ঠুরতা সে করে গেছে ধীরে ধীরে।

তার নিজের অশ্রু উঠতে লাগল ঠেলে, মনে হ'ল এগিয়ে গিয়ে মুছিয়ে দেয়

চোখ দুটি ; তারপর নিশ্চয় অশ্রুই নামবে, হয়তো সুকুমারের চোখেও ; কিন্তু নামুক, তাইতেই এই যে কাজ, তার উন্মাদনা, তার সাফল্য সব যাক ভেসে, দুজনে একটা অস্পষ্ট সম্বন্ধ নিয়ে দাঁড়াক জীবনে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু মনের এই আবেগটাকে সংযতই করে নিলে সুকুমার। এটা ঠিক হয় না, একটা গণ্ডী যে টেনে রেখেছে সেটা থাক ; কি করবে ? এত সমস্যা যার জীবনে, দুবিন্দু অশ্রু তার পক্ষে এমন আর বেশি কি ?

আজ চায়ের জন্যও আসে নি, একটা কি নিতে এসেছিল। কি যে নিতে এসেছিল ভুলে আবার বাগানেব খানিকটা গেছে, বুকটা আবার টনটন করে উঠল। সরমার ঘুমন্ত মুখটা মনে পড়ল···তাকে এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। প্রলয়-রাতের সাথী—কত আশা করেই না পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

আবার ফিরে দাঁড়াল, একটু ভাবলে, তারপর একটা হাঁক দিলে—"দুলা !"

জানেই দুলা বাড়িতে নেই, শুধু সাড়া দিয়ে বাড়িতে ঢোকা, যাতে সরমা জেগে উঠে একটু সম্বৃত করে নিতে পারে নিজেকে। রুক্মা বেড়ার ওদিকের আউট-হাউস থেকে বেরিয়ে এল, বললে—"ওদের দুজনেরু কেউ আসে নি এখনো, কি খেলা-ধূলা আছে স্কুলে।"

"সরমা এসেছে ?"

"বোধহয় নয়, কই ডাকেন নি তো আমায।"

"ঝংড়ু আছে কি রকম ?"

"অনেকটা ভালো। আপনার চায়ের ব্যবস্থা করে দোব।"

"থাক্, সরমা আসুক আগে, হয়তো তারও দেরি হবে।"

সরমাকে আরও একটু সময় দেবার জন্যেই এই এককাঁড়ি মিথ্যা। সে বেশ ভাল করেই নিজেকে গোছগাছ করে নিয়ে বার-বারান্দায় এসে দাঁড়াল,—বললে—"না, আমি এসে গেছি অনেকক্ষণ। ঝংড়ু কি রকম আছে ভেবে ওকে ডাকিনি। ···ভাল থাকেতো আয় রুক্মা, চাটা করে দে না হয়। ··ওকি তুমি দাঁড়িয়েই রইলে যে, উঠে এসো।"

সুকুমার বললে—"বাগানেই বসলে কেমন হয় ?—নদীর ধারটায় গিয়ে।···সেই করা যাক, দাঁড়াও।"

হাসপাতালের দিকে একটা লোক যাচ্ছিল—তাকে মালীটাকে ডেকে দিতে বললে। সে এলে তাকে দিয়ে নদীর ধারে কয়েকটা উইকারের চেয়ার আর একটা টেবিল রাখিয়ে দিলে। যাবার সময় বলে দিলে ছোট ডাক্তারবাবুকে বলতে তার কাজগুলো যেন একটু দেখে নেয়, সুকুমার এখন আর ফিরবে না।

সরমাকে বললে—"চলো বসা যাক গিয়ে, রুম্মা চা নিয়ে আসবে'খন।"

সরমা প্রশ্ন করলে—"আজ আর যাবে না বললে যে ?"

"একটু দেওয়া যাক না ফাঁকি আজ।"

সোজা না গিয়ে ঘুরে ফিরে চলল তুজনে। বাগানটাও আর দেখবার ফুরসত হয় না ওর ; এমন কি সরমার অবহেলার চিহ্নও একটু আধটু ফুটে উঠেছে জায়গায় জায়গায়, যা প্রথম চোখে পড়ল আজ। কিন্তু আজকে বলেই আর অনুযোগ করলে না, একটি যে দীর্ঘশ্বাস পড়ল সরমার সেটাও যেন শুনেও শুনলে না। একটু পরে প্রশ্ন করলে—"ফাঁকির কথায় চটলে না তো?···চুপ করে রইলে তাই জিগ্যেস করছি।"

"চটবো!—আমি যেন বুবুয়ার স্টেটের জেনারেল ম্যানেজার!"—কথাটা বলে সরমা একটু হেসে উঠল তারপর আবার গম্ভীর হ'য়ে বললে—"তবে এও তো ঠিক, তোমার ওদিকে ফাঁকি দিলে মোটেই চলে না।"

"কোনওদিকে ফাঁকি দিলেই চলে না।"

সরমা চকিত দৃষ্টি তুলে সুকুমারের মুখের ওপর ফেললে, প্রশ্ন করলে—"কই, আর কোন্ দিকে দিচ্ছ ?"

কথাটা উল্টে নিলে সুকুমার ; একটু হেসে বললে—"একটু ফাঁকি পড়ছে এই বাগানটা ; এতে অবশ্য আমার থেকে তোমার অপরাধটাই বেশি।"

সরমা দাঁড়িয়ে একটা করবীর ঝাড় থেকে শুকন ফুলগুলা বেছে ফেলতে ফেলতে বললে—"তা অস্বীকার করতে পারি না। আসল কথা ঝংড়ুটা তুদিন থেকে একরকম পড়েই রয়েছে।"

সুকুমার হেসে বললে—"তোমার চেয়ে আমি কর্মী ভালো, ফাঁকি দিয়ে তাব ওপর ছুতো কবতে জানি না।"

হেসেই জবাব দিলে সরমা—"বড দোষটাই যখন কবলাম, ছোটটাতেই কি এসে যায়?"

রুম্মা চায়ের ব্যবস্থা করে নিয়ে এসেছে, বললে—"ছেঁকে দোব দিদিমণি?"

সবমা বললে—"আমিই এসে ছেঁকে নিচ্ছি, তুই ঝংড়ুব কাছে গিয়ে বস্‌গে একটু, তাব শবীরটা খারাপ।"

রুম্মা নিচের ঠোঁটটা চিতিয়ে নিয়ে একটু নিচু স্বরে বললে—"হ্যাঁ, গেলুম বসতে, আমার নিজেব শরীব নেই! দুপুর থেকে ঠায় বসে আছি।"

এটাও ওরা দুজনে শুনলেই, তাবপর আরও একটু গলা তুলে বললে—"তাহলে এসো, বাড়িতে সব পাট পড়ে বয়েছে, এখন ওব দিকে গেলে চলবে না আমার।"

সরমা সুকুমাবের দিকে চেয়ে বললে—"চলো বসিগে।"

"ওদিকটা ঘুরে আসবে না একবার?"

"জলে চা ছেড়ে দিয়েছে, ক'ষে নষ্ট হয়ে যাবে।"

চমৎকার লাগছিল দুজনে মিলে অলস ভ্রমণটুকু। সরমাব মনের তাবও এই সুরেই বাঁধা আজ, অযথা কথা কাটাকাটি থেকে যায় বোঝা; সুকুমাব একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে—"চা নষ্ট হলেই যত ক্ষতি? ··বেশ, চলো।"

সবমা আব কিছু উত্তর দিলে না, দুজনে এসে দুটি চেয়াবে বসল

একটা সুবিধা হ'ল, কথা বইল অনেকখানি এগিয়ে, দুজনেব মন আজ অনেকখানি কাছাকাছি এসে গেছে। এইবার, যে-কথাটি বলবাব জন্য আটকে যাওয়া—সেটা কি করে বলবে তারই সুযোগ খুঁজতে লাগল সুকুমাব।

বাগানো বেডানোব মতো চা-পর্বও শেষ হ'ল বিলম্বিত লয়ে। আজ ওদের তাডা নেই, শুধু পরস্পরকে পাওয়া, অবসবের চাদব বিছিয়ে দুজনে মুখোমুখি হয়ে ব'সে থাকা। যতই সময় যাচ্ছে কথা কওয়ার ভাগ আসছে কমে, এমন অবস্থায় সুকুমারই অনুযোগ ক'বে—"আজ যে বড কথা কইছ কম সবমা?"·· আজ কিছু করলে না, ওর সেই সময়টুকু আসছে এগিয়ে।

দূরে পাহাড়ের নীল তরঙ্গের ওপর একটি সোনালী রেখা টেনে দিয়ে সূর্য অস্ত গেল। সামনে ঝিলের গায়ে একটা রাঙা আভা এসে পড়েছে; ওপারে যে কাজ হচ্ছে তার কোলাহল আসছে কমে, যেটুকু আছে, একটা ক্লান্ত উদাস পূরবীর মতো আকাশের গায়ে আছে লেগে।···বুধাই আর তুলা হৈ হৈ করতে করতে বাসায় এল, রাঙামাকে ডাকাডাকি করতে করতে। রুম্মা বললে—"তাঁরা নেই, দুজনে কলের দিকে বেড়াতে গেছেন।"·· রুম্মা এই ধরণের দুষ্টামি করে মাঝে মাঝে স্থকুমার-সরমাকে নিয়ে, অবশ্য এই রকম আড়াল আর দূরত্বের স্থযোগ পেলে।···সরমা লজ্জার জন্যই না বলে পারলে না—"দেখতো, জেনেও রুম্মার শয়তানিটা···উঠবে ?"

স্থকুমার প্রতিপ্রশ্নই করলে—উঠবে তুমি ?"

সরমা শরীরটি যেন একটু গুটিয়ে নিয়ে বললে—"হাওয়াটি এখানে বড় মিষ্টি·· এক যদি হাসপাতালে যাও; এঁরা সব বোধহয় এসে গেছেন।"

স্থকুমার বললে—"তার চেয়ে এইখানেই ভালো।···ভিড়ের মধ্যে হারিয়েই যেতে হয়, নয় কি ?"

সরমা শুধু একটু হাসলে।

এর পরে যে বিরতিটুকু এল, তাতে সন্ধ্যার ছায়া একটু গাঢ় হয়ে এল নেমে। রাত্রির যবনিকা নয়, সন্ধ্যার এই অর্ধ-অবগুণ্ঠন, এ-ই অবসর। স্থকুমার বললে—"সরমা, আজ তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাইবার আছে, আমি একটা অপরাধ করে আসছি···অনেকদিন থেকেই···"

সরমা যেন চমকে উঠল, বললে—"কি অপরাধ ?···ক্ষমার কথা কি হয়েছে ?"

"আজ আর লুকুলে চলবে না বলেই বলছি—যখন তুমি টের পেলে আমি এসেছি হাসপাতাল থেকে, তার অনেক আগেই আমি এসে গেছি আজ; তুমি তখন ঘুমুচ্ছিলে।"

সরমা এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে স্থকুমারের পানে চেয়ে রইল, তাতে লজ্জা আর ভয়ের সঙ্গে আরও কিছু আছে মেশানো। তারপরে কিন্তু আস্তে আস্তে দৃষ্টি সহজ হয়ে

এল, কি একটা যেন চেষ্টা করছে, বললে—"তা না হয় এসেছিলে, কি হয়েছে তাতে? জাগালেই পারতে।"

সুকুমার ঠিক ও-কথাটার উত্তর দিলে না, প্রশ্ন করলে—"তুমি কাঁদছিলে?"

সরমা একেবারে সোজা হয়ে বসল, বললে—"কাঁদব কেন?···কাঁদবার কি হয়েছে? ··কাঁদতে কখন দেখলে তুমি ··বাঃ!"

সুকুমার টেবিলের ওপর ডান হাতটা বিছিয়ে দিলে, বললে—"যদি দেখেই থাকি, সে-অপরাধের জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি না সরমা, এসেও যে গিয়েছিলাম তার জন্যেও নয়, কেননা দুটোই না জেনে করা। আমি ক্ষমা চাইছি, কাজের মধ্যে ডুবে তোমার ওপর যে অন্যায় করেছি তার জন্যে। কিন্তু আমিই বা কি করি বলো? আমার জীবনের একদিকটা ভোলবার জন্যেই আমায় কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে হয়। তুমি এ-কথাটা বুঝবে, কেননা তোমার জীবনেরও এই ট্রাজেডি; কিন্তু উপায় কি? ··আমি চাই অনেক কিছুই সরমা, তবে এমন কিছুই চাই না যাতে তোমার অকল্যাণ আছে। কিন্তু এখনও তোমার জীবনে যে-অন্ধকারটুকু আটকে আছে, সেটুকু না গেলে কিসে তোমার কল্যাণ, কিসে অকল্যাণ—"

সরমা ঝিলের দিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে সংযত করে রেখেছিল, আর পারলে না। দুহাতে মুখ ঢেকে, টেবিলে সুকুমারের হাতের ওপরই মাথাটা চেপে হু-হু ক'রে কেঁদে উঠল। তারই মধ্যে ভেঙে ভেঙে বলতে লাগল—

„আপনি পারবেন না—হাজার চেষ্টা করলেও পারবেন না।···আমার এ যে কী অন্ধকার, কী অভিশাপ, আপনি জানেন না।···উপায় নেই আমায় বাঁচাবার··· আমায় ঘিরে ধরেছে···এত ভয়ে ভয়ে আমি কি করে থাকি টেঁকে?···আমায় নিয়ে আপনি নিজের জীবন কতখানি বিপন্ন করেছেন বুঝি না কি?···আরও কত বিপন্ন হবার সরঞ্জাম যে রয়েছে চারিদিকে!···আমায় ছেড়ে দিন, শুধু আদেশ না নিয়ে যেতে পারছি না বলেই আছি পড়ে, আপনি পায়ের ধূলো দিয়ে আমায় বিদায় করুন —যাবার অনেক পথ আছে। বিশ্বাস করুন, এ অন্ধকারের ভয় আর আমার সহ্য হচ্ছে না—সত্যি সহ্য হচ্ছে না আমার···"

সুকুমার বাঁ হাতটা সরমার মাথার ওপর তুলে দিলে, বললে—"চুপ করো সরমা। তোমায় আমি বিদায় দোব কেন? তাহলে আমার জীবনেই বা কি থাকবে আর বলো।··তোমার জীবনে যে অন্ধকারটুকু আটকে আছে তাও একদিন কেটে যাবে, ক'মাসই বা আমরা এসেছি এখানে?···যদি ধরো নাই কাটে, তোমার জীবনের ওদিকে কি আছে না-ই পারি জানতে, ক্ষতি কি? যেটুকু জানতে দিলেন ভগবান, আমার পক্ষে তাই তো যথেষ্ট।···তুমি ভয় কোরনা মোটেই, অন্ধকার যতই গাঢ় হোক, আমি তোমার পাশে আছি, থাকবও জেনো। চুপ করো সরমা; যে ভুলটুকু হচ্ছিল, সেটুকুও হতে দেবো না আর, তোমায় কথা দিচ্ছি।"

উনিশ

ওদিককার কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। যতটা আন্দাজ করা গিয়েছিল তার চেয়ে একটু বেশি সময় লাগল, জ্যৈষ্ঠ্যমাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাহলেও মৃন্ময় কাজ এমনভাবে বেঁধে এনেছে যে এখন হাজার বর্ষা নামুক, কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

মৃন্ময়ের হাতে আবার অবসর ফিরে এসেছে, সেই সঙ্গে সরমার জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলটা। কর্মের সাফল্যে মনে একটা উদারতা এনে দিয়েছে, ওর একটা প্রতিষ্ঠাও হয়ে গেছে এ জায়গায়, ঠিক করেছিল সরমার কথাটা বাদ দিয়েই চলবে এবার থেকে, কে জানে তার কৌতূহলী দৃষ্টির ওপর কার দৃষ্টি কখন্ যাবে পড়ে।··· জায়গাটা ভালো, থাকতেই ইচ্ছা করছে এখানে।

কিন্তু আর সে-রকম যাচাই করার দৃষ্টিতে না চাইলেও, চিন্তার হাত থেকে একেবারে মুক্তি পাওয়াটা সম্ভব হচ্ছে না। একটি মুখ, দেখা অথচ কোথায় দেখা মনে পড়ছে না, এতে এমনি একটা অস্বস্তি জাগায়, আর এ তো হাজারে একটা বিশিষ্ট মুখ, প্রতিদিনের পরিচয়ে মনের ওপর ছাপটা গভীরতম হয়ে উঠছে, ঠেলে রাখবার চেষ্টা করলে আরও বেশি করে মনটা অধিকার করেই বসে।

এর ওপর একদিন নিতান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে একটা ব্যাপার হয়ে গেল।

সেদিন ব্রাহ্মদের কি একটা ছোট উৎসব ছিল, হয়তো কারুর জন্মতিথি; সেইটিকে বেশ বড় করে তুলে সন্ধ্যার পর মাস্টারমশাইয়ের বাসায় একটা অনুষ্ঠান ছিল—সমবেত প্রার্থনা, আশ্রমের ছেলেমেয়েদের সংগীত, তারপর প্রীতিভোজ। এখানে ব্রাহ্ম বলতে দুটি পরিবার, মাস্টারমশাই আর সুকুমার-সরমা, সেই জন্যে সরমার ওপর অনুষ্ঠানের, বিশেষ করে গানে তালিম দেওয়ার ঝোঁকটা পড়েছিল বেশি। চমৎকার হয়েছিল। তার সাফল্যের একটা আনন্দ আছে, তার ওপর ওই থেকেই বীরেন্দ্র সিংয়ের মাথায় একটা নূতন আইডিয়া এসে পড়েছে; হাইড্রো-ইলেকট্রিকের কাজ চালু হয়ে গেছে, আর উপায় নেই; কাপড়ের কল উঠতে এখনও অনেক দেরি, ঠিক হ'ল তার শুভ উদ্বোধনটা এই রকম একটা অনুষ্ঠানের সঙ্গে করতে হবে, শুধু এর চেয়ে ঢের বড়, সমস্ত লখমিনিয়ার সঙ্গে যোগ রক্ষা করবে। কি কি হবে তা এখনও ঠিক হয় নি, অনুষ্ঠানের শেষে আলোচনাটা যখন আরম্ভ হ'ল তখন এদিকে আবার টের পাওয়া গেল; আকাশে হঠাৎ কখন্ মেঘ জমে উঠেছে; বাসায় ফেরবার একটা তাড়া পড়ে গেল। ঠিক আপাতত এইটুকুই হ'ল যে—আশ্রমের ছেলেমেয়েদের পক্ষ থেকে থাকবে নাচ গান আর একটা নাট্যাভিনয়। মোটরে ওঠবার সময় বীরেন্দ্র সিং বলে গেলেন—"বিঠিয়া, তুমি কাল থেকেই লেগে যাবে। অবশ্য সময় আছে যথেষ্ট, কিন্তু লখমিনিয়ার মতন জায়গায় একটা ভালো জিনিস দাঁড় করাতে চারটে মাস আবার খুব বেশিও নয়—যা আমরা আন্দাজ করছি।"

সরমার মনটা বেশ উৎফুল্ল, আজকের সাফল্যের যশটা তারই বেশি প্রাপ্য বলে মনের ভাবটাকে সাধ্যমত চেপে রাখবার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু সেটা ক্রমাগতই প্রকাশের পথ খুঁজছে।···ওরা বেরুলো তিনজনেই, একদিকেরই পথ, ওরা দুজন আর মৃন্ময়। যেখানে পথটা আলাদা হয়ে মৃন্ময়ের বাসার দিকে চলে গেছে সরমা দাঁড়িয়ে পড়ে বললে—"আপনিও আমাদের ওখানেই চলুন না মিস্টার চৌধুরী, কি আর এমন রাত হয়েছে?"

সুকুমারের দিকে চেয়ে বললে—"কি গো?"

সুকুমারও একটু জোর দিয়েই অনুরোধ করলে; ওরও চেষ্টা থাকে—কি করে এই আনন্দের মুহূর্তগুলি রাখে বাড়িয়ে, কেননা সেদিনকার ঘটনার পর থেকে ও আগেকার চেয়ে একটু চিন্তাকুলই থাকে বেশি, বললে—"হ্যাঁ, আসুন না, আজকের আসরটা যেন হঠাৎ গেল ভেঙে—কেমন দিব্যি জমে উঠেছিল। আসুন, যদি বিশেষ কোন কাজ না থাকে, আপনাকে তো আরও একলা চুপচাপ করে বসে থাকতে হবে।"

মৃন্ময় আজ আবার একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল মাঝে মাঝে। "যদি জোরে বৃষ্টি নামে, বেশি রাত পযন্ত ··"বলে কাটিয়ে দিতে যাচ্ছিল, ঝিরঝির করে আরম্ভই হয়ে গেল বৃষ্টি। তিনজনকে একটু একটু ছুটেই চলে আসতে হ'ল বাসায়।

বারাণ্ডায় উঠে সরমা বললে—"ভাগ্যিস বৃষ্টিটা এলো!"

সুকুমার মৃন্ময়েব দিকে চেয়ে হেসে বললে—"সরমা ছোটবার লজ্জাটা এইভাবে চাপা দেবার চেষ্টা করছে মিস্টার চৌধুরী।"

সরমা আজ রহস্যপ্রবণাও হয়ে উঠেছে; লজ্জার অভাব নয়, তবে সঙ্কোচটা যেন একেবারেই গেছে চলে। "বাঃ, পালাবো তার আবার লজ্জা!"—বলে এমন গাম্ভীর্যের ভাব করলে যে ওরা দুজনে হো হো করে হেসে উঠলো। তারপর সুকুমারকে বললে—"তুমি লোকসানটাই দেখ, লাভের দিকে চোখ পড়ে না; বৃষ্টি না নামলে উনি আসতেন?···তুমি একখানা বই মুখে করে একধারে বসে থাকতে, আমি বোধহয় খানিকটা ক্রুচেট সুতো নিয়ে অন্য ধারে···"

মৃন্ময়ের মুখের পানে চেয়ে থেমে যেতে মৃন্ময় হেসে বললে—"শেষ করুন না; আমি এক রকম আইবুড়ো মানুষ, সবই বিশ্বাস করবো, হোক্‌গে না বাদুলে রাত।"

সুকুমার হো হো করে হেসে উঠল। যাওয়া-আসায়, আহার-আলাপনে অন্তরঙ্গতা বাড়লেও এ ধরনের রসিকতা মৃন্ময় বোধ হয় এই প্রথম করলে। সরমা অন্যদিন হ'লে নিশ্চয় একেবারে আপনার মধ্যে গুটিয়ে যেত, আজ কিন্তু বেশ সহজভাবেই উত্তরও দিলে—"আইবুড়োদের কল্পনাই সম্বল তো?—সুতরাং বিশ্বাসে আর বাধা কি? নিজের মনে যা ভেবে নেন তাই সত্যি তাঁদের কাছে।"

সুকুমার প্রচণ্ডবেগে হেসে উঠল এবার, মৃন্ময়ও মুক্তকণ্ঠে যোগ দিলে। সরমা রুম্মাকে ডাক দিলে। এই প্রসঙ্গটা শেষ করে দেবার জন্যেই ডাকা, এসে দাঁড়ালে কিন্তু কি বলবে হাতড়াতে লাগলো, তারপর ওর মুখের গম্ভীর ভাব দেখে তার মাথায় আবার একটা রহস্যের আইডিয়া এসে গেল, বললে—"একি, তুই টের পেয়ে গেছিস নাকি ?"

রুম্মা একটু মূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করলে—"কি টের পেয়ে যাবো ?"

"মুখটা তোলো-পানা করে রয়েছিস বলে মনে করলাম পেয়েছিস বুঝি—পাস নি তা হলে ; কল খোলবার যে উৎসবটা হবে তাতে সাঁওতালী ডান্সের ব্যবস্থা হচ্ছে, বুবুয়া বলেছেন। · না গা ?"

সুকুমারকে সাক্ষী মানলে, সে গম্ভীরভাবে দৃষ্টি নিচু করে বললে—"বললেন তো।"

রুম্মার বুঝতে দেরি হয় না, উত্তর করলে—"বেশ তো, তাতে আমার কি ?"

"তুইও নাচবি।"

"আমি তো বাঙালী দেখচ, নাচের জন্যে জাত খোয়াতে যাব নাকি ?"

তিনজনেই হেসে উঠল। সরমা তারই মধ্যে বললে—"জাতে আর পুরোপুরি কই উঠতে পেরেছিস যে খোয়াবি ? রাত্তিরে ঝংড়ু সর্দারের কাছে তো আবার যে-সাঁওতাল সেই সাঁওতালই হ'য়ে থাকিস তুই।"

"তার কাছেই নাচব তবে।"

এবারে সবাই আরও উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল, শুধু রুম্মা ছাড়া. সে রাগের ভান করেই ফিরে যেতে যেতে বললে—"একটা কাজ করছিলাম, মিছি মিছি ডেকে শুধু বাজে কথা !"

সরমা বললে—"না শুনলে সব কথাই তোর বাজে কথা হয়ে যাবে , একটু চা কর, করবি ?"

মৃন্ময় বললে—"চা তো এইমাত্র খেয়ে এলাম মাস্টারমশাইয়ের ওখানে।"

রুম্মা টিপ্পনী কাটলে—"ঐ নাও, বাজে কথা নয় যেন !"

সরমা মৃন্ময়ের দিকে চেয়ে বললে—"বেশ তো! আমি ভালোমানুষী করে চা করতে বললাম আপনার জন্যে, আপনি আমার শত্রুর দিকে হয়ে গেলেন!…সে-চায়ের পর তো বর্ষা নেমেছে।"

মৃন্ময় রুম্মার দিকে চেয়ে বললে—"তা হলে করোগে। আজকের রাত্রির হিরোইন্ সরমাদেবী, ওঁর অবাধ্য হওয়া চলবে না।"

রুম্মা যাবার জন্যে আবার ঘুরতে সরমা বললে—"আর শোন্, আমার চায়ে চিনি একেবারে কম দিবি।"

"কেন? তুমি তো বরং একটু বেশিই খাও।"

"এক গাদা প্রশংসার সঙ্গে খেতে হবে যে!"

আবার একটা হাসি উঠল, তারপরে সরমা বললে—"না, সত্যিই বাজে কথা বেড়ে যাচ্ছে। ব'সে ব'সে গুণগান শুনলেও আমার চলবে না মৃন্ময়বাবু, বুবুয়া যে বোঝাটা চাপিয়েছেন। আমাদের আশ্রমের দিক থেকে প্রোগ্রামটা কি রকম হবে একটা ঠিক করে ফেলি আসুন।"

এরপর সেই আলোচনাই চলল। রুম্মা যতক্ষণে চা তোয়ের ক'রে নিয়ে এল, ততক্ষণে আর সব একরকম ঠিক হয়ে গেছে, একটু বাধা পড়েছে নাটক নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের নাটকের দিকেই ঝোঁক তিনজনের, কিন্তু সে তো আর সবার জন্য নয়, এখানকার কটা লোকেই বা বুঝবে?

অনেক জল্পনা-কল্পনার পর ঠিক হ'ল, নাটক হবে দুটো—একটি নটীর পূজা, আর কোন হিন্দী নাটক। মৃন্ময় এলাহাবাদের ছেলে, হিন্দী বেশ ভালো জানে, সেই বেছে ঠিক করবে। করবে আশ্রমের ছেলেমেয়েরাই, কিছু যাবে মৃন্ময়ের দিকে, কিছু সরমার দিকে।

সুকুমার বললে—"ভালোই হ'ল, দুজনের রেষারেষিতে জিনিস দুটো ভালো দাঁড়াবে মাঝখান থেকে।"

সরমা বিস্ময়ের অভিনয় ক'রে মুখের দিকে চাইলে, বললে—"রেষারেষি।—উনি ইন্‌জিনিয়ার হাতুড়ী বাটালী নিয়ে ওঁর কাজ, ওঁর সঙ্গেও অভিনয়ের মতো সূক্ষ্ম জিনিস নিয়ে যদি রেষারেষি করতে হয়…"

মৃন্ময় বললে—"দেখাই যাবে 'কামাল কিয়া', 'কামাল কিয়া' বলে কত হাততালি কার দিকে পড়ে !"

সরমা উত্তর করলে—"হাততালি দেওয়ার মত জঞ্জাল আপনার দিকে ঠেলে দেবার জন্যেই তো এই ব্যবস্থা।"

হাসি গড়িয়েই চলেছে। মৃন্ময় বললে—"না সরমা দেবী, মাফ করবেন, আপনাকে চটালে আমার উদ্ধার নেই।"

সরমা সন্দিগ্ধভাবে একটু আড়ে চেয়ে বললে—"হঠাৎ এত বেশি নরম হয়ে গেলেন ?"

"উগ্র দেখলেনই বা আমায় কখন ?"

"তবু…?"

"তালি যে আমার একচেটে হবে সেইটেই আমার ভয়। আমার বিশ্বাস আপনার তালিম দেওয়া নাচ গোটাকতক থাকলে মাঝে মাঝে তাদের উৎকট তালির তাল কেটে যেতে পারে। নয়তো আর কিছু না হোক, ওরকম একটা রন্ধ্রহীন শব্দের ব্যূহ ভেদ করে আমার নাটক এগুবে কি কোরে ?—মাঝে মাঝেও একটু ফাঁক চাই তো ?"

আবার প্রশংসা এসে পড়ছে। সরমা সেটাকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যই একটু হেসে বললে—"তা এত বড় উপকার যে করবো আমার পুরস্কার ?"

একটি যে চমৎকার দিন এসেছিল, মনে হচ্ছিলো আর ফুরুবে না, এইখানে এসে সেটা একেবারেই গেল শেষ হয়ে; হঠাৎ—অপ্রত্যাশিত ভাবেই—

মৃন্ময় বললে—"আমি ভার নিচ্ছি আপনার স্টেজের—শুধু স্টেজ নয়—ড্রেসিং, পেন্টিং, সবকিছুই…অবশ্য সত্যিই মনে করবেন না যেন নাচ শেখাবার বদলে এটা। আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে—মিলের কাজেই কলকাতা যাচ্ছি, ড্রেসার, পেন্টার, ডেকরেটার সব ব্যবস্থা করে আসব।"

—ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সেই আলোই যেন ঠিকরে এসে পড়লো সরমার মুখে, বললে—"সত্যি নাকি ?

বড় চমৎকার হয় তাহলে।…শুনলে গা?—উনি কলকাতা যাচ্ছেন—ড্রেসার, পেণ্টার, ডেকরেটার সব ব্যবস্থা করে আসবেন।…কবে যাচ্ছেন?”

“বোধ হয় সপ্তাহখানেকের মধ্যেই যেতে হবে।”

তারপর কোন রকম উপকার করতে পারার লোভেই, নিতান্ত সহজভাবে বললে—“আপনাদের নিজেদের কোন কাজ-টাজ থাকে তো তাও বলুন না—কিম্বা বাড়িতে কিছু খবর-টবর দেওয়ার থাকে তো—কারুর সঙ্গে দেখা করবার…কি ঠিকানাটা আপনাদের?”

সমস্তদিনের সঞ্চিত দীপ্তিটা একমুহূর্তেই মিলিয়ে গেল মুখে। কতকটা সামলালে সুকুমার, বললে—“থারটিন্ বাই ওয়ান বি কিরণ হালদার লেন, কালীঘাট।‥যদি যান তো বড ভালই হয়, অনেকদিন চিঠি পান নি কোন।”

সামলালে, কিন্তু সে উত্তর দিয়েছে বলেই তার দিকে চেয়ে মৃন্ময় দেখলে, ঠিক এতটা না হ’লেও, তার মুখও বেশ নিষ্প্রভই।

সময় পেয়ে সরমাও একটু সামলাবার চেষ্টা করলে, বললে—“কিন্তু যা জায়গা, পারবেন কি খুঁজে নিতে উনি? মিছিমিছি কষ্ট দেওয়া।”

আসলে সামলালে আকাশের দেবতা। তাদের মিনিট দু’তিন অস্বস্তিতে কাটাবার পর বৃষ্টিটা গেল থেমে, যেমন আচমকা এসেছিল; মৃন্ময় বললে—“আর দেরি করা নয় সুকুমারবাবু‥সরমা দেবী, আসি, বেশ কাটলো খানিকটা।”

তিনজনেই উঠে পড়লো। সুকুমার বললে—“হ্যাঁ, যেমন মনে হচ্ছে, এরপরে বোধ হয় আরও জোরে নামবে।”

কথাবার্তা খুব কম হ’ল দুজনের মধ্যে। একবার সুকুমার শুধু সহজভাবে বলবার চেষ্টা ক’রে বললে—“নম্বরটা যা বললাম ওঁকে, মনে রেখো।”

সরমা বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করলে—“কিন্তু এরকম করে কতদিন চলবে?”

কুড়ি

শুধু কালীঘাট কেন, সমস্ত কলকাতায় তের বাই এক, বি কিরণ হালদার লেন পাওয়া গেলনা। পাবে যে না-ই একরকম ভালো ক'রে জেনেই চেষ্টা করা, তবু মৃন্ময় মনকে সামান্যও ফাঁকি দিলে না, এতটুকু সন্দেহের অবকাশ রাখলে না। পোস্টাফিসে খোঁজ নিয়ে কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে স্ট্রীট-ডাইরেক্টারিটা ভালো ক'রে উটকে উটকে দেখলে ; নম্বরের কথা দূরে থাক, কিরণ হালদার লেন বলে কোন জিনিসই নেই কলকাতায়।

একটা চাপা উল্লাসে ভরে উঠছে মনটা, খুব একটা বড আবিষ্ক্রিয়ার মুখে এক জন বৈজ্ঞানিকের মুখে সে উল্লাসটা উঠে তাকে আহার নিদ্রা ভুলিয়ে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।···ওর আবিষ্ক্রিয়ার এতটুকু প্রশ্ন থাকতে দেবেনা মৃন্ময়,—নূতন নূতন বস্তি উঠছে, রাস্তা বেরুচ্ছে, এমনও হতে পারে কিরণ হালদারের গলিব নাম এখনও স্ট্রীট বা টেলিফোন ডাইরেক্টারিতে স্থান পায় নি। দরকার কি ওটুকু খুঁৎই রেখে ?···এ ধরনের সন্দেহ বোধ হয় সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ নয় ; ওর হয়েছেও তাই, সাময়িক ভাবে ; দুটো দিন ও ঘুরে ঘুরে তন্ন তন্ন করে সমস্ত কালীঘাটটা খুঁজলে, কাছাকাছি ভবানীপুর, বালিগঞ্জ আব টালিগঞ্জেবও খানিকটা।

একেবারে নিঃসন্দিগ্ধভাবে নিরাশ হয়ে ওব মনটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সেই উল্লাসটা, সামান্য একটু সন্দেহেব নিচে যেটা চাপা ছিল সেটা ঠেলে বেরুতে চাইছে।

উল্লাসকে কি করে মুক্তি দিতে হয় ভালোভাবেই জানা আছে মৃন্ময়ের ; একটা বিলাতী হোটেলে গিয়ে লখমিনিয়ার এত দিনের সংযমকে শৃঙ্খল-মুক্ত ক'রে দিলে, পান, আহার, ডান্স্—যা হাতের কাছে পাওয়া গেল ; ইংরাজীতে যাকে বলে 'সেলিব্রেট' (Celebrate) করা তাই করলে সে। তারপর আফিসের কাজকর্ম সেরে থিয়েটারের সাজগোজের ব্যবস্থা ক'বে ফিরে এল লখমিনিয়ায়।

আবার সেই লুকোচুরি হ'ল আরম্ভ।

ফিরে এসে লক্ষ্য করলে দু'জনের মুখ শুকনো—বিশেষ করে সরমার। আর সেবারের মতো বাড়ি ব'য়ে এসে সম্মুখ-রণ দেবার উৎসাহ একেবারেই নেই, যে-কোন মুহূর্তে নিদারুণ কথাটা মৃন্ময় বলে বসবে এইরকম একটা চাপা আতঙ্কে যেন অহর্নিশ কাটিয়ে যাচ্ছে কোন রকমে—যতটা সম্ভব তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে। বার দুই যেন মনে হ'ল ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল, অর্থাৎ উদ্বেগটা আর সহ্য করতে পারছে না, নিজেই এগিয়ে প্রশ্নটা করবে। একবার সামলে নিলে নিজেকে। দ্বিতীয়বার একেবারে পুরো বৈঠক—হাসপাতালের প্রাঙ্গণে মাস্টারমশাই, বীরেন্দ্রসিং, সুকুমার, ওঁর ডাক্তারটি, আশ্রমের স্কুলের আর সব যাঁরা নিয়মিত মেম্বর, আসন্ন উৎসব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে—বেশিভাগ সরমাকে উপলক্ষ করেই, এমন সময় সরমা অপ্রাসঙ্গিক-ভাবেই মৃন্ময়ের পানে চেয়ে বলে উঠল—"হ্যাঁ, একটা কথা! "

ঠিক সেই সময় মাস্টারমশাই তাঁর একটা সেই প্রচণ্ড হাসি হেসে ফেললেন। ওঁর এই রীতি, এক এক সময় হাসিই আগে আসে, তারপর তার ঝড় ঠেলে বক্তব্য হয় উপস্থিত।

খানিকক্ষণ ওঁর গল্পই চলল।

মৃন্ময় বুঝেছে। ঠিকানা-সংক্রান্ত ব্যাপারটা সরমার কাছে এত উদ্বেগের হয়ে উঠেছে যে সে আর সহ্য করতে পারছে না, তাই মরিয়া হয়ে এত লোকের সামনেই সেই প্রশ্নটা তুলে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে চায়। এও এক ধরনের মস্তিষ্ক-বিকৃতি, একটা ঝোঁক, কলকাতায় যার জন্য, সব জেনেশুনেও মৃন্ময় ঠিকানাটা বের করবার চেষ্টায় প্রাণ দিচ্ছিল।

যতক্ষণ গল্প হাসি চলল, মৃন্ময় মনে মনে অবস্থাটা বেশ ভেবে নিলে। অবশ্য বাইরে বাইরে গল্প শুনতে শুনতে, হাসির কোরাসে যোগ দিতে দিতে,--ভেবে দেখলে এ ধরনের খেলা আর চলে না; এত যে মরিয়া তার নিশ্চয় ভেঙে পড়বারই অবস্থা। কিন্তু তাহলে তো কিছুই হ'ল না; মৃন্ময় মাত্র এইটুকুই জানতে পারলে যে যখন ভুল ঠিকানা দেওয়ার এই অদ্ভুত প্রবঞ্চনা, তখন গলদ যে আছেই একটা এটা ঠিক;

কিন্তু গলদটা কোথায়—অর্থাৎ এই চেনা-চেনা মুখটা কার, কোথায়, কি পরিমাণে দেখা—তার তো কিছুই টের পাওয়া গেলনা।

ভাবতে লাগল; ভেবে ঠিকও করলে; না, এখন ওকে ভড়কে দেওয়া চলবে না। দুজনেই ধূর্ত, একটা কিছু উত্তব ঠিক না করে প্রশ্নটা কবতে হয়তো নাও এগিয়ে থাকতে পারে সরমা; হয়তো ও আব স্বকুমার—দুজনেবই ঠিক কবা আছে উত্তর, এখন সেই উত্তরটা দিয়ে সামলে নেবে, তাবপর বোধ হয় সকলেই দেখবে শিকার পালিয়েছে।

মাস্টাবমশাইয়ের গল্পটা শেষ হয়ে হাসির হরবা মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোজা সরমার মুখের ওপর দৃষ্টিটা বেখে প্রশ্ন করলে—"হ্যাঁ, কি যেন আপনি জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলেন সরমা দেবী?"

সরমাও গল্পের অবসরে একটা ঠিক ক'রে নিয়েছে—কাজ কি খুঁচিয়ে ঘা করে—হয়তো ঠিকানাব কথা ভুলেই গিয়ে থাকবে মৃন্ময়; বললে—"এই দেখুন! ভুলেই গেলাম কি জিগ্যেস কবতে যাচ্ছিলাম।…যা দাদুর গল্প!"

—একটু হেসেই বললে কথাটা।

আর সবার ত খেয়াল নেই, তবে চকিতে একবার স্বকুমাবেব পানে দৃষ্টি ফিরিয়ে মৃন্ময় দেখলে সে তীব্র উৎকণ্ঠায় সবমাব পানে চেয়ে আছে। · বড কৌতুক লাগছে মৃন্ময়ের— সব হিসাব মতো ঠিক আছে, পাই-পয়সা ক'বে একেবারে।

বললে—"আপনি সেই বাড়িব ঠিকানার কথা জিগ্যেস কবছিলেন না তো?"

হাসির ভাবটা মিলিয়ে গিয়ে সবমার মুখটা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল; মৃন্ময় চকিতে একবার স্বকুমারের দিকেও চেয়ে নিলে; অনুরূপ অবস্থা।

এ কিন্তু শিকার নিয়ে একটু খেলা, মৃন্ময় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করে দিলে—"সে আমার মস্ত বড় একটা ভুল হয়ে গেছে—তার জন্যে আপনাদের দুজনের কাছে ক্ষমা চাইবারও মুখ নেই আমার। ডবল ভুল বলা চলে—প্রথম তো খোঁজ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হতে পারি নি, একেবারেই সময় পাইনি, তারপর এসেও বলা হয় নি কথাটা—অত্যন্ত লজ্জিত আমি··"

একবার এর দিকে, একবার ওর দিকে চেয়ে বলার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য কবতে লাগল—তার দৃষ্টির পেছনেও যে আর একটা দৃষ্টি আছে তাই দিয়ে—কতদিনের জমাট একটা কালো ছায়া দুজনেরই মুখ থেকে অপসারিত হয়ে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে মুখ দুটি; বিশেষ করে সরমার মুখ, যেন বাহুমুক্ত চন্দ্র।

সরমাই আগে কথা কইলে, সুকুমারের দিকে চেয়েই আরম্ভ করলে—"এই নাও! কী এমন দোষ হয়েছে?…" তাবপর মৃন্ময়েব দিকেই ঘুরিয়ে নিয়ে এল কথাটা—"আমাদেরই ভয়ানক লজ্জায ফেললেন যে! যাচ্ছিলেন—ঠিকানাটা দিযেছিলাম, এমন কিছুই কাজ ছিলনা আমাদেব তো—তাও আপনিই আগ্রহ করে নিলেন ঠিকানাটা—দয়া ক'রে।—যেতে পারেন নি, তাতে হয়েছে কি?·· এই তো সেদিন চিঠি পেয়েছি তাঁদের·· না, আপনি মোটেই কুণ্ঠিত হবেন না·· এসে বলেন নি—কী যে এমন বলবার কথা!·· আমরাই বা কোন্ জিগ্যেস করেছি? সেজন্যে লজ্জা পাবার কথা বরং আমাদেবই, দাদু নিশ্চয় মনে মনে ভাবছেন—দেখো নাতনীর বাড়িব ওপর টান!"

—মনটা অতিরিক্ত হালকা হয়ে গেছে, নৈলে একসঙ্গে এতকথা কয়না সবমা।

মাস্টাবমশাই মুখিয়েই থাকেন, বললেন—"কিছুই ভাবছেন না দাদু, নাতনীর মনটা চারিদিক থেকে গুটিয়ে যতোই তাঁব কাছে এসে জড়ো হয় ততোই তাঁর লাভ।"

—একটা যে দমকা হাসির তোড উঠল, তাতে বাতাসটা একেবাবে নিঃশেষ ভাবেই পরিষ্কাব হয়ে গেল।

একুশ

এর পর যা বাকি রইল, অর্থাৎ কবে কোথায় দেখা সরমাকে—সেইটুকু নির্ণয় করবার জন্য মৃন্ময় উঠে পড়ে লেগে গেল। অবশ্য আরও সন্তর্পণে, শিকার ধরার মুখে যেমন আরও সাবধান হয়ে যায় শিকারী। একটা সুবিধা, প্রচুর অবসর এখন। সামনে মাত্র কাজ এখন শুভ-উদ্বোধনের অনুষ্ঠানটা, তারই উদ্যোগপর্ব চলছে এটা। সন্ধ্যার খানিকটা পরে, আড্ডাটা ভেঙে গেলে সরমা স্কুলের একটা ঘরে মেয়েদের নিয়ে বসে, মৃন্ময় তার নিজের বাসাতেই বসে তার হিন্দি নাটকের ছেলেদের নিয়ে। এই সময়টুকু যা একটু অন্যমনস্ক থাকে মৃন্ময়, বাকি সময়টা ঐ চিন্তা নিয়েই কাটায়, অথবা যদি সরমা থাকে তো কথাবার্তার মধ্যে তার যে ভাবভঙ্গিমা ফোটে সেগুলি মনে গেঁথে গেঁথে নেয়। যখন একলা থাকে, অাফিসেই হোক বা বাড়িতেই হোক, স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে সেগুলি বের করে মেলাতে থাকে।...একটা দুর্বোধ্য দলিলের পাঠোদ্ধার চলছে, যদি হয় সফল তো তারপরে আছে সম্পত্তি অধিকারের প্ল্যান, এক একটি রাত মাদকতায় অভিভূত হয়েই কেটে যায় মৃন্ময়ের।

কিন্তু যতই চেষ্টা, যতই অতন্দ্রিত অভিযান সেই স্মৃতিটুকুর জন্য, ততই যেন পেছিয়ে যাচ্ছে সেটা। মৃন্ময়ের ভয় হয় শেষ পর্যন্ত একেবারেই হারিয়ে ফেলবে না তো?—এই বহুদিন নানা রকমে দেখার অরণ্যে সেই একটি দিন একটি ভঙ্গিতে দেখাটুকু লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে না তো।

এই তীব্র উদ্বেগের ফাঁকে ফাঁকে অবসাদও আসে মাঝে মাঝে, সন্দেহ হয় সবটাই ভুল নয় তো! মুখে কোথায় একটা মিল, সে তো এমনিও হতে পারে। না হয়, তার সঙ্গে দুজনের মুখের আতঙ্ক, একটা গোপন চেষ্টা, কিন্তু এও তো অনেক অজ্ঞাত কারণে হতে পারে, আর সে কারণটা কদর্যই হতে হবে তার মানে কি?

মনে এই রকম প্রশ্ন উঠলে মৃন্ময় ছেড়ে দেয় তার গোয়েন্দাগিরি—একজন গৃহস্থ-বধূকে নিয়ে এই রকম একটা ব্যাপারে তার নিজের মনটাই যেন ঘিন্-ঘিন করতে থাকে। কে জানে, লখমিনিয়ার বায়ুমণ্ডলে সাধারণ ভাবে যে একটা শুচিতা আছেই সেটা বোধহয় অজ্ঞাতসারে ওর মনটা করে প্রভাবিত।···কিন্তু টেঁকে না এ-ভাবটা, হদ্দ দুটো দিন, তারপর আবার সেই কুটিল সংশয়, সেই লুব্ধ অনুসন্ধিৎসা।

এবার কিন্তু এই সঙ্গে একটা অন্য রকম ঘটনা হয়ে গেল।

মৃন্ময়ের ফটোগ্রাফির সখ আছে। জার্মেনীতে থাকতে ও একটি ভালো ক্যামেরা কিনেছিল, যা এদেশে প্রায় দুষ্প্রাপ্য। একটা কি খুঁৎ হয়ে এতদিন পড়েছিল, এবার কলকাতায় যখন যায় নিয়ে যায়। বোধহয় কলকব্জার বিশিষ্টতার জন্যই সঙ্গে সঙ্গেই সারিয়ে নিয়ে আসতে পারেনি, যেদিনের ঘটনা সেইদিন সকালের ডাকে এসে হাজির হয়েছে।

সরমা প্রায় সমস্ত দিন বাসায় ছিল না। কাল সন্ধ্যায় বীরেন্দ্র সিঙের পুত্রবধূ তার পিতৃগৃহ থেকে এসেছে, সরমা সকালে গিয়ে একেবারে আটকা পড়ে গেল। ফির্‌ল একেবারে বিকেলে বীরেন্দ্র সিঙের সঙ্গে তাঁর গাড়িতে। হাসপাতালের প্রাঙ্গণে গাড়ি প্রবেশ করবার আগেই দূর থেকে দেখলে অন্য দিনের মতো চেয়ারগুলা আজ আর গোল করে সাজানো নয়, লম্বালম্বি দুই সারি, সব ভর্তিও হয়ে গেছে, শুধু সামনের সারিতে মাঝখানের দুটি চেয়ার খালি। প্রশ্ন করতে যাওয়ার মুখেই মোটরটা একটু ঘুরতে ওর নজর পড়ে গেল একটু তফাতে স্ট্যাণ্ডের মাথায় কালো কাপড় চাপা ক্যামেরার ওপর এবং সঙ্গে সঙ্গেই বীরেন্দ্র সিং বলে উঠলেন—"এই দেখো বিটিয়া ভুলটা! আমাদের জন্যেই ওঁরা অপেক্ষা করছেন—আজ ফটো তোলবার কথা ছিল যে!—সেই কখন্ ব'লে পাঠিয়েছিলেন আমায়..."

নিজেই চালাচ্ছিলেন, একটু জোর করে দিলেন।

সরমা বললে—"কৈ, আমায় তো বলেন নি বুবুয়া··"

"কৈ আর বলেছি!···বলব বলব করে ভুলে গেছি। নাঃ, আমার আর পদার্থ নেই..."

এইটুকু কথাবার্তার মধ্যেই মোটর এসে দাঁড়াল, চেয়ার ছেড়ে সবাই এলোমেলোভাবে এগিয়ে এলেন একটু, তারপর আবার যে-যার চেয়ারে ফিরে গেলেন। সরমাব স্থান মাস্টারমশাই আর বীরেন্দ্র সিঙের মাঝখানে, বীরেন্দ্র সিং বসতে বসতে একটু অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন—"এমন বাগ হচ্ছে নিজেব ওপর !—আমার দোষে বিটিয়া যে একটু পছন্দমতো কাপড-চোপড পরে আসবে তাও হ'ল না, একেবারেই ভুলে বসেছিলাম কথাটা।"

মাস্টারমশাই বললেন—"এ তোমার অন্যায় কথা বীরেন্দ্র, পছন্দমতো কাপড চোপড়ের জোরেই যে আমার নাতনীর পছন্দসই ফটো উঠতে পারে, নচেৎ নয়, একথা বললে···"

সরমা একটু গুছিয়ে বসতে বসতে গ্রীবাটা তুলে বললে—"হাতে হাতেই প্রমাণ, এবার খুলছে আপনার নাতনীর আসল রূপ, থামুন না।· ভালোই হ'ল বুবুয়া, মেকি গুমোর যত শীগ্‌গির ভাঙে দাদুর ··"

এ পর্যন্ত বেশ হ'ল, এরপর মুহূর্তেই কিন্তু সামনের দিকে নজর পডার সঙ্গে সরমা চেয়ার ছেড়ে সোজা দাঁড়িয়ে পডল। যেন ভূত দেখেছে—চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে, মুখটা গেছে ফ্যাকাসে হয়ে, সম্মোহিতের মতো দৃষ্টি যেন ফেরাতে পারছে না।

অথচ দ্রষ্টব্য তেমন কিছুই নেই—মৃন্ময় এতক্ষণ পিঠ পর্যন্ত কালো কাপড় ঢাকা দিয়ে ফোকাস্ ঠিক করছিল, বেরিয়ে বাইরে থেকে একবার দেখে নিচ্ছে।

সবার দৃষ্টি সরমার দিকে গেল, বীরেন্দ্র সিং, মাস্টারমশাই, আরও দু'এক জন এক সঙ্গে প্রশ্ন করে উঠলেন—"কী হ'ল ?···কী হ'ল সরমা দেবী ?"

সরমা একটা অবুঝ ছোটমেয়ের মতো আবদারের জিদে বললে···"আমি ফটো তোলাব না···না, তোলাব না ফটো—কোন মতেই না।"

কয়েক সেকেণ্ড সবাই একেবারে নির্বাক, তারপর মাস্টারমশাই বললেন—"হঠাৎ কি হ'ল? না হয় তুমি কাপড়-চোপড় পালটেই এসো, এখনও আলো থাকবে কিছুক্ষণ।"

উত্তরে সরমা কয়েক পা সরে দাঁড়াল নিজের চেয়ার থেকে, যেন আগে ফটোর

ব্যবস্থাটা ভেঙে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়। চোখ আছে ক্যামেরার দিকেই, বললে—"না, না—ফটোই তোলাব না আমি·· ও আমার ভালো লাগে না·· হঠাৎ এসে ফটো তোলার মধ্যে বসতে হবে !·· আপনি আগে বললেন না বুবুয়া—জানলে আমি কখনই আসতাম না ··"

ব্যাপারটা বড়ই বিসদৃশ হয়ে উঠল ; বীরেন্দ্র সিঙের ওপব অনুযোগটা সবার কানেই অত্যন্ত কর্কশ শোনাল। মাস্টারমশাইও অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিলেন—তাঁর রসিকতার সঙ্গে ব্যাপারটাব সম্বন্ধ আছে ভেবে ; বীরেন্দ্র সিঙের প্রতি রূঢ়তায় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, কি করে যে সামলাবেন ব্যাপারটা যেন মাথায় আসছে না। সরমা যেন আরও কিছু ব'লে না বসে এই ভয়েই এগিয়ে গিয়ে হাতটা ধরলেন, বললেন—"বেশ, তা তোমার ইচ্ছে না থাকে না-ই তোলা হবে ফটো, তাতে আর কি ?···বসবে চলো।"

"আগে উনি সরিয়ে নিন···আপনি ওটা নিন না সরিয়ে !"

বেশ একটু বিরক্তি আর হুকুমের টোনেই কথাটা ব'লে সরমা আবার পা বাড়াতে বাড়াতে বললে--"না হয় তুলুন, আমিই যাচ্ছি সরে।"

মৃন্ময়ও যেন প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ, তাড়াতাড়ি স্ট্যাণ্ড থেকে ক্যামেরাটা আলাদা করে, সবগুলি গুটিয়ে সুটিয়ে নিয়ে এগিয়ে এল। শুধু সে-ই ব্যাপারটা বুঝেছে, এগিয়ে এসে বললে—"সরি, সরমা দেবী, যদি কোন কারণে আপনার বিরক্তির হেতু হয়ে থাকি।"

মাস্টারমশাই তার পিঠে একটা মৃদু আঘাত দিয়ে বললেন—"বাঃ, তুমি গা পেতে নিচ্ছ কেন ?—এক এক জনের হয় না এরকম ?···এই তো বড় হওয়া পর্যন্ত আমারও মনে ভয় ছিল— ওর মধ্যে বুঝি কি যাদু করে টেনে নেয় মানুষকে, তাইতেই হুবহু চেহারাটা ছাপা হয়ে যায়।"

হেসে বাতাসটা লঘু করে দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেউই যোগ দিতে না পারায় যেন আরও বেশি অপ্রতিভ হয়ে গেলেন। লখমিনিয়ার কেউ এমন একটা অস্বস্তির মধ্যে পড়েনি এ-পর্যন্ত।

ঠিক এঁদের মতো অস্বস্তিতে পড়েন নি শুধু বীরেন্দ্র সিং আর সুকুমার, সেটা

কিন্তু আর কেউ অত বুঝতে পারলে না। সবার অলক্ষ্যেতে ওঁরা দুজনে পরস্পরের সঙ্গে কয়েকবার দৃষ্টি-বিনিময় করলেন। শেষকালে বীরেন্দ্র সিং বললেন—"আপনি বিটিয়াকে না হয় বাড়ি নিয়ে যান ডাক্তারবাবু; আসলে ওর শরীরটা আজ ভালো নেই বলছিল···সোজা এখানে নিয়ে আসাটাই ভুল হয়েছে আমার।"

—সামলাবার যে একটা ব্যর্থ চেষ্টা সেটা সবাই বুঝলে, কিন্তু বুঝছে জেনেও বীরেন্দ্র সিঙের বুদ্ধিতে এর বেশি কিছু এল না সন্ত সন্ত।

আসল কথাটা কিন্তু বুঝলে মাত্র মৃন্ময়। এই অদ্ভুত ফটো-আতঙ্ক মৃন্ময়ের সন্দেহের আর একটা প্রমাণ হয়ে হইল—একটা বড় প্রমাণই; কিন্তু ব্যাপারটা এত কুৎসিৎ আকারে এসে পড়ল যে ওকে এ গোয়েন্দাগিরির পথটাই আপাতত ছেড়ে দিতে হ'ল। বীরেন্দ্র সিং বা সুকুমার নাই বুঝুক, ওর মনে তো এই সঙ্কোচটাই হওয়া স্বাভাবিক যে সবাই এইটেই ভেবে নেবে—মৃন্ময়ের হাতে ফটো তোলানোতেই সরমার যত আপত্তি; এর পাশেই তো ওর সম্বন্ধে একটা কুটিল প্রশ্ন ওঠবার কথা।

সরমার ওপর প্রতিক্রিয়াটা হ'ল বড় উৎকট রকমের। ওর আতঙ্কটা হঠাৎ বড় উৎকট হয়েই দেখা দিয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল বিরক্তি, যাতে ওর সামঞ্জস্য-বোধটা একেবারেই নষ্ট ক'রে দিয়েছিল, নৈলে সে এমন একটা কাণ্ড করে না। বাড়ি গিয়ে সত্যই সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার পরদিন একভাবেই কাটল, মাথাব্যথা, জ্বরভাব, কথাবার্তায় একেবারেই অনিচ্ছা। সুকুমার ভেতরে ভেতরে বেশ একটু চিন্তিত হয়ে উঠল—আবার তার আসল অসুখটা না মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে। এদিক দিয়ে বীরেন্দ্র সিংও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, দুজনে গোপনে খানিকটা পরামর্শও হ'ল।

পরদিন থেকেই কিন্তু সে আবার বেশ সামলে উঠল। নিয়ম মতো সকালের সমস্ত কাজ মায় স্নান পর্যন্ত সেরে যখন চায়ের টেবিলে এসে বসল তখন বেশ সুস্থ। সুকুমারের সঙ্গে প্রথম কথাই হ'ল—"পরশু মাথায় হঠাৎ কী ভূত যে চেপে বসল! ···কী ভাবলেন সবাই জানিনা—দাদু কি ভাবলেন, বুবুয়াই বা কি ভাবলেন!···"

চা ঢালতে ঢালতে বলছিল, স্কুমার চেয়ে চেয়ে একটু দেখলে, বললে—"কেন চাপল ভূত ?"

সে কথাতো স্কুমারকেও জানানো চলে না ; সরমা উত্তর করলে—"তা কি জানি ?—তা জানতে হ'লে তো ভূতের নাড়ী-নক্ষত্র জানতে হয়। আমি ভাবছি এখন সামলাই কি ক'রে ব্যাপারটা। কাকে কি বলেছি তাও মনে পড়ছে না ভালো করে যে ক্ষমা চাইব।"

স্কুমার একটু ভেবে নিয়ে বললে—"তোমার বুবুয়ার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে না, মাস্টারমশাইয়ের কাছেও নয়, তবে মৃন্ময়বাবু একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন।· ·অবশ্য এমন কিছু বলনি তাঁকে যার জন্যে তোমায় লজ্জিত হতে হবে ; ব্যাপারটা তুমি যতটা বড় করে দেখছ তেমন কিছু হয়ওনি।"

শেষের কথাগুলো বললে ডাক্তার হিসাবে—আবার শক না লাগে মনে। মস্তিষ্কের ওপর তার প্রতিক্রিয়া হবে।

এর পর নিঃশব্দেই প্রাতরাশ শেষ হ'ল, সরমা রইল নতদৃষ্টিতেই। স্কুমারও কিছু বললে না, শুধু দৃষ্টি ফিরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকবার দেখলে ; বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

শেষ হ'লে সরমা বললে—"চলো, ওঠ।"

"কোথায় ?"

"মৃন্ময়বাবুর ওখানে। · একটু সাহায্যও করো, ডাক্তার মানুষ তো—কী অসুখ হ'লে হঠাৎ অমন মতিচ্ছন্ন হয় মানুষেব।— একটা নাম ঠিক করে রাখো।"

বাইশ

দিনকতক পরে বীরেন্দ্র সিং বাড়িতে একটি ছোটখাট অনুষ্ঠানেরব্যবস্থা করলেন। উদ্বোধনের দিনটা প্রায় এসে পড়েছে, নাটক দুটি তৈরি, একবার স্টেজ রিহার্সেল দিয়ে-দেওয়ার কথা উঠল। ওঁর প্রাসাদের সঙ্গেই একটা ছোট প্রেক্ষাগৃহ আর স্টেজের ব্যবস্থা আছে, রিহার্সেলটা সেইখানেই হবে।

এই উপলক্ষে একটা ছোটখাট গার্ডেন পার্টিরও ব্যবস্থা করেছেন। এও এক হিসাবে রিহার্সেলই, অনুষ্ঠানের সময় যা হবে তার একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। প্রভেদ এইটুকু যে এটা তাঁর নিজের বাড়িতে ব'লে, আর মাত্র আশ্রম, কল আর হাস-পাতালের কয়েকটি অন্তরঙ্গ ব্যক্তি আর পরিবারকে নিয়ে ব'লে, বাড়ির মেয়েদের দিক থেকে বীরেন্দ্র সিঙের স্ত্রী ও পুত্রবধূও থাকবেন উপস্থিত।

ঠিক এই ধরনের অনুষ্ঠান ওঁদের বাড়িতে এই প্রথম। যখন থেকে প্ল্যান আঁটা হচ্ছিল তখন থেকেই কথাবার্তার মধ্যে বোঝা গেল যে সরমার এ বিষয়ে বেশ ধারণা আছে, তাই তার ঘাড়েই প্রায় সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন বীরেন্দ্র সিং। সুকুমারের হাসপাতাল, তার সময় নেই, তবে সরমাকে সাহায্য করছে মৃন্ময়, তারও বেশ আইডিয়া আছে। তা ভিন্ন সময় আছে প্রচুর। স্টেজ-সম্বন্ধীয় সব কিছুই তৈরি, অল্প অল্প যা বাকি আছে, আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ হয়ে আসছে; পাঁজি দেখে শুভদিন ঠিক করা, তাড়াহুড়ার বালাই নেই।

মৃন্ময়কে ডেকে নিয়েছে এক হিসাবে সরমাই। ফটোগ্রাফির ব্যাপারটার পর থেকেই ওর চেষ্টা—যাতে মৃন্ময়ের মন থেকে গ্লানিটুকু মিটে যায়। এর জন্য অবশ্য ক্ষমা চায়নি; সেদিন ক্ষমা চাইবার জন্য তাড়াতাড়ি তোয়ের হ'লেও ভেবে দেখলে তাতে ব্যাপারটা আরও ঘাঁটিয়ে তোলা হবে মাত্র। এমন কি গেলও না সদ্য সদ্য; ঠিক করলে একটু সজাগ থাকবে, তারপর যেমন যেমন সুবিধা হবে, কিছু ক'রে বা কিছু ব'লে চেষ্টা করবে যতটা হয় পরিষ্কার।

প্রথম সুযোগটা করে দিলেন বীরেন্দ্র সিং। সেইদিন বৈকালে যখন সরমা হাসপাতাল-প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হ'ল—একটু যেন বিষণ্ণই—তিনি ডেকে নিয়ে বললেন—"এসো বিটিয়া, এখন শরীরটা আছে কেমন ?"

সরমা পাশের চেয়ারটায় বসতে বসতে বললে—"ভালোই তো বুবুয়া, কী হয়েছিল আমার ?···ও ! কাল—সে সামান্য একটু মাথা ধরেছিল···ও তো লেগেই আছে।

একটু চুপচাপ গেল। শুধু মৃন্ময় একটু উসখুস করলে, যেন কি একটা বলতে গিয়ে চেপে গেল, হয়তো আবার ক্ষমা চাইতে গিয়েই। এর পর বীরেন্দ্র সিং একটু অনুতপ্ত-কণ্ঠেই আবার বললেন—"মেয়ের কাছে কেউ ক্ষমা চায় না বিটিয়া, কিন্তু তা হ'লেও দোষ যা দোষের তা দোষেরই, তুমি অনুষ্ঠানের জন্যে কলকাতা থেকে ফটোগ্রাফার আনাবার কথায় বৌমা আর তোমার মাইয়াকে যখন বললে ও-জিনিসটা তুমি একেবারে পছন্দ কর না—মানুষের চেহারা নিয়ে হৈ-চৈ করা—তখন আর কিছু না হোক তোমায় জানিয়ে দেওয়া আমার উচিত ছিল যে সেদিন ফটো তোলবারই ব্যবস্থা হয়েছে এখানে। আমার কেমন দুবুদ্ধি হ'ল, ভাবলাম যা পছন্দ নয় তারই মাঝখানে বসিয়ে বিটিয়াকে একটু ফ্যাসাদে ফেলা যাক—ওর যখন এটা আর একটা খামখেয়াল মাত্র।·তোমার যে এতখানি অশ্রদ্ধা তা জানলে ”

কৃতজ্ঞতায় সরমার গলায় যেন কান্না ঠেলে উঠছিল, কেননা এর সমস্তটুকুই বানানানো—পরশুর ব্যাপারটি সামলে নেবার জন্য। অথচ রহস্য-ছলেও কখনও একটা মিথ্যা বলতে শোনেনি বীরেন্দ্র সিংকে। ব্যথিত কণ্ঠে বললে—"কিন্তু একটু বাড়াবাড়ির অশ্রদ্ধা নয় বুবুয়া ? · ফটো আমি তোলাই না—হয়তো মাত্র বার দুই তুলিয়েছি জীবনে, কেন না জিনিসটা আর্ট না হয়েও আর্টের দাবি করে।·· কিন্তু আমরাও তো ভদ্র না হয়ে ভদ্রতার দাবি করি বুবুয়া।"

এই অনুতাপের বেদনাটুকুতেই মনে হ'ল সেদিনকার গ্লানি তিন ভাগ পরিষ্কার হয়ে গেল, এ নিয়ে কথা আর এরপর বেশি হয়নি, বাকি যেটুকু অস্বস্তি ছিল, সেটুকু ক্রমে মেলামেশায় কেটে গেল।

মৃন্ময়ের দিকে বাইরে বাইরে কাটলেও, মনের ভেতরটাও যে একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেলই—এ কথাটা হয়তো বলা যায় না। সে সেদিনকার অপমানটা অবশ্য মনে পুষে রাখলে না, কিন্তু তার কারণ এ নয় যে একজন মেয়ের হাতে অপমান তার কাছে সুমিষ্ট—আসল কথা এ অধৈর্যতার গোড়ায় আছে একেবারে অন্য জিনিস, যা মাত্র সে আর সরমা জানে, আর যার সম্বন্ধে সন্দেহটা এই ঘটনাটুকুতে পুষ্টই হ'ল।

কিন্তু সে ছেড়েই দিলে গোয়েন্দাগিরি। এই রহস্য উদ্‌ঘাটন চেষ্টায় তার সময় যাচ্ছে, অথচ এর ফল কি হ'ল?—একটা নূতন জায়গায় এসে তার বায়ু বিষাক্ত করা, মাত্র এইটুকু নয় কি? তাই পার্টির জন্য এই যে আয়োজন এর পূর্ণ সদ্ব্যবহারই করলে মৃন্ময়—যাতে তার এতদিনের গোয়েন্দাগিরির ভাবটা মুছে যায় সরমার মন থেকে। কতবার পরস্পরের মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে কথা কইতে হ'ল, সাজানো-গোছানো নিয়ে পরামর্শ, এমন কি তর্ক পর্যন্ত, কিন্তু চোখে এতটুকুও সেই আগেকার কৌতূহলের ভাব থাকতে দিলে না। প্রথমটা চেষ্টাই করতে হ'ল, তার পর এইটেই বেশ সহজ হয়ে এল এবং ক্রমে মনে একটি বেশ শুচিতার ভাবও যেন ফুটে উঠছে বলে অনুভব করতে লাগল মৃন্ময়। এ সবের প্রতিক্রিয়া সরমার ওপর দিল দেখা—কাজের মধ্যে হাসি ঠাট্টা আদেশ-অনুরোধে এমন একটি রূপ ফুটেছে আজ যার পানে নিষ্কলুষ সখ্যের দৃষ্টি ভিন্ন অন্য দৃষ্টিতে চাওয়াই যায় না। বড় চমৎকার লাগছে মৃন্ময়ের। এই সখ্যই কি সাধনার বস্তু নয়?... চেষ্টা করতে ইচ্ছা করছে।

কতকটা এই জন্যই একবার অবসর ক'রে এবং খানিকটা সাহস করেও সেদিনের ফটোগ্রাফির প্রসঙ্গটা তুললে। অবশ্য একটু ঘুরিয়ে। বললে—"কাল আপনি বাবু বীরেন্দ্রসিংকে ফটোগ্রাফি সম্বন্ধে যে-কথাটা বললেন সেটা আমার খুব মনে লেগেছে সরমা দেবী—অর্থাৎ ফটোগ্রাফির আর্ট ন হয়েও আর্টের স্পর্ধা করা।"

সাজানো-গোছানো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এবার ওরা বাসায় ফিরছে পার্টির জন্য তৈয়ের হয়ে আসতে। এখানে-ওখানে যা একটু আধটু ত্রুটি আছে, চাকরদের নির্দেশ দিয়ে ঠিক করিয়ে দিচ্ছে, তারই মধ্যে একটা সিগারেট বের করে রূপার কেসে ঠুকতে ঠুকতে কথাটা বললে মৃন্ময়।

সরমা একবার চকিতভাবে ঘুরে চাইলে, তারপর দৃষ্টি নত করে ব্যথিতস্বরে বললে—"ও-কথাটা মন থেকে সরিয়ে ফেলুন মৃন্ময়বাবু ··দয়া করে।"

মৃন্ময় বললে—"আপনি নিশ্চয় সেদিনকার কথা ভেবে বলছেন—সেই যে ফটো নেওয়া পণ্ড হ'ল। তা হলে আপনাকে মন পরিষ্কার করেই সব বলি, কেন না মনে পাপ পুষে লাভ নেই; আমি সেদিন সত্যিই বড় আঘাত পেয়েছিলাম, তার কারণ সেদিন এইটুকুই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সে আমার হাতে ফটো তোলানোতেই আপনার আপত্তি। কাল বাবু বীরেন্দ্রসিংহের মুখে প্রকৃত কারণটা বুঝতে পেরে পর্যন্ত আমি যে কী স্বস্তি অনুভব করছি!···"

"কিন্তু আমার সে কী অস্বস্তি!"

"না, আপনি ও-সব মুছে ফেলুন মন থেকে, আমার অনুরোধ। আমি শুধু স্বস্তিই অনুভব করছি না সরমাদেবী; যে নিজের প্রিন্সিপলের কাছে আর সব কিছুকেই তুচ্ছ করতে পারে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধাও যে কতখানি তা আমি কখনই কথায় বুঝিয়ে উঠতে পারব না।"

"তুচ্ছ করবারও তো একটা সীমা থাকা চাই? সেটা লঙ্ঘন করে আমি কি করে নিজেকে ক্ষমা করি বলুন? আপনিই বা অন্তর দিয়ে এখন মানুষকে কি করে শ্রদ্ধা করতে পারেন?"

—মার্জনা পেয়েছে বলেই সরমার দৃষ্টিটা আরও ব্যথিত হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে গিয়ে আরও বেড়ে গেল দেখে মৃন্ময় যেন নিরুপায় হয়ে দৃষ্টি নত করে আস্তে আস্তে সিগারেট টানতে লাগল। সরমা আড়চোখে দু'তিনবার দেখলে; এমন চমৎকার দিনটি আবার মলিন হয়ে আসে দেখে সেও যে কি করবে ভেবে উঠতে পারছে না। তারপর মৃন্ময়ই, যেন চমৎকার একটি যুক্তি পেয়েছে এইভাবে একটু উল্লসিত হয়েই বলে উঠল—"বেশ, আর সব কথাই ছেড়ে দিন, কিন্তু যে আঘাত পেলে সে ভুলতে পারছে—অথচ যে আঘাতটা দিলে সে অনুতপ্ত, নিজেকে ক্ষমা করতে পারছে না—এ মহত্ত্বের কাছেও শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুইয়ে আসবে না?"

সরমা একেবারে খিলখিল করে হেসে উঠে বাতাসটা হাল্কা করে দিলে, বললে –

"না, মানুষে জোর করে দেবতার আসনে বসাচ্ছে অথচ সে-আসন নিতে চাইছি না—এ-বোকামির এইখানেই শেষ হোকে।...এবার চলুন, আবার ফিরতে হবে, আমাদের তো এইখানেই শেষ নয়, নাটকের হাঙ্গাম আছে। দাঁড়ান, বুবুয়াকে, মাইয়াকে বলে আসি, আমাদের দুজনের ঘাড়ে সব চাপিয়ে সবাই বেশ সরে দাঁড়িয়েছে।"

"জানেন, আপনি রয়েছেন, কোন রকম ত্রুটি হবার ভয় নেই।"

"আর আমিও যে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি—হাজার ত্রুটি হলেও কারুর শ্রদ্ধা কমবে না জেনে..."

মুখের পানে চেয়ে কথাটা বলতে বলতে, শেষ না করেই সরমা আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

পার্টিটি বেশ হ'ল। এর অনেকখানি কৃতিত্বই তার, কিন্তু আত্মপ্রসাদে আজ মনটি এমন উথলে উথলে উঠছে যে সমস্ত যশটুকু সরমার ওপর অর্পিত করবারই চেষ্টা মৃন্ময়ের। এটা তো ঠিক যে আজ যদি অমন করে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব-সাধনের চেষ্টা না করত—আর তাইতে ওর এমন আনুকূল্য না পেত তো সমস্ত মন দিয়ে জিনিসটাকে এমন নিখুঁতভাবে গড়তেও পারত না সে। এই নিজের যশ ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টাতে হাসিমুখে যে একটু কলহ-কথা-কাটাকাটি হ'ল, তাতে ওদের পরস্পরের প্রতি প্রীতি আরও নিবিড় হয়ে উঠল, পুরণো কটা মাস যেন মুছে গেল ওদের মন থেকে।

মৃন্ময় ভাবছিল—ছেলেমেয়েকে তাহ'লে অন্য আর এক ভাবেও তো কামনা করা যেতে পারে! নিজেকে প্রশ্ন করছিল—নিষ্কলুষ কামনা কি আরও মধুর নয়?

পার্টি আরম্ভ হয়েছিল সন্ধ্যার সময়, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শেষ হ'ল, এর পর হবে হিন্দী থিয়েটারটা।

পার্টিতে একটু ত্রুটি ছিল, অবশ্য শুধু মৃন্ময়েরই হিসাবে; খানাপিনার দিক দিয়ে প্রায় বিলাতী ডিনারেরই মতো, কিন্তু পিনার আসল জিনিসটাই বাদ। অথচ আজ মনটি এমন ভরপুর যে, কোন জিনিসেরই অঙ্গহানি হতে দিতে ইচ্ছা হয় না।

জায়গাটা পরিষ্কার করে যতক্ষণে দর্শকদের বসবার জন্য প্রস্তুত করা হবে, ততক্ষণে একবার বাসা হয়ে আসতে গেল মৃন্ময়, একটা ছুতো করে। খুব মাত্রা রেখে একটু সুরা কণ্ঠে ঢেলে নিয়ে মোটরে ক'রে ফিরে আসবে, স্টার্ট দিয়েছে, চাকা একটু একটু ঘুরতে আরম্ভ করেছে, পেছন থেকে ডাক পড়ল—"শুনুন!"

রুক্মার কণ্ঠস্বব। যেখানে হাসপাতালের রাস্তা থেকে তাদের বাড়ির রাস্তাটা বেরিয়ে গেছে, সেইখানটায় দেখলে তাকে, এইদিকেই আসছে, একটু আলুথালু ভাব যেন মোটরের শব্দ শুনেই যেমন ছিল বেরিয়ে এসেছে।

সমস্ত পাড়াটা নির্জন, চাকরবাকরেরা পার্টির তামাসা দেখতে গেছে, আসবার সময় ঝংড়ু পর্যন্ত চোখে পড়েছিল মৃন্ময়ের।···কয়েক সেকেণ্ডের জন্য একটা বিভ্রম, অল্প মাত্রায় হলেও সুরাটুকু সদ্য সদ্য মাথায় উঠছে। প্রশ্ন করলে—"আমায় ডাকছ?"

"আর কাকে?"

কিন্তু যা ধ্বংসের সহায় তাই আবার ধর্মেরও, ঐ সুরার শক্তিতেই মৃন্ময় আপনাকে সংযত করে নিলে। মোটরটা থামিয়েছিল, কিন্তু ইঞ্জিনটা বন্ধ করে নি, গলা বাড়িয়ে হাত নেড়ে বললে—"এখন একেবারে সময় নেই, ভয়ানক ব্যস্ত।"

চালিয়ে দিলে মোটর, আর ফিরে দেখতেও সাহস হ'ল না।

মাথাটা চনচন করছে, তাড়াতাড়ি খানিকটা এগিয়ে গিয়ে মোটরটা আবার নরম ক'রে দিলে।···একটা অনুশোচনা ঠেলে আসছে, কিন্তু তাও ক্ষণস্থায়ী।··· আজ ওর বিজয়েরই দিন, এটা দ্বিতীয়, রুক্মাও যাক ওর পথ থেকে সরে···ওর নবজীবনের নূতন পথ···

সুরা যে-মাত্রায় সেবন করেছে তাতে ধরা পড়বার কোনই সম্ভাবনা নেই, তবু আর কারুর সঙ্গে মেলামেশা না করে মৃন্ময় একেবারে স্টেজে গিয়ে উঠল, রিহার্সেলটা পরিচালনা করতে সমস্ত প্রভাবটুকু কেটে যাবেখন, তারই তো চার্জ।

বেশ ভালো হ'ল। বেরিয়ে আসতে খানিকটা প্রশংসা-অভিনন্দনের তোড় উঠল; সেটা কাটিয়ে কিন্তু মৃন্ময় সবার থেকে খানিকটা তফাৎ হয়েই পেছনে গিয়ে বসল। সেই একই কারণ, একটু বেশি সাবধান থাকা। প্রশ্ন হ'লে হেসে বললে —"আমারটা বলছেন ভালো হয়েছে, কিন্তু শুধু তাতেই হবে না তো; সরমা

দেবীরটার খুঁৎ বের করতে হবে যে এই সঙ্গে, তাই একটু একা একাই বসি।”

মিনিট পনের পরেই বাংলা নাটিকাটা হ'ল আরম্ভ; চমৎকার হচ্ছে। আজ সরমার সঙ্গে যা নূতন সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে তাতে তার সফলতায় একটা অদ্ভুত আনন্দ ঠেলে উঠছে মৃন্ময়ের মনে, সুবার একটা সূক্ষ্ম প্রভাব মস্তিষ্কের কোন্ এক জায়গায় একটু রয়েছেই তো—তাতেই এক একবার মনে হচ্ছে—উঠে যাই, স্টেজের ভেতরে গিয়ে সদ্য সদ্য অভিনন্দনটা ক'রে আসি গিয়ে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত ক'রে ফেলছে।

এক সময় কিন্তু আর রাখা গেল না সংযম পুরোপুরি। অন্তত আর পাঁচজনের মধ্যে ব'সে দু'টো প্রশংসার কথা না উচ্চারণ ক'রে পারছে না মৃন্ময়। তার মধ্যে, সরমার পরেই সুকুমার সবচেয়ে উপযোগী ভেবে তার পেছনের চেয়ারটতে গিয়ে বসতে যাচ্ছিল, বাধা পড়ল।

বাধা আর কিছু নয়—যে মেয়েটি শ্রীমতীর ভূমিকা নিয়েছে, বিলম্বিত নৃত্যচ্ছন্দে সে করছে স্টেজের মধ্যে প্রবেশ। মেয়েটিকে চেনে, তারই অধীনের কর্মচারী ভাগবতপ্রসাদের কন্যা চন্দ্রকলা। বেহারী হলেও ভাগবত একটু প্রগতিশীল, পনের-ষোল বৎসর বয়স, তবুও মেয়েটিকে দেখাতে-শোনাতে বাঁধ-কল অঞ্চলে নিয়ে যায়, বার দুয়েক মৃন্ময়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়ায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। মেয়েটি আশ্রম-স্কুলে একটু উঁচু ক্লাসেই পড়ে, বেশ সপ্রতিভ।

কিন্তু এসবের জন্য নয়; মৃন্ময় যে জন্য থমকে দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে তার স্মৃতির তন্ত্রীতে হঠাৎ একটা মৃদু আঘাত। যে-ছন্দে চন্দ্রকলা প্রবেশ করলে—তার চোখের চাউনি, গ্রীবার ভঙ্গি, পায়ের টিপ, সমস্ত তনুখানির লীলায়িত মৃদু আক্ষেপ —এ যেন কবে কোথায় দেখা, আর সে এমনভাবে দেখা যে জীবনে এত দেখার মধ্যে হারিয়ে যায় নি!···কিন্তু মনে পড়ছে না তো কবে দেখা, কোথায় দেখা, কার অঙ্গে ঠিক এই ছন্দ একদিন উঠেছিলো দোল খেয়ে।··একটু এগিয়ে এসেছিল, মৃন্ময় আস্তে আস্তে আবার একটা চেয়ারে ব'সে পড়ল।

নাচটা আরম্ভ হ'ল, একটু দ্রুত লয়ে, তারপর আর একটু, তারপর আবার

বিলম্বিতে ফিরে এল। নিজের সামনের চুলগুলো মুঠিয়ে ধ'রে মৃন্ময় স্থির দৃষ্টিতে আছে চেয়ে, খুব অল্প আভাস দিয়ে স্মৃতিটা যাচ্ছে মিলিয়ে।···মাথার কোন্ এক কোণে যেটুকু সুরার প্রভাব এখনও অবশিষ্ট আছে সেটুকুকে প্রাণপণে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে—বুকে এরই মধ্যে একটা ধড়ফড়ানি এসে গেছে—কখন্ থেমে যায় নাচটুকু, বহুদিনের একটা হারানো স্মৃতি আবার বুঝি চিরকালের জন্য অবলুপ্ত হয়ে যায়।

ছন্দ ক্রমে আরও দ্রুত হয়ে উঠছে, নৃত্যটা ক্রমে রূপের পূর্ণতায় যেন মূর্ত হয়ে উঠছে—একটু একটু যেন আসছে আভাস—হ্যাঁ, এমনি একটা উৎসবের দিন—কবে ? —কোথায় ? · কিন্তু কায়াবদ্ধ নয়—যেন কোনও ছায়ার অস্পষ্টতার মধ্যে, যেখানে প্রত্যক্ষের কামনাব সঙ্গে মেশানো থাকে অপ্রত্যক্ষের বেদনা—একটা অপূর্ণতার হাহাকাব···

ক্রমে এসে পড়ছে—হ্যাঁ, এসেই পড়ছে যেন লখমিনিযা মিলিয়ে গেছে—এলাহাবাদের একটি ধনীগৃহের উৎসব প্রাঙ্গণ—একজন বাঙ্গালী ধনকুবের···এই নাচই, কিন্তু কারুর রক্ত-মাংসের দেহে নয়, সিনেমার রূপালী পর্দায় !

তারপরেই যা স্মৃতির লহব, যা স্পষ্টতা, তাতে মৃন্ময়ের সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ দিয়ে যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল--সামনে চেয়ে আছে চন্দ্রকলার দিকে--নিজে অনুভব করছে, চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে···পেয়েছে মৃন্ময়—এই কয়মাসের সাধনার পর যেদিন ছেড়ে দিলে হতাশ হয়ে, সেইদিনই প্রসন্ন অদৃষ্ট তাব হাতে দিলে তুলে।·· সেই রূপালী পর্দায় এই নাচ, আর ভুল নেই—সেদিন ছিল ঐ সরমা—নামটাও মনে করবেই মৃন্ময়—সেদিনকার ছায়ারূপিণী সরমাই আজ চন্দ্রকলাব কায়ায় সেই ছন্দ ঢেলে দিয়েছে···

—নিজেকে সংযত রাখে কি ক'রে মৃন্ময় এতবড় একটা বিরাট উল্লাসের মধ্যে ? —তার মাথার সুরা যেন শতগুণ মত্ত হয়ে উঠেছে !

তেইশ

সরমা তাহলে একজন সিনেমা-স্টার !

কিন্তু এতবড় একটা আবিষ্কারে যেন এতটুকুও না সন্দেহ থাকে। নাচটা থেমে গেলে সে এনকোর দিলে। সবাই তার দিকে মুখ ফিরিয়ে যে একটু বিস্মিতভাবেই চাইলে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, বেশ ভালো ক'রে স্মৃতিটাকে ঝালিয়ে নিচ্ছে, একবার নয়, দু'বার দেখে নিয়ে ··দরকার হয় তো আরও দেবে এন্‌কোর—নিজেকে সংযত করা শক্ত হয়ে পড়ছে। তারপর যতক্ষণ নাটিকাটুকু চলল, সে একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইল, কি দেখছে একেবারে খেয়াল নেই। শেষে হ'ল হুঁস। হুঁস হ'ল যে ছেলেমানুষের মতো এন্‌কোর দিয়ে বসেছিল, তাতে তার মনের চঞ্চলতা খানিকটা ছলকে বেরিয়েছে—কী ভাবলে সবাই ?

উত্তেজনায় শরীরটা তখন ভেতরে ভেতরে কাঁপছে তবু উঠে গিয়ে পেছন থেকে সুকুমারের ডান হাতটা চেপে ধরলে, বললে—"কন্‌গ্র্যাচুলেট্‌ করি মিস্টার সেন।"

পত্নীর যশটা একটু খাটো করবারই চেষ্টা করলে সুকুমার, একটু হেসে বললে—"সত্যি ভালো হয়েছে নাকি ? কে জানে, কাটখোট্টা মানুষ, এসব বুঝিনা মশাই।"

মাস্টারমশাইয়ের কথায় একটু হাসির লহর উঠল, বললেন—"বিয়ের সময় জুঁইয়ের গোড়ের বদলে তোমার গলায় একটা স্টেথেস্কোপই লটকে দিলে ভালো করত নাতনী আমার।"

সরমা বেরুতে দেরি করছে, নিশ্চয় প্রশংসার সম্মুখীন হওয়ার সঙ্কোচ ; মৃন্ময়ের কিন্তু আর ধৈর্য রাখা দায় হয়ে উঠেছে, এইবার একবার দেখতে হবে নবাবিষ্কৃতা

সরমাকে,—স্মৃতির সরমার সঙ্গে পা থেকে মাথা পর্যন্ত মিলিয়ে। বললে—"না, সুখ হ'ল না মিস্টার সেন, দমিয়ে দিলেন।...কেন যে বেরুতে দেরি করছেন সরমাদেবী—যাই আত্মনেপদেই কন্‌গ্র্যাচুলেশনটা দিয়ে আসি"

এগুতে যাবে, তার পূর্বেই সরমা সবার সঙ্গে বেরিয়ে এল। মৃন্ময়ই আগে অভিনন্দিত করলে—"পরাজয়েও যে একটা আনন্দ আছে সেটা আজ বুঝলাম সরমা দেবী।"

সরমা লজ্জিতভাবে ঈষৎ হেসে উত্তর দিলে—"সেটা সত্যিকার পরাজয় না হ'লে; আমি তো জানছি, আমারই হার, হিন্দীটার সামনে; কৈ আনন্দ পাচ্ছি না তো।"

আবিষ্কারটুকু যেমন সরমার জীবনের সমস্ত রহস্য উন্মোচন ক'রে দিলে, তেমনি মৃন্ময়েব একদিনের সংযমকেই সঙ্গে সঙ্গে দিলে আলগা করে। আর দরকার কি? লখমিনিয়ার রসটুকু এবার নিংড়ে পান করতে হবে; একদিকে রইল রুম্মা, একদিকে সরমা। তবে, অনুষ্ঠান পর্যন্ত মৃন্ময় সামলেই রইল। সরমার দিকে এখন শুধু একটা তথ্য জানা দরকার—সে যে একজন সিনেমা-অভিনেত্রী এটা ওরা কি জানে? —অর্থাৎ সুকুমার আর বীরেন্দ্র সিং। মৃন্ময়েব পক্ষে ভালো হয় যদি সরমা তার কাছ থেকেও সব লুকিয়ে থাকে। এটার সম্ভাবনা অবশ্য কম, হ'লে কিন্তু সরমা একবারে মুঠোর মধ্যে এসে পড়ে এবং তার যেমন প্রতিপত্তি তার জোরে লখমিনিয়ায় মৃন্ময়ের প্রতিষ্ঠাও চারিদিক হয়ে পড়ে সুদৃঢ়।

অনুষ্ঠান পর্যন্ত নানাভাবে এই সন্ধানেই রইল, অবশ্য খুব সতর্কভাবে, খুব সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের সঙ্গে। বীরেন্দ্র সিং যে জানেন না তাতে সন্দেহ রইল না মৃন্ময়ের, তবে সুকুমারের ভাবটা বোঝা গেল না; হয় সে জানেই না, না হয় সে নিজেই এমন পাকা অভিনেতা যে নিখুঁতভাবে অজ্ঞতার ভাণ করে চাপা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মৃন্ময়কে জানতেই হবে, কেননা এই তথ্যের ওপরই সরমার সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধটা নির্ভর করছে। সে আর আড়-আবডালের ভরসা না রেখে যতটা সম্ভব সোজাসুজিই কথাটা তুললে সুকুমারের কাছে। একলাই ছিল

সুকুমার; তিনজনে মিলে নদীর ধারে তাদের বাগানে বসে চা খাচ্ছিল, মাস্টার মশাইয়ের কাছে সরমার বৈকালিক পাঠের দিন বলে সে উঠে গেল। কথাবার্তা সেদিন বেশ জমে উঠেছিল, আর তাতে সরমার ভাগই ছিল সবচেয়ে বেশি; সে চলে গেলে যে ছেদটুকু পড়ল তার মধ্যে মৃন্ময় বললে—"আপনাকে কন্‌গ্র্যাচুলেট করি সুকুমারবাবু।"

এমন প্রসঙ্গের মাঝখানে কথাটা পড়ল যে, উদ্দেশ্যটা বুঝতে সুকুমারের বাকি রইল না, একটু লজ্জিতভাবে বললে—"হ্যাঁ, মন্দ নয় সরমা, মৃন্ময়বাবু,—Rather a good girl." (ভালো মেয়েই একরকম)।

"Good is no word for it, (শুধু 'ভালো' বলা—সে তো কিছুই নয়); সরমাদেবী সেই শ্রেণীর মেয়ে যাদের কল্যাণদীপ্তি নিজের সংসার ছাড়িয়ে আশপাশের সমস্ত আবেষ্টনের ওপর গিয়ে পড়ে। লখমিনিয়ার অন্তত এদিককার জীবনের সরমা দেবীই প্রাণকেন্দ্র; One is tempted to have a home of one's own." (দেখে-শুনে নিজেরই সংসার পাততে ইচ্ছে হয় লোকের)।

এমন কথার ওপর মানুষে যে প্রশ্ন করে থা'কে, তাই করলে সুকুমার—"তা করছেন না কেন বিবাহ মৃন্ময়বাবু? সত্যি, আমরা সেই কথাই বলাবলি করি।"

মৃন্ময় একটু ম্লান হেসে মুখটা নিচু করলে, ছোট একটি দীর্ঘশ্বাসও ফেললে।

ওকে নিজে হ'তেই বলবার একটু সময় দিয়ে সুকুমার বললে—"সেরকম কোন বাধা আছে? মানে, বন্ধু হিসেবে আমরা যদি পারি কিছু করতে..."

মৃন্ময় আর একটু সময় নিলে, যেন বলবে কি বলবে না ঠিক করতে পারছে না। তারপর দৃষ্টি তুলে উত্তর করলে—"বন্ধু হিসেবে শুধু শুনতে পারেন, কেননা করবার আর কিছু নেই মৃন্ময়বাবু। আর শুনবেনও যে সে শুধু আপনি।"

"আপনার সিক্রেট্ অন্য কোন কাণেই যাবে না মৃন্ময়বাবু, নিশ্চিন্দি থাকতে পারেন। এমন কি, তেমন আপত্তি থাকলে আমাকেই বা কেন বলছেন? লাভ তো নেই কোনও।"

"একজন বন্ধুর কাণে তুলে দেওয়াও একটা মস্ত বড় লাভ, তবে জীবনে শোনবার মতন বন্ধুই পাওয়া যায় না সব সময়।...দাম্পত্য-জীবন সৃষ্টি করতে

আমি এক সময় খুব একটা দুঃসাহসের কাজ করেছিলাম। বয়স তখন আরও কম—ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিটা নিয়ে আমি জার্মেনীতেই রয়েছি, ছোটখাট কন্টিনেণ্টাল টুর সেরে দেশে ফিরব, এই সময় হামবুর্গের পথে ট্রেনেই একদিন একটি বাঙ্গালী মেয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল…"

"একা?"

"ঠিক একা নয়, তবে একা থাকলেও ক্ষতি হবার কথা নয়—অল্প পরিচয়েই প্রকাশ পেল, একজন সিনেমা-এ্যাক্‌ট্রেস্—স্টার কিনা ঠিক জানবার কথা নয়, তবে আমার আকাশে একেবারেই উজ্জ্বলতম স্টার হয়ে তিনি দেখা দিলেন।"

চুপ করে স্থিরদৃষ্টিতে সুকুমারের মুখের পানে চেয়ে রইল মৃন্ময়; বাইরে বাইরে একটা করুণ হাসি, তার অন্তরাল থেকে কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে এত বড় একটা সাদৃশ্যের কাহিনীতে মুখের একটুও পরিবর্তন হ'ল কিনা।

পরিবর্তন অবশ্য হ'লই; কিন্তু সে ধাঁধাঁ খেয়ে যাওয়ার বিবর্ণতা নয়।

সহজ একটা উগ্র কৌতূহলে সুকুমার প্রশ্ন করলে—"সিনেমা স্টার!… তারপর?"

অবস্থা বুঝে সদ্য সদ্য সৃজন-করা গল্প, মৃন্ময় সাদৃশ্যটা আরও বাড়িয়ে দিলে—'রোমান্সটাকে সংক্ষিপ্ত করেই বলব। ওদিক থেকে প্রতিদান পেলাম। ঠিক হ'ল, ঘোরাঘুরি ছেড়ে একটা নিবিড় বিশ্রামের মধ্যে পরস্পরকে দিনকতক পেয়ে নিই, তারপর একটা দীর্ঘ টুর—অ্যামেরিকাটাও তার মধ্যে ধরা ছিল—তারপর ইণ্ডিয়ায় ফিরে আমাদের নীড় রচনা। আমরা রাইনের তীরে একটি ছোট নির্জন পল্লী বেছে নিয়ে এক কৃষক পরিবারের পেড্ গেস্ট্ হয়ে উঠলাম। লখমিনিয়ার সঙ্গে জায়গাটার অদ্ভুত মিল—এই রকম পাহাড়ে-ঘেরা, এই বুলানীর মতন রাইনের একটা সুঁতি তলা দিয়ে গেছে ব'য়ে। জায়গাটা অজ পাড়াগাঁ, তবে আমরা যখন পৌঁছুলাম ঠিক লখমিনিয়ার মতনই এই রকম একটা ছোট ইণ্ডাষ্ট্রি সেখানে গড়ে উঠেছে, ভাগ্যক্রমে আমি তাইতে একটা ছোট-খাট কাজও পেয়ে গেলাম, মাস ছয়েকের কনট্রাক্টে।

অরুণাই জিদ করলে নিতে· হ্যাঁ, ওর সিনেমার নাম ছিল চন্দ্রা দেবী, নতুন

হয়ে বেরিয়ে এল বলে, দুজনে পরামর্শ করে আমরা আবার নতুন করে নাম রাখলাম অরুণা।”

স্থির দৃষ্টিতে দেখে যাচ্ছে মৃন্ময়। না, এত মিল, তবু সে-ধরনের কোনও পরিবর্তন নেই সুকুমারের মুখে; সেই নিতান্ত একটু নূতন ধরনের একটা জীবনকাহিনী শোনা, পরিচিত বলে একটু বেশি কৌতূহল, মাত্র এই।...কাহিনী বলার তাগিদ কমে এসেছে মৃন্ময়ের, তবু খানিকটা চালিয়ে গেল। একবার শেষ চেষ্টা হিসাবে সাদৃশ্যটা আর একটু বাড়িয়ে দিলে—“অরুণা, তার শিক্ষা, কর্মতৎপরতা আর মিষ্ট ব্যবহারে সেখানকার পাঁচটা সামাজিক কাজে এমন মিশে গেল যে অল্প দিনের মধ্যে ছোট জায়গায় জনপ্রিয় হয়ে উঠল, ফাক্টরির যিনি মালিক—ফন্‌ক্রুলার—তাঁর তো মেয়ের মতোই হয়ে উঠল—এতটা যে শেষ পর্যন্ত ঠিক হ'ল, আমাদের বিয়েটা ঐখানেই সেরে নোব, আর তিনি হবেন অরুণার গড-ফাদার।”

সুকুমার শুদ্ধ বিস্ময়ে ঈষৎ একটু হাসির সঙ্গে বললে—“তারপর!...একটা দিকে সরমার সঙ্গে কী অদ্ভুত মিল দেখুন! আপনি যে বলতে বারণ করলেন, নৈলে তা হ'ল কি শেষ পর্যন্ত? আপনি তো দেখছি একাই।”

আর ফল নেই গল্প বাড়িয়ে, মৃন্ময় মুখটা বিষণ্ণ করে নিলে। সুকুমার হঠাৎ পরিবর্তনটা দেখে ব্যথিত কণ্ঠে বললে—“কষ্টকর কিছু? তবে থাক না মৃন্ময়বাবু, তিনি যখন নেইও আপনার জীবনে...”

মৃন্ময় একটু ম্লান হাসলে, বললে—“কী ক'রে বলি আমার জীবনে নেই? নেই তো আমি আবার অন্য কাউকে নিয়ে নূতন ক'রে আমার নীড় রচনা করতে পারছি না কেন?...O, the memory! (হায়, সেই স্মৃতির বেদনা!)...আর একদিন ট্রাই করব সুকুমারবাবু, আজ ক্ষমা করতে পারবেন?”

শেষ করে দিলে।

সরমা তাহলে সুকুমারের কাছেও লুকিয়েছে। কিন্তু এল কি করে ওর জীবনে? আছেই বা কি সম্বন্ধে? উদ্বোধনের উৎসবটা আরও মাসখানেক

পেছিয়ে দিতে হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেশ সুচারুভাবেই সম্পন্ন হয়ে গেল। তার পবদিন থেকেই মৃন্ময় সুযোগেব পথ খুঁজতে লাগল।

সেদিন রুম্মাকে অমনভাবে প্রত্যাখ্যান করাব প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে করা যায় সে-চিন্তাটাও মনে বইল লেগে।

চব্বিশ

আরও প্রায় মাসতিনেক কেটে গেল।

দেখা সাক্ষাৎ সবমার সঙ্গে বোজই হচ্ছে, কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ ধবে একা পাওয়া দবকাব। তাব কোনও সুবিধাই হচ্ছে না। কথাটা পাডা গেল, তাব পবেই বাধা পড়ে গেল, তাতে উল্টা ফলই হতে পাবে। নূতন কল নিয়ে খুব ব্যস্তও মৃন্ময়, চেষ্টা কবে যে একটু সুযোগ বেব ক'বে নেবে তাও হয়ে উঠছে না।

শেষে দেখলে চিঠি লেখা ভিন্ন কোনও উপায় নেই। তারও বিপদ আছে, কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তে তাই ঠিক কবলে। দেরিও হয়ে যাচ্ছে বড বেশি, সেও তো একটা বিপদ।

বাত প্রায় সাড়ে দশটা। দুপুবেব দিকে বেশ খানিকটা ঝড-বৃষ্টি হয়ে গিয়ে পডন্ত শীতটাকে আবাব চাগিয়ে তুলেছে। পল্লীটা হয়ে গেছে নিশুতি। আহাবেব পব এক পেগ সুবা পান কবে নিয়ে মৃন্ময় লিখতে বসল চিঠিটা।

শক্ত, সাহস বুদ্ধি দুইয়েবই দবকাব, অবশ্য তার অভাব নেই, কিন্তু জাগিয়ে তুলতে হবে। তা ভিন্ন একটা রোম্যান্সেব গোড়াপত্তন হচ্ছে, বোতলটাও সামনে টেবিলের ওপব বসিয়ে রাখলে।

তিন চাব ছত্র লিখেছে, বাইরে রুম্মার ছেলে বুধাই এসে উপস্থিত হ'ল। সুকুমার 'কল' থেকে এখনও ফেরে নি, সরমা বড্ড উতলা হয়ে উঠেছে. একবাব বীরেন্দ্র সিঙেব ওখানে যেতে চায় কোন ব্যবস্থা কবতে, মৃন্ময়ের মোটবটা দরকার।

মৃন্ময় বেরিয়ে এসে বাইরের দরজাটা খুলে দাঁড়াল। প্রশ্ন করলে—"তিনি নিজেই যাবেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই তো বললেন।"

বাইরে এক মৃন্ময় কথা কইছে; ভেতরে আর এক মৃন্ময় চিন্তা করছে, খুব দ্রুতগতিতে।

"তিনি নিজেই আসবেন, না, মোটরটা পাঠিয়ে দোব? জিগ্যেস ক'রে এসো, আমি ততক্ষণ মোটরটা বার করাচ্ছি। বলবে, বড় গাড়ি, ওদিকে গেলে ঘোরাতে-ফেরাতে দেরি হয়ে যেতে পারে। আরও বলবে যদি আসেন তো তোমাদের কাউকে না হয় সঙ্গে নিয়েই আসবেন।··যা যা বলছি ঠিক মতো বোল'।"

সুরাটা মাথায় চনচনিয়ে উঠছে, সুযোগ তো একেবারে এত সুযোগ!—সোনায় বাঁধানো!

প্ল্যান ওর ভেতরে ভেতরে ঠিক হয়ে গেছে।·· তার আর মোটেই সময় নেই কিন্তু।

শোফারটা এখনও ঘুমায় নি, তাকে ডেকে বললে, তখুনি গাড়িটা বের ক'রে সে ঝাঝার রাস্তায় যতটা সম্ভব ছুটিয়ে বেরিয়ে যাবে, ডাক্তারবাবু গেছেন রতনডিহি রুগী দেখতে, প্রায় মাইল দশেকের মাথায় যে-রাস্তাটা বাঁয়ে বেরিয়ে গেছে। যদি মোটর ব্রেক্-ডাউন্ ক'রে থাকেই—পথেই দেখা হয়, ভালো, তাঁকে নিয়ে চলে আসবে, না হয় আরও এগিয়ে রতনডিহি যাবে চলে। শোফার জানালে—বোধ হয় যাওয়া-সম্ভব হবে না অত দূর, মাঝে একটা জোড (পাহাড়ী নদী) পড়ে, দুপুরের বৃষ্টিতে জল নেমে থাকাই সম্ভব!

মৃন্ময় তার মুখের দিকে চেয়ে রইল, শোফার বোধ হয় এড়াবার জন্যেই বললে—"নিশ্চয় তাই হয়েছে হুজুর, তিনি উদিকে পড়ে গেছেন।"

"আচ্ছা, তুমি বেরিয়ে যাও, দুমিনিটের মধ্যে, সঙ্গে আরদালি মোহনসিংকে নিয়ে নাও। হর্ণ দিয়ে লোক জাগাবার দরকার নেই। শুধু ফেরবার সময় বাঁধের কাছ থেকেই গোটাকতক হর্ণ দিও—যদি ঘুমিয়ে পড়ি।"

আরদালিকে নিজেই ডেকে দিলে। দু'মিনিটও লাগল না, মোটর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

দরজা দু'টো খুলে রেখে ভেতরে এসে প্রথমেই বোতলটা আলমারিতে সরিয়ে রাখলে। সুরার যেটুকু গন্ধ মুখে লেগে থাকবার কথা সেটারও ব্যবস্থা করলে, সামান্য একটু যে প্রভাব আছে সেটাকেও দাবিয়ে রাখবার ক্ষমতা ওর আছেই।

এখন সবটা নির্ভর করে সরমা একলা আসে কি কাউকে সঙ্গে নিয়ে। ও ইচ্ছে করেই সঙ্গে কাউকে নিয়ে আসতে বলে দিলে বুধাইকে, অবিশ্বাসের ইঙ্গিতটা স্পষ্ট করে দেবার জন্যেই। এখন দেখা যাক, সরমা কি-ভাবে নেয়।

সরমা একলাই এসে হাজির হ'ল, মুখের উদ্বেগটা চাপবার চেষ্টা করলেও খুব স্পষ্ট। বললে—"উনি এখনও ফেরেন নি—কোন্ সেই বিকেলবেলা গেছেন।··· আপনার মোটরটা···বলেছেন বের করতে ?"

বিবেকে একটু বাধছে, যাই হোক একজন অসহায়া স্ত্রীলোকই তো! কিন্তু সময় তো নেই, মোটর যেমন দু'ঘণ্টাতেও ফিরতে পারে তেমনি পাঁচ মিনিটেও তো ফিরে আসতে পারে কাছ থেকেই। মৃন্ময় সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণ করে বসল, বললে—"অরুণা দেবী, আপনি স্থির হয়ে বসুন, আরও ভালো ব্যবস্থাই করেছি আমি, সোজা রতনাডহরির দিকেই মোটর পাঠিয়ে দিয়েছি।"

ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে কাঠ হয়ে সরমা স্থির দৃষ্টিতে মুখের পানে চেয়ে রইল, চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসবে, চৈতন্যও হারিয়ে ফেলতে পারে ভেবে মৃন্ময় চেয়ারটা তার পেছনে সরিয়ে দিয়ে বললে—"বসুন · দাঁড়িয়ে রইলেন।"

সরমা সামলে নিলে, বসতে বসতে বললে—"বসছি কিন্তু আপনি দেখছি আমার চেয়েও চঞ্চল হয়ে পড়েছেন—নামটাই ভুল বললেন আমার, তাই ”

মৃন্ময় একটু হাসলে, বললে—"নামটা বিশিষ্ট করলে তো আর ভুল বলে মনে হবে না অরুণা দেবী? আপনি এক কাজ করলে আমাদের কথাবার্তা বেশ সহজ হয়ে যায়. দয়া করে যদি লুকোচুরির পাটটা চুকিয়ে দেন। সেতো আজ এই প্রায় বছর খানেক ধরে চলছে।"

"কি লুকোচুরির কথা বলছেন?"—মুখটা আবার ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, বলেই বললে—"আমার এই অবস্থা—স্বামী আমার কী যে বিপদে পড়েছেন—আপনার কাছে সাহায্য চাইতে এলাম বিশ্বাস ক'রে—এই দুপুর রাত্রে, একা আমি মেয়েছেলে…"

গলা শুকিয়ে আসবার জন্যেই থেমে গেল। মৃন্ময় বললে—"রাত দুপুর, একা মেয়েছেলে আপনি, তার জন্যে আপনার তিলার্ধ ভয় নেই, আমি কথা দিচ্ছি। আপনার স্বামীর তেমন কিছু বিপদ নিশ্চয় হয়নি, তবুও আপনি যা প্ল্যান করেছিলেন তার চেয়ে ভালো ব্যবস্থাই করেছি আমি, মোটর এতক্ষণ লখমিনিয়া ছাড়িয়ে গেছে। ওসব দিকে নিশ্চিন্দি হয়েই আপনি আমাদের কথাবার্তাটা শেষ করে নিন।"

"কি কথাবার্তা বলুন, আমি তো কিছুই হদিশ পাচ্ছি না, আপনি আমার নাম বলছেন 'অরুণা'!"

"হ্যাঁ, যে অরুণা দেবী একটা নামকরা ফিল্‌মে নায়িকার পার্ট নিয়ে…"

"আমি!…গেরস্তর একজন বৌকে আপনি রাত দুপুরে ছল করে ডেকে নিয়ে এসে বলছেন যে ফিল্‌মে নায়িকার পার্ট…"

—রাগে দাঁড়িয়ে উঠেছে সরমা।

"বসুন দয়া করে। সামান্য একটু ভুল হয়েছে, ঠিক নায়িকা নয়, উপনায়িকা বলা ঠিক। নাম করি এবার?"

সম্মতি না পেলেও দুটো নামই করলে মৃন্ময়, সিনেমাটার আর নায়িকার। সরমা যেন হাঁটুর জোর হারিয়ে পা মুড়ে ব'সে পড়ল, মুখের পানে চিত্রার্পিতের মতো চেয়ে আছে; দুবার ঢোঁক গিললে, জিভে ঠোঁট দুটো ভেজাল, তবুও কিন্তু মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। মৃন্ময় খুব অল্প হেসে বললে—"আজ আট দশ মাস ধরে যে প্রমাণ সংগ্রহ করছে তার কাছে এসব চলবে না। কেন মিছি মিছি সময় বাড়াচ্ছেন অরুণা দেবী?"

সরমা চেয়ারের হাতল দুটো চেপে উঠে পড়ল, বললে—"হ্যাঁ, সময়ের কথাটাও একবার ভাবুন, প্রায় দুপুর রাত…আমায় ছেড়ে দিন…আপনার কি হয়েছে যেন—স্থির হয়ে ভেবে দেখুন একলা ব'সে, কী অন্যায় কথা সব বলছিলেন।"

মৃন্ময় দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

মরিয়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল সরমা।

"একি ! আপনি দোর আটকাচ্ছেন ? চেঁচাব আমি !

"শোফারের সঙ্গে আরদালিকেও পাঠিয়ে দিয়েছি ; রয়েছি শুধু আমরা দুজন। অবশ্য তেমন চেঁচিয়ে যদি লোক জড়ো করেন তো আমি বিপন্ন হব ; কিন্তু···কিন্তু ব্যাপারটা সামলাবার যদি কোনও উপায় থাকে তো তাও নষ্ট হয়ে যাবে আপনার··· ভেবে দেখুন।"

সরমা শান্ত হয়ে বসল, বললে—"আমি একজন সিনেমা আর্টিষ্ট ?—কী প্রমাণ আপনার ?"

"দলিল-দস্তাবেজ কিছু নেই—শুধু ভুল ঠিকানা দেন, ফটো-তোলাতে চান না—ছোটখাটো এই রকম সব। তবে একটা প্রশ্ন আমিও করি—ঐ সিনেমাটা এখানে আনাবার ব্যবস্থা করতে পারি, বন্দোবস্ত আমার সবই ঠিক ; আপনি সবার সঙ্গে ব'সে দেখবেন ?"

আতঙ্কে আবার সেই গোড়ার মতোই কাঠ হয়ে বসে রইল সরমা। নিরুপায় হয়ে আসছে, দৃষ্টিতে যে একটা করুণ মিনতির ভাবও ফুটে উঠেছে, রাগের ভাব কি মরিয়া হয়ে ওঠার ভাঁব এনে ফেলে সেটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পেরে উঠছে না। শেষে মিনতির ভাবেই বললে—"আপনি দয়া করে একটা কথা ভাবুন, আমার স্বামী এসে পড়তে পারেন যে-কোন মুহূর্তে···"

"সম্ভাবনা খুব কম ; রতনডিহি যেতে একটা বড় জোড় আছে, তাতে দুপুর বেলার বর্ষার জলটা নামাতেই আপনার স্বামী নিশ্চয় ওদিকে আটকে গেছেন। রাত্তিরে আসবেন না ; যদি আসেনই, বাঁধের কাছ থেকেই শোফারকে হর্ণ দিতে বলে দিয়েছি আপনি চলে যেতে যথেষ্ট সময় পাবেন।"

"এও দেখুন, আপনি কী এক কাণ্ড করেছেন ! আমি মোটরে যাই নি, অথচ এতক্ষণ এখানে ছিলাম—রুম্মা কী ভাববে—তার ছেলেও রয়েছে !"

একটা কথা মুখে এসেছিল মৃন্ময়ের, কিন্তু উচ্চারণ করলে না, বললে—"সেদিক

দিয়েও মোটরটা ফিরে এলেই আপনার যাওয়া ভালো।...কিন্তু কথা অযথাই বেড়ে যাচ্ছে ; আপনি সত্যিটা স্বীকার করে নিন সরমা দেবী।"

সরমা যেন একটা অবলম্বন পেয়ে চকিতে মুখ তুললে, বললে—"আপনি ঐ নামেই ডাকুন, ঐ দেখুন, সত্যিটা আপনিই বেরিয়ে এসেছে।"

মৃন্ময় একটু স্পষ্ট করেই হাসলে, বললে—"ঐ কথাই থাক, আমি সরমা বলেই ডাকব, অর্থাৎ তোমার ঐ গুপ্ত সত্যকে রক্ষা করবার ভার নিলাম আমি আজ থেকে..."

মৃন্ময় অতটা ভেবে বলে নি, মাত্র একটু একটু করে নিজের উদ্দেশ্যের পানে এগুচ্ছিল, কিন্তু এইতেই কাজ হোল। সরমা একেবারে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল, চোখদুটো জ্বলছে, ঠোঁটদুটো একটু একটু কাঁপছে, আত্মবিস্মৃত হয়েই একটু চড়া গলাতে বললে—"তার মানে?—আর, 'আপনার' থেকে একেবারে 'তোমার'—আপনার উদ্দেশ্যটা কি? কী ভেবে আপনি এই চক্রান্ত রচনা করেছেন আজ রাত্রে? আমি যদি বলি, বেশ, আমি একজন সিনেমা-অভিনেত্রী—ছিলাম, তারপর এই পথে এসেছি, আমার স্বামী সব জানেন—তিনি আমার স্বামী-ই ধর্ম্মসাক্ষী করে..."

"বসুন, উত্তেজিত হয়ে ফল নেই—সুকুমারবাবু—আপনার স্বামী কিনা—ধর্মসাক্ষী করে, তা জানিনা ; তবে এটা খুব ভালো রকমেই জানি যে তিনি আপনার পূর্বজীবনের বিন্দু-বিসর্গও জানেন না—যার মানে হয়, আপনি তাঁকে প্রবঞ্চনা করেই বিবাহ করেছেন—যদি করেই থাকেন বিবাহ।"

আবার স্নায়বিক দুর্বলতার জন্যেই ব'সে পড়ল সরমা, মুখটা আবার বিবর্ণ হয়ে এসেছে, তবু কড়াচোখেই জিজ্ঞাসা করবার চেষ্টা করলে—"কে বলে একথা?"

সুকুমারকে তার জার্মানপ্রবাসের বানানো গল্পের কথাটা আর বললে না মৃন্ময়, যাতে অরুণার নামটা পর্যন্ত ক'রেও সুকুমারের মুখে কোন ভাবান্তর আনতে পারে নি। ওদিকেই না গিয়ে প্রশ্ন করলে—"বেশ, কাল সুকুমারবাবুর কাছেই সমস্ত কথাটা পাড়ব, অবশ্য মাত্র যখন আপনি থাকবেন, রাজি আছেন? কিম্বা তাতেও না রাজি হন, সুকুমারবাবু যখন একা?"

আবার দৃষ্টি শঙ্কিত হয়ে উঠল সবমাব, কিন্তু তথনই একটা ভালো যুক্তি মনে পড়ায় সামলে নিলে, বললে—"বাঃ, চমৎকার কথা আপনার! আপনি আমার স্বামীর কাছে আমার নামে একটা মিথ্যা গল্প রচনা করে বলবেন, আমি ব'সে ব'সে সেটা শুনব। মিথ্যা হোলেও তার একটা কুফল নেই বেটাছেলের মনে? আমার আড়ালে বললে তো আরও চমৎকার!"

"অরুণা দেবী ·"

"আপনি সরমাই বলুন।"

"বেশ, সরমাদেবী, আপনি কথাটা অর্ধেক মেনে নিয়েও আবাব পেছিয়ে যাচ্ছেন, অথচ ভেবে দেখুন তর্কের জোবে তো হয়-কে নয় ক'বে ফেলতে পারবেন না।··· বেশ, বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁকে সবচেয়ে বড় প্রমাণ সংগ্রহ করতে সাহায্য করার কথাও বলব ··"

"কী প্রমাণ সে?"

—আবাব নিজের ওপব সংযম হাবিয়ে সোজা হয়ে বসল সবমা।

"বলব—সিনেমার অরুণাদেবী কোথায় গেল তিনি ট্রেস করবার চেষ্টা করুন, আমি সাহায্য ববব তাঁকে।"

"অরুণা নেই?"

"শুধু একজন ছাড়া পৃথিবীর সবাই জানে—নেই।"

"কে সে একজন?"

"আপনার সামনেই বসে আছে।"

"আপনি জানেন অরুণার কি হোল?"

খেলতে খেলতে মাছ এলিযে এসেছে, মৃন্ময় একটা নিষ্ঠুব লুব্ধভাব হাসি হাসলে, মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি বেখে আস্তে আস্তে বললে—"একটা ঘটনা পর্যন্ত সব জানি—জোগাড় হয়েছে—তারপবে একটু ফাঁক প'ড়ে যাচ্ছে—অবশ্য সে ফাঁকটা ভরে নেওয়া যায়—তারপরে আবার এই লথমিনিয়ায়···"

"সে ঘটনাটা কি?"

এই সময়ে মোটর হর্ণের আওয়াজ হোল, বেশ জোরেই আসছে, সরমা একেবারে

পাগলের মতো হয়ে দাঁড়ালো, সমস্ত শরীরটা কাঁপছে, হাতদুটো জোড় করে বললে —"আমাকে বাঁচান্—বাঁচান আমাকে মৃন্ময়বাবু···বলুন, একজনের এরকম ক'রে সর্বনাশ করায় আপনার কী স্বার্থ?"

"বাঁচবার স্বার্থ "

স্থিরভাবে মুখের পানে চেয়ে আছে সরমা—অর্থটা বোঝবার চেষ্টা করছে যেন, কিন্তু পারছে না।···মোটরের আর একটা হর্ণ, হ্রদটা ছাড়িয়ে এই পাড়ার দিকে বেঁকল।

"আমায় আর পাঁচটা দিন সময় দিন মৃন্ময়বাবু—শুধু পাঁচটা দিন···"

বলতে বলতেই সরমা পাগলের মতো হন্তদন্ত হয়ে দরজার দিকে এগুল। মৃন্ময় তার একটা হাত ধরে ফেললে, বললে—"মস্ত বড় ভুল করেছেন, এ-অবস্থায়, এ-ভাবে কোনমতেই বাসার দিকে যাবেন না। ··আমাব প্ল্যান ঠিক আছে, আপনি পাশের ঘরে চলে যান। যদি ডাক্তাববাবু থাকেনই—আমি অন্তত আধঘণ্টা বসিয়ে রাথব গল্প করে, চায়ের ব্যবস্থা করে, আপনি সেই সুযোগে ঐদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবেন।

"রুম্মা···তার ছেলে ··?"

"তার ছেলে নিশ্চয় ঘুমিয়েছে—জানবে আপনি মোটবেই গেছেন—অত মাথা ঘামাবে না···"

"রুম্মা?·· "

"রুম্মার আমাদের দুজনের কথার মধ্যে একটু একটু থাকাই ভালো এবার থেকে···"

মোটর এসে থামল। একটা চাপা বুক ভাঙা—"উঃ!" শব্দ করে সরমা পাশের ঘরের মধ্যে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলে, শেষ কথা যা তার কানে এল তা— "পাঁচটা দিন।"

অতটা করতে হোল না, শোফার খালি গাড়িই ফিরিয়ে এনেছে। খবর দিলে— সে যা আন্দাজ করেছিল—জোড়ে প্রচণ্ড জল নেমেছে, ডাক্তারবাবু ওদিকেই

আটকে গেছেন। কাছের গ্রামে খোঁজ নিয়ে জেনে এসেছে—সন্ধ্যার আগে তাঁর মোটর ওপারে এসেছিল, জল দেখে ফিরে গেছে।

একা নয়, আরদালিকে সঙ্গে করে মৃন্ময় সরমাকে পৌছে দিয়ে এল—এখানে এতক্ষণ থাকবাব কথাটাও দিলে ঢাকা, ওদের দুজনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে—"মোটরের ডাক শুনে এমন জ্ঞানহারা হয়ে কখনও ছুটে আসতে আছে সরমা দেবী? একটা কিছু হয়ে যেতে কত দেরি? ডাক্তারবাবু নেই···"

রুম্মাকেও দুজনের মধ্যে টেনে আনলে না; গিয়ে নিজেই জানিয়ে দিলে সরমা সুদ্ধু মোটবে গিয়েছিল।

যেভাবে কাটছে, পাঁচটা দিন অপেক্ষা করতে গেলে পাগল হয়ে যাবে সরমা। তৃতীয দিন সন্ধ্যায় নিজেই একটু সুযোগ করে নিলে মিনিট চার পাঁচের আন্দাজে; বললে—"আমি ঠিক ক'রে যেলেছি মৃন্ময়বাবু, ছেড়ে দিচ্ছি আমার এই জীবন, কিন্তু একটা সর্তে।"

"বলুন কী সর্ত।"

"বিবাহ করবেন·· আমায়।"

বোধ হয় চেষ্টা সত্ত্বেও মৃন্ময়ের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল। বললে—"বিবাহ!"

"তবে?"—এবার ব্যঙ্গে সরমার ঠোঁটটা বেশ ভালোভাবেই উঠল কুঁচকে!

"তবে আর কি?···"

তারপর স্পষ্ট ব্যঙ্গেই উত্তরটা দিয়ে বললে—"সিনেমা আর্টিষ্টের বিবাহ—এবেলা-ওবেলার মেয়াদে!···আমি বোধ হয় হব তৃতীয়?"

"না, প্রথম ওঁব সঙ্গে আমার বিবাহ হয়নি···এখনও। তার আগেও কারুর সঙ্গে নয়।"

মৃন্ময় একটু তির্যক দৃষ্টিতে চাইলে, বললে—"বেশ তো, যেমন ওঁর সঙ্গেই আছেন, সেইভাবেই থাকুন না···আমার সঙ্গেও।"

সরমার সমস্ত শরীরটা যেন অগ্নিশিখার মতো কেঁপে কেঁপে উঠছে, চেষ্টা করেও

নিঃশ্বাসটাকে সংযত করতে পারছে না, বললে—"সেরকম থাকতে ডাক্তারবাবুর মতো দেবতাই পারে মৃন্ময়বাবু, আপনার মতো শয়তানে পারে না।···আপনি দেখুন ভেবে, ঐ সর্ত আমার···"

"না রাজি হ'লে?"

"একটা সিনেমা-অভিনেত্রী—আবার সেই জীবনে যাবে ফিরে—এত বুদ্ধি থাকতেও আপনার এটুকু হুঁস হোল না?···না হয় মরবে; মরার স্বাদ একবার সে তো পেয়েছে, আপনি জানেনই।"

মৃন্ময় বুঝতে পারছে পরাজয়টা, মুখের পানে খানিকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, সেইখানে দৃষ্টি রেখেই যেন তাকে আপাদ-মস্তক দেখে নিচ্ছে, এতদিনে নানা-ভাবে দেখা সরমারও একটা হিসাব নিচ্ছে মনে মনে; তারপর বললে—"বেশ, এবার আমিই চাইছি পাঁচটা দিন।"

"দুটো দিন পাবেন, তার এক দণ্ডও বেশি নয়। পরশু এই সময়—কথা কইবার সুযোগ হয় ভালো, না হয় একটুকরো কাগজে লিখে আনবেন।"

তাও দিলে না সরমা।

তারপরদিন ঠিক ঐ সময়টিতে তাকে খুঁজলে পাওয়া যেত নদীর ধারে তাদের নির্জন জায়গাটিতে; সে আছে আর সুকুমার। আকাশে একটা ম্লান জ্যোৎস্না, ঝিলের জল নিচে নেমে গেছে, দূরে বুলানী নদীর চর উঠছে জেগে, ওপার থেকে কাপড়ের কলের একটা ক্লান্ত শব্দ আসছে ভেসে। ঝিল, নদী, জ্যোৎস্না, অস্পষ্ট শ্বাস—সবসুদ্ধ রাত্রিটি যেন মৃত্যুশয্যায়···

সরমা সুকুমারকে নিজের জীবনকাহিনী বলে যাচ্ছে।

মোটরটা আছে বাগানের বাইরে দাঁড়িয়ে, ঘুরিয়ে উল্টা দিকেই মুখ ক'রে রাখিয়েছে সরমা।

এইমাত্র দুজনে খুব খানিকটা ঘুরে ফিরে এল, শেষবারের মতো; তার পরেই আরম্ভ করেছে কাহিনীটা। শেষ ক'রে আর এ-বাসায় ফিরে যাবার দাবি থাকবে না তার।

পঁচিশ

যা প্রয়োজন মনে হোল না, এখানে-ওখানে অনেক কিছু বাদ দিলে সরমা, যদিও গোপনীয় বলেই কোন কথা গোপন করলে না। সমস্ত কাহিনীটা এই—

ওর ডায়েরি থেকেই উদ্ধৃত করে আরম্ভ করা যাক। তারিখটা প্রায় তিন বৎসর পূর্বের ; লেখা আছে—"আজ প্রায় কবি বায়রণের মতো আমিও বলতে পারে—I woke in the morning and found myself famous.

ছুটি হয়ে যাচ্ছে পূজাব জন্য, প্রীতি-সম্মেলন উপলক্ষে ছাত্রীদের একটা নাটক ছিল। সরমারও ছিল একটা পার্ট। বিশেষ বড় নয়, সে অল্প দিনই হোল এ-কলেজ এসে ভর্তি হয়েছে, না আছে সংশ্রয়, না আছে প্রতিপত্তি। তবে পার্টটা বড় না হোলেও গোটাকতক সুবিধা ছিল—অ্যাকৃটিং ছাডা একটা সঙ্গা গান, একটা গান নাচের সঙ্গে, খানিকটা যেমন কান্না তেমনি খানিকটা হাস্য-চপলতাও ; অর্থাৎ এমন একটা পার্ট যাতে সব দিক দিয়ে কৃতিত্ব দেখাবার অবসর আছে। তা ভিন্ন তিনবার পোষাক পরিবর্তন করতে হোল—যাতে করে নিজের অঙ্গশ্রীকে তিন রকমে দেখাবার সুযোগ পেলে সরমা। সমস্ত প্লে'টা ঝলমলিয়ে দিলে ;. নায়িকার পার্টে অমন যে অনুরাধা, কলেজের সেরা মেয়ে, নাচেও অমন যে সুবালা—কোথায় রইল পড়ে। তিনখানা মেডেল পেয়েছে, প্রশংসা অভিনন্দনে কাল থেকে তো অস্থির ক'রে দিয়েছে। আজ সকালে প্রিন্সিপাল মিসেস সেন এসেছিলেন, সঙ্গে তাঁর ভাই মিস্টার সরোজ সেন, ব্যারিস্টার। সরোজের প্রশংসা ছিল কতকটা নীরবই, সেই জন্যই বেশি মুখর। তুমি ইনস্পায়ার্ড পার্ট করেছ সরমা।··কেন বলছি জান সরোজ?—বেচারি মফঃসল কলেজ থেকে সদ্য এসেছে—লতিকা—আমাদের হিষ্ট্রির প্রফেসার, যে নাটকটা ডিরেক্ট করলে—লতিকা বলছিল—"She

surprised me; ওর জিভের আড ভাঙেনি বলে, কাল পর্য্যন্ত ওকে 'বৌমা' 'বৌমা' বলে ক্ষেপিয়েছে মেয়েরা।"

দুলে দুলে হাসির মধ্যে তরুণ ব্যারিস্টার সরোজের আড চোখে ফিরে ফিরে দেখাটুকু মনে লেগে আছে সরমার।

কলেজে, হোস্টেলে এক রকম কেউ জানতো না বললেই চলে, তারপর এক রাত্রেই প্রিন্সিপালের প্রিয়পাত্রী। উনি চলে যেতে মেয়েরা এসে ভিড় জমালে—দুটো বিছানায় ধরে না। অনুরাধাও বাড়ালে খানিকটা—অবশ্য নিজেকে না কমিয়ে—"এবার দরকার পড়লে ছাড়ান্ পাবার একটা উপায় হোল; মরুক-বাঁচুক অনুরাধাকেই মেন পার্ট নিতে হবে! বাবাঃ, বাবা।"

কলেজে তিনটি পিরিয়াড ছিল, প্রশংসার জবাব দেওয়াব অত ভাষা পায় কোথায়? তারপর যারা সাহস পেলে না—হয়তো তার হঠাৎ গুরুত্বের জন্যই—তাদের স-সম্ভ্রম দৃষ্টি—সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে, বারান্দায় চলতে, ক্লাসে ঢুকতে। একটা বিপদেই দাঁড়িয়েছিল, ভাগ্যিস কলেজটা কালই বন্ধ হচ্ছে!

এসে বাবাকে একটা চিঠি লিখলে; কী খুশী যে হবেন! লোক রেখে মেয়েকে নাচ গান শিখিয়েছেন! রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পব হোস্টেল যখন নিষুতি, ও ব'সে ব'সে ডায়েরি লিখছে। ডায়েরির শেষ কথা ওর নাটকের ভাষাতেই লেখা—"এই ক'রে একটি উজ্জ্বল আশাদীপ্ত দৃশ্যকে আবরণ করে আমার কলকাতা-জীবনের প্রথম অঙ্কের যবনিকাপাত হোল।

ছুটি শেষ হোতে যখন ফিরে এল তখন ব্যাপারটা অনেকখানি পুরনো হয়ে এসেছে, হঠাৎ—যশের সে বিপর্যস্ত ভাবটা আর নেই সরমার। মফঃস্বলের সেই জড়তাটাও নেই—যার জন্য বিদ্রূপের কানাঘুষা চলত, চাপা হাসি ছলকে উঠত। খ্যাতিসম্ভ্রম খানিকটা আত্মপ্রত্যয় এনে দিয়েছে, সে বেশ সহজভাবে সপ্রতিভ-ভঙ্গিতে কলেজ-জীবনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। তারপর এগিয়েও চলল।

থার্ড ইয়ারের ছাত্রী, তার ওপর ভালো ছাত্রী, ওদিককার প্রতিভার সঙ্গে এদিককার প্রতিভা মিলে ওকে বেশ খানিকটা বিশিষ্টতা দিলে। ছাত্রীমহলের যে নেত্রীত্ব সেটা স্বভাবতই থাকে চতুর্থ বার্ষিকের কোন কোন মেয়ের হাতে; কিন্তু পূজার ছুটির পর ওরা ঢিলে দিয়ে দেয়। সামনে পরীক্ষা, সেই চিন্তায় ওদের আর পাঁচটা কাজে উৎসাহ আসে কমই। অল্প দিনেই সরমা সেই নেতৃত্বেরও খানিকটা গেল পেয়ে। ওর মতামতে একটা জোর এল, মেয়েদের প্রগতি নিয়ে আলোচনায় ওর মতটা যেতে লাগল সব চেয়ে এগিয়ে; বেশ খানিকটা চাঞ্চল্যের কেন্দ্র হয়ে উঠল সরমা।

ইতিমধ্যে আরও দুবার নাচ হয়ে গেল ওর। একবার হোস্টেলেরই ছোট একটা অনুষ্ঠানে, আর একবার প্রিন্সিপালের বাড়িতে একটা বিবাহ-উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে। ত্রৈমাসিক কলেজ-ম্যাগাজিনটা বেরুল, ওর উর্বশীনৃত্যের ফটো-ব্লক্ সমেত, একটা পরিচিতি তার মধ্যে।

এর পর এমনও হতে লাগল যে হোস্টেলের বাইরে চলাফেরা করাতেও ওর নজরে পড়ল—কেউ-হয়তো স-প্রশংস কৌতূহল দৃষ্টিতে ওর পানে চেয়ে আছে—ঠিক সেই ধরনের দেখা নয়, যাতে অভ্যস্ত; এ যেন "এই—সে!" এই রকম একটা ভাব, অর্থাৎ নাচে বা অভিনয়ে দেখেছে সরমাকে, হয় তাদের থিয়েটারেই, না হয় প্রিন্সিপালের বাড়িতে—অনেকেই তো নিমন্ত্রিত হয়েছিল, না নিমন্ত্রিত হয়েও তো অনেকে পড়ে ঢুকে এ-সবের আভাস পেলে।

এর মধ্যে একটি লোককে সরমা বার তিনেক দেখলে, কতকটা দূরে দূরেই; দু'দিন রাস্তা চলতে চলতে, একদিন একটা পার্কের মধ্যে আর একটি মেয়ের সঙ্গে বেড়াচ্ছিল সরমা। বেশ সবল; সুপুরুষ বলতে হয়, বেশভূষায় বেশ একটি সংযত ভদ্র ভাব; বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বলে মনে হয়।

সরমা সঙ্গিনীকে বললে—"এই নিয়ে বার-তিনেক দেখলাম লোকটাকে, লক্ষ্য করেছি যেন দেখে আমায়।"

সঙ্গিনী একবার চকিতে দৃষ্টিটা ওদিক থেকে ঘুরিয়ে এনে, ঠোঁটে একটা হাসি

চেপে উত্তর করলে—"আহা দেখুক, মোটেই তিনবার তো—আমি বেটাছেলে হ'লে খুঁজে খুঁজে এবেলা-ওবেলা দেখতাম তোমায়।"

আর একবার আড়ে দেখে নিয়ে বললে—"না, সে-ধরনের নয়; কোনও প্রফেসার-ট্রফেসার হবে, দেখে থাকবে তোমার পারফরমেন্স্ কোনওখানে।"

কয়েকদিন পরের কথা। ধর্মতলার একটা বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্সে সরমা কয়েকটা প্রসাধন দ্রব্য কিনছিল, একলাই; একটি বছর নয়েকের মেয়ে এসে পাশে দাঁড়িয়ে বললে—"শুনুন, আমার মা আপনাকে ডাকছেন, আসবেন একটু?"

দিব্যি ফুটফুটে মেয়েটি, দিব্যি করে সাজানো; সরমা প্রশ্ন করলে—"কোথায় তিনি?"

"ঐ যে মোটরে বসে আছেন; বাবাও আছেন।"

করিডোর দিয়ে বাইরে মোটরটা দেখা যায়, একটি ভদ্রমহিলা কৌতূহল দৃষ্টিতে এদিকে চেয়ে পেছনকার সীটে বসে আছে, তার পাশেই একজন পুরুষ, মুখটা ঘোঁজের মধ্যে একটু অন্ধকারে পড়ে গেছে। সরমা সেলস্‌ম্যান্‌কে বললে—"একটু থাক্, আসছি আমি।"

বেরুতেই বুঝতে পারলে পুরুষটি সেই ভদ্রলোক, বার তিনেক যাকে দেখেছে এর আগে। সেই একটু ঝুঁকে সামনে এসে নমস্কার করে বললে—"মাফ করবেন, এঁর আগ্রহ আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করবেন।"

একটু কি রকম হয়েই গেছে সরমা, তবু অল্প হাসি টেনেই মহিলাটির পানে চাইলে। সে এবার ঘুরে কপট রাগে পুরুষটিরই দিকে চেয়ে বললে—"আহা, আর ওঁর নয় যেন!" তারপর সরমার পানে চেয়ে বললে—"কলেজের থিয়েটারে আমরা দু'জনেই আপনার 'রুণার' পার্ট দেখেছিলাম, চোখে যেন লেগে আছে, প্রায়ই আলোচনা হয় আমাদের···ওঁকে কতবার বলেছি, চলো আলাপ ক'রে আসি হোস্টেলে গিয়েই, দোষ কি?···যা মানুষ, উনি আবার যাবেন!·· আজ শপিং করে মোটরে উঠেছি, দেখি দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপনি।"

ভদ্রলোক হেসে বললে—"ব্যস্, আর কি ! ধ'রে নিয়ে আয়, চর ছুটল!··· উনি যে কী মনে করবেন···"

সরমা লজ্জিতভাবে একটু হেসে বললে—"এতে মনে করবার কি আছে ?"

"কিন্তু আপনি শিখলেন কি করে ? · সেইদিনই শুনলাম, কোন্ এক মফঃস্বল কলেজ থেকে এসেছেন ··"

কথাটা বলে মহিলাটি হঠাৎই বিস্মিত হয়ে হাতের চেটোয় নিজের মুখটা ধরে সরমার মুখের পানে চেয়ে রইল। ভদ্রলোক বললে—"সে-প্রশ্নের উনি তোমায় এক কথায় এখন জবাব দেন কি করে ?"

সরমা সেই রকম লজ্জিতভাবে ঈষৎ হেসে বললে—"শিখেছিই বা কী এমন ?"

"তা তো বলবেনই · চোখে এখনও লেগে আছে। না, এ-ভাবে হয় না: কেনা-কাটা আপনার হয়ে গেছে ? তাহলে আসতেন, হোস্টেলের সামনে নামিয়ে দিয়ে যেতাম আপনাকে, ততক্ষণ গল্প করতে করতে যাওয়া যেত। আপত্তি আছে ?"

"আপত্তি কিসের ? ··প্রায় হয়েই গেছে কেনা, দামটা চুকিয়ে দিয়ে আসি। একটু অপেক্ষা করতে হবে আপনাদের, এই যা।"

"আসুন তাঁহলে, আমাদের তাড়া নেই।"

মোটরে যেটুকু কাটল—মিনিট পনের-ষোল—তাইতেই আলাপ বেশ জমে উঠল। শুধু যে চমৎকার লোক দু-জনে তাই নয়, কথাবার্তার মধ্যে এমন একটি মুক্ত আপন-করে নেওয়ার ভাব যে আপনা থেকেই যেন আকৃষ্ট হয়ে পড়তে হয়; তার মাধুর্যটা বাড়িয়ে তুলছে কথায় কথায় স্বামী-স্ত্রীতে কথাকাকাটির অভিনয়ে— একটু এদিক-ওদিক হ'লে এ ওর ছল ধরছে, মাঝে মাঝে সরমাকে সাক্ষী রেখেই। বার দু'তিন দু' পক্ষেই মত দিতে দিতেই সরমার নূতন পরিচয়ের জড়তাটা একেবারে কেটে গেল।

হোস্টেলটা সদর রাস্তা থেকে একটু ভেতরের দিকে; সামনে আসতেই সরমা

বললে—"এবার থামতে বলুন।·· শোফার, এইখানটা দাঁড় করাও, গলির সামনে।"

"এসে গেল এর মধ্যে ?"—হঠাৎ নিরাশ হয়ে কথাটা বলে উঠল মহিলাটি। ভদ্রলোক বললে—"তোমার আশা না মিটে থাকে, ওঁকে নিয়েই চলো না, আবার পৌছে দেবে মোটরে।"

মহিলাটি সরমার পানে চেয়ে বললে— 'কি বলছেন ?"

"আজ থাক।"—বলে সরমা একটু হেসে বললে—"আপনারাই না হয় নামুন না।"

পুরুষটি বললে—"হোস্টেলের নিয়ম-কানুনের বেড়া টপকে প্রবেশ করা "

মহিলাটি বললে—"অত নিয়ম-কানুন আজকাল চলে না, আমিও হোস্টেলে ছিলাম, নাও।···আর সে নিয়মকানুন যদি একা তোমার সঙ্গে ঢুকতেন···"

কথাটা সত্যই, তবুও তার মধ্যে কোথায় যে একটু লজ্জার কি ছিল সেটা কাটাবার জন্যই সরমা বললে—"ওঃ! অত ক'রে বাঁচা চলে না। কারুর আত্মীয়-স্বজন থাকতে নেই? দেখা হবে না? আসবে না? ··আসুন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আজই আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে রাখি, বরাবরের জন্যে গোল মিটে থাকবে।"

কথাটার গুরুত্ব না বুঝেই একটা ফাঁকা বেপরোয়াভাবের ঘোরে বলে ফেল্‌লে সরমা। কিন্তু ওরা দুজনেই হঠাৎ চুপ ক'রে গেল, তারপর মহিলাটি বললে—"থাক আজ, সে একদিন হবে।···এর মধ্যে একদিন আপনিই আসুন—গল্পসল্প করা বাড়িতেই সুবিধে। এখানে বোর্ডার বেচারারা বাড়ি ছেড়ে থাকে, কারুর আত্মীয় এলে কি রকম ভেঙে পড়ে জানি তো।·· ঠিকানা দেওয়াই আছে।·· কৈ, নামটাম জিগ্যেস করলেন না তো···আপনার নাম জানিই, আমার নাম স্বর্ণময়ী।"

নিশ্চয় আত্মীয়তার পরিচয় পাকা করবার জন্যই জানিয়ে দেওয়া নামটা, সরমা বললে—"আমি সোনাদি বলে ডাকব এবার থেকে। আপনিও 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' ধরুন।"

ভদ্রলোক বললে—"আমার নামটাও বলে দাও, অমন দামী নয় বলে মুখে আনবে না?"

মহিলাটি রাগের ভান করে সরমাকে সাক্ষী মানলে—"দেখলেন কথার ছিরি? ·· তুই তোর বাবার নামটা বলে দে ধীরা।"

মেয়েটি মিঠে মিঠে হাসির সঙ্গে কৌতুকটা উপভোগ করছিল, বললে—"বাবার নাম শ্রীমৃগাঙ্ক দত্তরায়।"

"তাহলে এই নাম, আটাশ নম্বর রঞ্জন পার্ক, বেশ, যাব একদিন।"

এতক্ষণ যেন একটা ঘোরেব মধ্যে দিয়ে কাটল—নূতন পরিচয়, তাও আবার ডেকে পবিচয়, আর সবটুকুব মূলেই তাব অভিনয়েব যশ, ভাববার অবসরই পায় নি সবমা। হোস্টেলে এসে পেলে।

ঠিক হ'ল কি? দোষ না থাকতে পারে, সঙ্গে স্ত্রী রয়েছে, তবু ডাকা মাত্রই পা বাড়িয়ে দেওয়া, জানা নেই, শোনা নেই, তাব ওপব সরমাই এগিয়ে বললে সুপারিন্টেণ্ডেন্টেব কাছে আত্মীয়বলে পবিচয় করিয়ে দেবে।···যদি ভালো লোকই হয় তো ওরাই বা কী মনে করলে—মেয়েটা কী গো?—একেবারে হেদিয়ে পড়ে!

ভালো লোকই নিশ্চয়, না হবার কী আছে? · তবু, এর আগে সেই বাব তিনেক দেখা হওয়া—আকস্মিক হওয়াই সম্ভব, তবুও সবমা ওব স্ত্রীর সামনে একবার উল্লেখ করলেই পাবত কথায় কথায়—মনেব ভাবটা বোঝা যেত।

মনকে যুক্তি দেখিয়ে দেখিয়ে এইটেই দাঁড করালে সবমা, না, এমন কিছু ভুল করে নি।

শেষ পযন্ত কিন্তু ঠিক ক'রে ফেললে—সে যাবে না দেখা কবতে। থাক, কী দরকাব পড়ে গেছে এমন?

কয়েকদিন বেরুলই না হোস্টেল থেকে একরকম। তারপর একটা কথা মনে পডতে সঙ্কল্পটা ত্যাগ করতে হ'ল, ওরা নিজেই যদি এসে পড়ে মোটর নিয়ে? হয়তো মেলা ভাববার জন্যই সে সম্ভাবনায় বেশ স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে না। তার চেয়ে একদিন গিয়ে কাটিয়ে দিয়ে আসা যাক, বলবে হোস্টেলের নিয়ম হঠাৎ বড্ড কড়া

হয়ে গেছে, জন-তিনেক একসঙ্গে না হয়ে বেরুনো বারণ, বাইরের কেউ আসতে হ'লেও অভিভাবকের পরিচয়পত্র চাই তার।

এইসব ব'লে চোখমুখ রাঙিয়ে, এই প্রগতির যুগে এই রকম কড়াকড়ি আর হীন সন্দেহের জন্য কর্তৃপক্ষকে নিয়ে গোটাকতক গরম গরম বুলি ঝেড়ে দিলেই হবে; তার ভাষা বেশ রপ্ত করাই আছে ওর।

শেষ পর্যন্ত শুধু এইটুকু হ'ল—অর্থাৎ একবার যাওয়া; নিয়মের কড়াকড়ি, অভিভাবকের পরিচয়পত্র—ওসব একেবারেই বাদ পড়ে গেল।

প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রথমটা দেখেই হকচকিয়ে গেল। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে—নিজেই নিজের সমালোচনা—'কটা দিনেই বড্ড প্রগতিশীল হয়ে গেছ তুমি সরমা; ঠিক হচ্ছে কি ?'···এই আত্মপ্রশ্নের দুর্বলতার জন্যই সরমা গটগট ক'রে এগিয়ে গেল। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে আসছিলেন, তাঁকে জিগ্যেস করলে —"মৃগাঙ্কবাবুর বাড়ি এইটে তো ?"

উত্তর হ'ল—"এ তো এক জনের বাড়ি নয়, ফ্ল্যাটসিস্টেম।"

"তাহ'লে তাঁরটা ?···এই ঠিকানাই দিয়েছেন।"

"ঠিক আছে। ঢুকেই সামনের বোর্ডটা দেখতে পাবে, নাম, নম্বর সব পাবে তাতে। তারপর ডিরেকশন ধ'রে·· না হয় আসব সঙ্গে ?·· কে হন মৃগাঙ্কবাবু তোমার ?"—দৃষ্টিতে একটু যেন কৌতূহল।

সরমা বললে—"না, থ্যাঙ্কস্, পারব খুঁজে নিতে। মৃগাঙ্কবাবু আমার ভগ্নীপতি হন।

ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠেছে, তাড়াতাড়ি পা বাড়িয়ে দিলে।···যেন মনে হচ্ছে ভদ্রলোক দাঁড়িয়েই আছেন···দেখছেন নাকি ?

নম্বর পেতে বেশি কষ্ট হ'ল না। দরজা বন্ধ, ভেতরে একটা গান হচ্ছে; সরমা দুতিনবার ধাক্কা দিলে, ডাকলে—"সোনাদি !"

গানটা থেমে গেল। কে একজন এগিয়ে আসছে, দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে—"কে ?"

"আমি।"

"নামটা বলতে হবে।" কেমন যেন সন্দিগ্ধ কণ্ঠ, হুকুমের টোন।

"আমি সরমা···হোস্টেলের।"

"ও! সরমা? এসো, এসো।"—দোর খুলতে খুলতে সোনাদি অভ্যর্থনা করলে। "আমরা ভাবলাম বুঝি ভুলেই গেলে।"

একটা টেবিল-হারমোনিয়ামের সামনে একটি প্রায় কুড়ি-বাইশ বৎসরের মেয়ে বসেছিল, গাইছিল নিশ্চয় সেই-ই; ঘুরে বসল।

সোনাদি বললে—"এর কথাই তোমায় বলেছি মলী—সরমা।···আর এ হচ্ছে মলয়া, আমার এক বন্ধুর মেয়ে।"

দুজনে নমস্কার বিনিময় হ'ল। সরমা নমস্কার করবার পরও একটু চেয়ে রইল মেয়েটির দিকে। খুব সুন্দরী, কিন্তু শুধু সেই জন্যই নয়, কোথায় যেন দেখেছে বলে মনে হ'ল! একটা কৌচে ব'সতে ব'সতে বললে—"বেশ গাইছিলেন, শেষ করুন না।"

চিন্তিতভাবে রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে, তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘরটা খুঁজে বের করতে ঠিক মেহনৎ না হোক, খুব একটা চাপ গেছে মনের ওপর দিয়ে; ঘরের মধ্যে এসে যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল সরমা; ফ্ল্যাটের বাসা বলে দোরটা যে আবার দিয়ে দেওয়া হয়েছে তার জন্য যেন আরও।···বেশ বড় সুসজ্জিত ঘরটি; ভাসে, ফুলদানিতে ফুলের একটু আধিক্যই, এমনই মনে একটা পুলক সঞ্চার করে।

সেই কথা বললে—"বাঁচলাম সোনাদি, এইটুকু আসতেই যেন···"

সোনাদি কথাটা কেড়ে নিয়েই হেসে বললে—"যেন কি?···হাঁপিয়ে ওঠা তো?··"

পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে মৃগাঙ্ক এল, সোনাদি তার দিকেই চেয়ে হেসে বললে —"যা হাজার হাজার বছর ধ'রে পায়ে বেড়ি দিয়ে রেখেছেন বাবুরা!"

মৃগাঙ্ক বললে—"এই যে সরমা এসেছে, তোমার দিদি হেদিয়ে পড়েছিল।"

স্ত্রীর পানে চেয়ে বললে—"বেড়ির কথা কি হচ্ছিল?—বেড়ি তো আমাদেরই পায়ে···"

"ওঃ! আমরা?—তা ফেলো না খুলে, কে বারণ করছে?"

"তাই তো বিধান—পথি নারী বিবর্জিতা। ঘরে বেড়ি যখন হাতা-খুন্তির সঙ্গে, তখন কে এমন মূর্খ যে..."

তিন জনেই হেসে উঠল। তারই মধ্যে মলয়া আর সরমাকে সাক্ষী রেখে সোনাদি বললে—"শুনে রেখো তোমরা—বাবুদের হাঁড়ি ঠেল তো বহুত আচ্ছা, কিন্তু যদি,..."

"কিন্তু যদি'...তা তোমরা যে মনে করবে শ্যাম-কুল দুই-ই...থাক্, মলয়া রয়েছে, নয়তো দিতাম উত্তর।...তারপর সরমা, তুমি সত্যিই বড্ড দেরি করেছ, তোমার দিদি সত্যিই বড্ড হেদিয়ে পড়েছিল।"

সোনাদি বললে—"পড়েছিলাম; যে দিদিই হ'ল, সে তো আর তোমাদের মতো হৃদয়হীন হ'তে পারে না।"

"ভগ্নীপতির হেদিয়ে পড়াটাও তো ভালো নয়।...সরমা তুমি রাগ করতে পারবে না; খুঁচিয়ে বলাচ্ছে তোমার দিদিই।...না, ও-মানুষকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়; মলয়া তুমি গানটা শেষ করো। সরমাকে ঐ দিয়েই অভ্যর্থনা করা—সবচেয়ে ভালো হ'বে।"

সোনাদি বললে—"হ্যাঁ ফাঁকা আওয়াজের মতন আর অভ্যর্থনা করবার এমন নি-খরচার জিনিস কিছু আছে? ..তুমি দয়া ক'রে ঠাকুরটাকে একটু চায়ের জল চড়িয়ে দিতে বলবে? ছোঁড়া চাকরটা গেল কোথায়?"

হাসি সেই যে গোড়াতেই আরম্ভ হয়েছে, থামতে পারছে না।

"ওটুকু ব'লে আসতে যে কোন চাকরেই পারবে।"—ব'লে সেই হাসিতেই আর একটা ঢেউ তুলে মৃগাঙ্ক ভেতরের দিকে চলে গেল।

সোনাদি বললে—"আর বোল' না, অষ্টপ্রহর এই চলছে; একটি কথা বের করবার জো নেই মুখ দিয়ে, জিগ্যেস করো না মলীকে...তুই গানটা শেষ কর মলী ...তারপর তোমার একটা হবে সরমা।...কী অপূর্ব যে গলা, দেখবি মলী!"

সরমা হেসে বললে—"নিজের কানে শুনেই উনি বিচার করতেন অপূর্ব কি, কি,

সোনাদি ; এখন অন্তত আপনার মান রাখবার জন্যেও আর 'না' বলতে পারবেন না উনি।"

মলয়া বললে—"সে নিশ্চিন্দি থাকুন ; আমারটাকে 'অপূর্ব' না বললে আমিও বলবই না।"

রূপের সঙ্গে মিলিয়ে সত্যই গানটা তত উঁচুদরের নয়। গলা আছে, কিন্তু কাজ তেমন নেই ; তবে একেবারে এমন নয় যে প্রশংসা করতে বেগ পেতে হয়। ওর গান হয়ে গেলে সরমা গাইলে, একেবারে নিস্তব্ধতার মধ্যে। শেষ হয়েছে, দোরে খটখট করে কয়েকটা ঘা পড়ল।

মলয়া উঠে গেল।

"কে ?"

"খগেন, ছানু।"

দোর খোলার পর ছ'জনে প্রবেশ করে প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠল—"কে গাইছিল।"

সরমা ইতিমধ্যে সরে গিয়ে নিজের কৌচে বসেছে ; তার দিকে নজর পড়তে ছজনে কয়েক সেকেণ্ড চেয়েই রইল ; খগেন নমস্কারটা সেরে নিয়ে সোনাদির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে—"ইনি নিশ্চয় ?"

"হ্যাঁ, সেই সরমা, বলেছি এর কথা তোমাদের।...কিন্তু তোমরা শুনতে পেলে কৈ ? আসার সঙ্গে সঙ্গেই তো থেমে গেল।...আর একটি গাইবে না সরমা ?"

সরমা একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছে ; একেবারে নূতন ছজনে, তায় যুবা, সুপুরুষ। খগেন সাহায্য করলে—"একেবারে শুনিনি বললে মিথ্যে কথা বলা হবে সোনাদি—মিনিট দশেক এসে দোরের পেছনে দাঁড়িয়েছিলাম। তবে উনি যদি গান আর একটা দয়া ক'রে তো..."

সোনাদি সরমার জড়তাটুকু লক্ষ্য করে বললে—"তা' হ'লে থাক্, হবে'খন। ...তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই সরমা। এ হচ্ছে খগেন, আর একে ছানু বলি আমরা। ছজনেই ইউনিভারসিটির পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের ছাত্র, একজন ফিলজফি,

একজন ইকনমিক্স।...আর সরমার কথা বলেছিই তোমাদের, ওর গানও চুরি ক'রে শুনলে।"

মৃগাঙ্ক বললে—"হ্যাঁ, সেই হয়েছে বিপদ; এখন সামনাসামনি না গেয়ে শোনানো পর্যন্ত মনে হবে সে অপরাধ মার্জনা করেন নি সরমা দেবী।"

চায়ের সরঞ্জাম এসে পড়ায় গানের কথা চাপা পড়ল। বিলাতী কায়দায় বেশ ভালো রকম ব্যবস্থা, কেক্, পুডিং, দামী বিস্কুট, তার সঙ্গে আছে সন্দেশ—দেশী যা এ-আভিজাত্য পেয়েছে। আলাপ-আলোচনা নানা পথ ধ'রে চলল—রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য—বাংলা থেকে নিয়ে কন্টিনেণ্টাল পর্যন্ত।...কেরিয়ারের কথাও উঠল, কে কি হতে চায়, অবশ্য প্রধানত খগেন আর ছান্থুর কথা নিয়ে, তার সঙ্গে মলয়ার কথাও এসে পড়ল, সেই টানে অল্প করে সরমারও।...আজকাল এত স্থযোগ—নিজের নিজের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের এত নূতন নূতন পথ ঝট্-পট্ ক'রে খুলে যাচ্ছে, শুধু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভাবে বাঙালীর কাছে সে-সব বন্ধ।...মৃগাঙ্কই কথাটা তুলেছে, "ঠিক এই ভুলটি বাঙালী আর একদিন করতে বসেছিল, পশ্চিমের হাওয়া যেদিন প্রথম বয় এদেশে। সেই মুখ গুঁজে মাটি কামড়ে প'ড়ে থাকা। মোটা পূজো দিয়ে তার ওপর ঘটা করে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে মেডিকেল কলেজের প্রথম ছাত্র-দেবতাকে ঘর থেকে বের করতে পারা গিয়েছিল।...রামমোহন—মাইকেলের দল না জন্মালে দেশটার যে কী হোত ভেবেই পাওয়া যায়।না।...খগেনের কথাই দেখো সরমা, ও চায় এক, ওর বাবা, তিনি ওকে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েটে বেঁধে রেখেছেন।"

সময়ের জন্যও, আবার আলোচনা যে-ধরনের হচ্ছে সে জন্যও— সরমার জড়তাটা একেবারেই কেটে গেছে; খগেনের দিকে চেয়েই প্রশ্ন করলে—"আপনার টেস্ট্ কোন্ দিকে ?"

খগেন উত্তর করলে—"সে আপনি ভাববেন না। এম-এ'র পরেই আমায় হার্ভার্ডে পাঠাবেন ঠিক ক'রে আছেন; আমি গিয়ে ঠিক হলিউডে বসে থাকব; নড়াতে চান, ফলটা বুঝবেন; I believe in individual freedom (আমি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী)।

যেমন জিদ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার টোনে বললে, একটু থমথমে ভাব এসে গেল। স্বামীর যা তর্ক—স্ত্রী তার বিরোধিতা করে, তর্কটা স্ত্রীর হ'লে করে স্বামী। খানিকটা চুপচাপের পর খগেনের কাপে একটু চা ঢালতে ঢালতে মুখ নিচু করে সোনাদি বললে—"খগেন বলছে, খগেনের মানায়; ঐ কথা যদি আজ মলয়া বলত, কি সরমাই—মানাত কি? সীমা সব জিনিসেরই থাকা দরকার।"

এই কথার উত্তর একদিন সরমা দিলে, মাস তিনেক পরে।

এর মধ্যে অনেক কিছু হয়ে গেছে। সেই অনেক কিছুর ভেতর সোনাদি'র বাড়িতে যাওয়া আসাও একটা। আর এইটেই মুখ্য, কেন না বাকি যা-সব তা এরই মধ্যে দিয়ে।

এই তিন মাসে অন্তত বার দশেক এসেছে সরমা। প্রথম মাসে কম। দ্বিতীয় মাসে একটু বেশি, তৃতীয় মাসে আরও বেশি – ক্রমেই বেড়ে গেছে।

সোনাদি'র বাসায় শুধু মলয়া, খগেন আর ছানুই আসে না, আসে আরও অনেকে। তার মধ্যে—খগেনের তো শুধু হলিউডে যাবার স্বপ্ন দেখাই—কয়েকজন নাম-করা সিনেমা-তারকারই দেখা পেয়ে গেছে সরমা, মেয়ে পুরুষ দু'রকমই। শিউরে ওঠেনি ভয়ে, বা গুটিয়ে যায় নি সঙ্কোচে। সোনাদি'র সদাবন্ধ ঘরের হাওয়াটি এমন যে সহজভাবে—বরং খানিকটা বীরপূজার মনোভাব নিয়েই দেখেছে-শুনেছে; প্রথমটা খানিকটা তফাৎ থেকেই, তারপর কাছে ঘেঁষে।...প্রাসাদোপম প্রেক্ষাগৃহে, রূপালী পর্দায় ছায়ারূপে এরাই হাজার হাজার বিস্মিত নয়নের অর্ঘ লোটে—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত!...রয়েছে তারই সঙ্গে এক ঘরে ব'সে—কোন্ অভিনয়ে কী তপস্যায় হয়েছে উত্তীর্ণ তার কাহিনী বলছে।

আসে ওরা কম—একেবারে অত বড় যারা; বেশির ভাগই স্বল্পবাক—জানে তাদের কথা দামী, বেশি ছড়ানো চলে না। মেয়েই হোক, পুরুষই হোক, তাদের নিজের নিজের যে স্টাইল আছে—বসার, মুখ তোলার, ফিরে চাইবার, তার মধ্যে দিয়ে অল্প যা বলবার বলে, অভিমত দেয়, রাজনীতি, দর্শন, সমাজনীতি—কোন

একটা ধ'রে, বা যখন যেটা সুবিধা হয়; সব চেয়ে অল্প, সিনেমা নিয়েই। সাধারণত এই, ও-জগতের আভিজাত্য। মুখর তারকাও আছে।

সোনাদি আগে থাকতেই জানিয়ে দেয়, সরমা, আসছে সোমবার সুচিত্রা দেবীকে নেমন্তন্ন করেছি, বিকেলে; পার তো এসো। অবিশ্যি একটা চান্স নেওয়া, আসতে যে পারবেনই এমন কথা দেন নি।

জ্যোতিষ্ক এ আকাশ থেকে নেমে গেলে একটু থমথমে ভাব লেগে থাকে খানিকক্ষণ। তার পর আলোচনা আরম্ভ হয়।—

"রংমশালে ওঁর সে আত্মজীবনী একটু বেরিয়েছে দেখেছেন আপনারা? ঠিক সে-ধরনের আত্মজীবনী নয়, ইণ্টারভিউ দিয়েছিলেন একটা, তাতে প্রশ্ন ক'রে ক'রে বের করা—একটা প্রশ্ন—'কবে থেকে আপনার সিনেমার দিকে আসবার 'অ্যাম্‌বি-শন'টা মনে জাগে?'···উত্তর—'মনে হয় মনটাই যবে থেকে জেগেছে, কেননা কবে যে ছিল না, পড়ছে না মনে।'

—কী রকম ক্লেভার উত্তর! Just like her! (যেমনটি ওঁর মুখে মানায়)। আর জানেন?—ওঁর প্রতিভা দেখে ওঁর বাবাই এদিকে বরাবর সুযোগ করে দিয়ে গেছেন! কী রকম লিবারেল মাইণ্ড!···আর ওঁর স্বামী কিনা "

"আজকাল অনেক স্বামীও এ বিষয়ে লিবারেল। কেন, এই তো সেদিন কাগজে বেরিয়েছিল পাঞ্জাবে একজন জজ—তিনি তাঁর স্ত্রীকে পারমিশনই দিয়েছেন কনট্রাক্ট করতে—অবশ্য আই-সি-এস্ জজ। বাংলা একটু ঘোমটা-টানার দেশই, যাই বলুন।"

সোনাদির বাসায় আরও অনেকে আসে, প্রফেসার, উদীয়মান ব্যারিস্টার, সাহিত্যিক। যেই আসুক—ঘরের সেই একটি আবহাওয়াই হয় পুষ্ট—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, উদার শিক্ষা, বন্ধন থেকে মুক্তি—এগিয়ে চলো, নিজের প্রতিভাকে বুঝে নিয়ে আত্মোপলব্ধির পথে। ··সবই খুব উঁচু দরের কথা, কিন্তু কোথায় যেন ঐ একটা 'কিন্তু' থেকে যায়ই।

প্রথম প্রথম হোস্টেলে ফিরে এসে ভাবত সরমা, নূতনত্বের মাদকতায় মাথাটা যে ঝিমঝিম করত, তারই মধ্যে বিচার করে দেখবার চেষ্টা করত। সোনাদির

বাসাটা যেন রহস্যময় বলে মনে হোত। কী করে ওরা, কী ক'রে এত দহরম-মহরম এত-সবের সঙ্গে? কী ক'রে এত প্রতিপত্তি? একটা অস্বস্তি থাকতই লেগে। কয়েকবার গেল না, নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও। কিন্তু ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে।

সরমা অবশ্য ভাবে এ ওর সরলতাই; ক্রমেই বিশ্বাস দাঁড়াচ্ছে—সোনাদির ঘরের মুক্ত হাওয়া ওর জীবনে পড়েছে ছড়িয়ে।

"অনেক কিছুর"ই আরও একটা দিক আছে, হোস্টেল আর সরমার পিতাকে নিয়ে।

যখন বাইরে যাওয়াটাই গড়াল, দু'একদিন ফিরতে বিলম্বও হ'ল, একজন আত্মীয়ের অবতারণা করতেই হ'ল সরমাকে। সোনাদি একদিন মেয়েকে সঙ্গে করে এলও হোস্টেলে মোটরে করে, চেহারা দেখিয়ে সরমার কথার সাক্ষাৎ প্রমাণ দিয়ে গেল, মাঝে মাঝে যাতে যেতে পায় তার জন্য একটা ঢালোয়া অনুমতিও নিয়ে গেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছ থেকে। একে বোলচালের ক্ষমতা আছেই, তার সঙ্গে চোখ-ধাঁধানো কৃষ্টির একটা পালিশ, তার ওপর সরমার কাছ থেকে বাড়ির সবার এবং সব কিছুর কথা জেনে নিয়ে সেই জ্ঞানটাকেই বেশ কাজে লাগালে—সরমার বাবা হ'ল কাকা—উকিল থেকে মুন্সেফ, মুন্সেফ থেকে এখন সবজজ—কী ঘোরা-ঘুরির চাকরি বাবা!—কাকা তো দুঃখ করেন, তার চেয়ে সম্মানিত চাকরির মোহে না পড়ে যদি ওকালতিতে কামড়ে পড়ে থাকতাম তো এতদিন একটা মানুষ হয়ে যেতাম—এ টোটো কোম্পানীর মতন ঘুরে বেড়ানো, না করতে পারলাম নিজের একটা মাথা গোঁজবার সংস্থান, না কিছু···এইবার রিটায়ার করে বোধ হয় কলকাতায়ই উঠবেন।···

টালিগঞ্জে একটা বাড়ি নেবার কথা হচ্ছে না সরমা?"

সরমা সায় দেয়—"হ্যাঁ, দর নিয়ে একটু আটকাচ্ছে।"

—অর্থাৎ এই ভাঁওতায় সরমাও সরিক হয়ে পড়ে; তারা দুজনে মিলেই ঠকাচ্ছে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে।

তার কাছে সব জেনে নিয়ে খানিকটা বাড়িয়ে-সাড়িয়ে এই রকম চতুরতার সঙ্গে কাজে লাগালো, তারপর দায়ে ফেলে তারও এইভাবে সায় নেওয়া—সরমার মনে যে

এর প্রভাবটি কী হতে পারে সেদিকেও সতর্ক থাকে সোনাদি ; বাইরে এসে একান্তে পেলে বলে—"সরমা কি মনে করছ জানি না—সোনাদি এত বড একটা হোক্স্ চালিয়ে দিলে স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘাড দিয়ে। কিন্তু এরা বড্ড কন্‌জারভেটিভ—একটু সাজিয়ে না বললে তোমায় কিছুতেই বেরুতে দিত না। এ সব লোকের কাছে মাঝে মাঝে একটু আধটু ইনোসেণ্ট মিথ্যা না বললে কাজ হয় না।"

এই ক'রে চলে এসেছিল এতদিন। এখন সরমার গানে সোনাদির বাড়ি প্রায়ই মুখরিত, নাচও হয়েছে তু'দিন।···সরমা ধীরে ধীরে নামছে, অবশ্য এখনও "উঠ্ছি" এই মনে ক'রেই।···হোস্টেলের আবহাওয়ার মধ্যে যদিবা কখনও জাগে দ্বিধা মনে, আটাশ নম্বর রঞ্জন পার্কে গেলেই কেটে যায়। এয়ার-কণ্ডিশনড্ ঘর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উষ্ণ বাতাস দিয়ে।

এই ক'রে চ'লে আসছিল, কিন্তু আর চলবে না। সরমা হঠাৎ এক অদ্ভুত চিঠি পেয়েছে বাবার কাছ থেকে। তিনি খবর পেয়েছেন—সরমা নাকি এক আত্মীয়ার বাড়িতে যাতায়াত করে, এই ধরনের বয়স, চেহারা—স্থবর্ণময়ী নাম। তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না ; কেননা এরকম আত্মীয়া তাঁদের কেউ আছেন বলে মনে পড়ছে না। অবশ্য থাকতেও পারেন, শাখাপ্রশাখা ধ'রে সব তো জানা নেই তাঁর, তবে সরমা যেন আরও একটু বিশদভাবে পরিচয় দিয়ে জানায় তাঁকে। আর তাঁর চিঠি না পাওয়া পযন্ত যেন বন্ধই রাখে যাওয়া। কলকাতায় তাঁর একটু কাজ পড়ে গেছে। তিনিও আসছেন শীগ্‌গির।

চিঠি পেয়ে অবধি একটা ঝড বইছে সরমার মনে—একটানা নয়, কতকগুলা বিরুদ্ধ হাওয়ার সংঘর্ষ—ভয় আছেই খানিকটা, তার সঙ্গে একটা আক্রোশ, স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিভাদি'র ওপর, এই হীন চুগলি-খাওয়া ; তার সঙ্গে সঙ্গেই জেগে উঠছে বিদ্রোহ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—এইটেই হয়ে উঠছে প্রবলতর।

সকালের ডাকে চিঠি পেয়েছে, সমস্ত তুপুরটা ভেবেছে, তার পর বিকেল হতেই স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে গিয়ে বললে—"আমায় একবার স্থবর্ণদিদির বাসায় যেতে হবে, খবর পেলাম তিনি অস্থস্থ।"

—এও একটা রচনা সরমার—স্বর্ণদিদি , আসল নামটা কী ভেবে তখন দেয় নি পরিচয়-প্রসঙ্গে।

মুখটা বেশ ভার, একটু রাঙাও ; কী যেন একটা সঙ্কল্পের ভাব। বিভাদি' মানুষটি দুর্বল-প্রকৃতির (নয় তো যখনই সন্দেহ হ'ল, আগে কড়াকড়ি করে তারপর ওর বাবাকে লিখতেন)। কলেজে প্রগতির হাওয়া, তার ওপর সরমা অনেকটা এখন নেত্রীত্বই নিয়ে রয়েছে মেয়েদের, বললেন—"যাও, কিন্তু শীগ্‌গির চলে এসো।"

"তেমন অসুস্থ হ'লে একটু দেরি হবে না অন্যদিনের চেয়ে"…এক যদি একে-বারে না যেতে দেন তো যাই-ই না।"

বিভাদি বললেন—"যাও ··আশা করি নয় ততটা অসুস্থ।"

সেই এসেছে সরমা। সোনাদি কি বলে জানতে চায়।

কতখানি সে নেমেছে এখনও যদি বুঝত—তো শিউরে উঠত, হয়তো ফিরেও আসত, এখনও সে-সুযোগ ছিল।

ঘরে এসে যখন ঢুকল তখন বাতাস একেবারে গমগম করছে।

খগেনের একটা বড় ফিল্‌ম্ কোম্পানীতে নূতন বইয়ে একটা মাঝামাঝি গোছের ভূমিকা পাওয়ার কথা চলছিল। কয়েকদিন আগেকার খবর এটা। নূতনতম সংবাদ খগেন সেটা পেয়েছে, অর্থাৎ ওঁরা রাজি রয়েছেন, কিন্তু ওর বাবা একেবারেই বিমুখ, কোন মতেই কন্‌ট্রাক্ট করতে দেবেন না। এখান থেকে নাম কাটিয়ে হার্ভার্ডে পাঠিয়ে দেবার কথাই হচ্ছে, সেইখানেই এম. এ. দিয়ে, তারপর সেইখানেই ডক্টরেটের জন্য চেষ্টা করা।

খগেন একেবারে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

এসেছে অনেকে আজ। সবাই যে ইন্ধনই জোগাচ্ছে এমন নয়, দু'একজন কতকটা ওর পিতার পক্ষ নিয়ে বোঝাতেও চেষ্টা করছে, আর সেই জন্যই একটা তর্কের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। বোঝাবার মধ্যে আছে সোনাদি'ও, সুতরাং স্বামী মৃগাঙ্ক খগেনের দিকে।

সরমা চুপ করে একপাশে রইল বসে। ঠিক এই ধরনের একটা অবস্থা আজ

তারও; যতই তর্কটা এগুচ্ছে, সে যেন আরও গম্ভীর হ'য়ে যাচ্ছে, মুখটা আরও থমথমে হ'য়ে পড়ছে।

এক সময় সোনাদি বললে—"সরমা, তুমি একেবারেই চুপ করে আছ। একটু বোঝালে পারতে খগেনকে; তোমার মতের ওপর ওর খানিকটা শ্রদ্ধা আছে।··· আমিও তো গাজুরি কিছু বলছি না। হার্ভার্ডে পাঠালেও যখন হলিউডে গিয়েই বসবে, তখন ও যাকই না যত শীগ্‌গির হয়, ঐ তো পথ হলিউডের। এখানকার কন্‌ট্রাক্টটা না হয় ছেড়েই দিলে—যদি তাইতে গুরুজনের মর্যাদাটা বাঁচে আপাতত না হয় একটা স্যাক্রিফাইস্ হিসেবেই করলে এটা।"

সরমা চোখ দুটো তুলে বললে—"আমায় মতটা দিতেই বলছেন সোনাদি?··· কিন্তু অফেন্স্ নেবেন না, কেননা আপনিও গুরুজনের মধ্যেই। আমার মত হচ্ছে, জীবনে একটা সময় আসে যখন আমরা গুরুজনদের কাছে গুরুভার হয়ে উঠি; সে সময়টা আমাদেরও উচিত নয় কি সেটা উপলব্ধি ক'রে তাঁদের হালকা করে দেওয়া? খগেনবাবু হলিউডেই যদি যাবেন তবে তার পাথেয় যখন নিজের চেষ্টায় জোগাড় হচ্ছে তখন সে সুযোগটাই বা ছাড়বেন কেন?···আর এইতেই তো গুরুজনের মর্যাদা বেশি রক্ষা হবে, হার্ভার্ডের নাম করে হলিউডে যাওয়া—এ প্রবঞ্চনাই বা কেন?"

যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না—এইভাবে সবাই ওর মুখের প্যানে চেয়ে ছিল, শেষ হ'তে দৃষ্টি নত করলে।

চরমটা যখন এল তখন হুড়মুড় করেই এসে পড়ল; একটা যেন আঁধি, দেখতে-শুনতে ভাবতে-সামলাতে দিলে না।

পরদিন সকালে বাবার টেলিগ্রাম এল, তিনি আসছেন।···কত বড় প্রবঞ্চনা যে এতদিন ধ'রে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে, আজ প্রথম সেটা ভালো ক'রে টের পেলে সরমা। সাহস পেলে না বাবার সামনে দাঁড়াতে। কাল খগেনের ব্যাপারে যখন অভিমত দিলে, তখন গুরু নিয়ে হয়তো একটু ব্যঙ্গের ভাবও ছিল, তার কারণ এও হতে পারে যে গুরু কী বস্তু ঠিক মতো জানা ছিল না সরমার। মাতৃহীনা মেয়ে,

পিতা তাকে বন্ধুরূপেই প্রতিপালিত করে এসেছেন। এখন নিজের বিপুল অপরাধের বোঝা যখন তাঁর গুরুর রূপটাই স্পষ্ট করে তুললে, তখন আর তাঁর সামনে চোখ তুলে দাঁড়াবার শক্তিও রইল না সরমার। হয়তো এর মধ্যে অভিমানও ছিল, তার সঙ্গে নিশ্চয় খানিকটা সেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা, কিন্তু আশঙ্কাটাই হয়ে রইল সবচেয়ে প্রবল।

বিভাদি'কে গিয়ে বললে—সুবর্ণদি'র অসুখটা বেশিই দেখেছিল কাল, আজ একটু অন্যভাব; পাছে বিভাদি' নিজের অধিকার প্রয়োগ করেন সেই ভয়ে বললে আজ ফিরবে শীঘ্রই—ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।

একবার পা বাড়াবার পর সে ঘণ্টাখানেক আর তার শেষ হয়নি, চিরতরেই চলে এল সরমা, বা আসতে হ'ল চলে।

সোনাদি' তার সহায় হ'ল এ বিপদে। আশ্রয় দিলে, অর্থাৎ লুকুলে। নিজের বাসায় লুকুলেও ক্ষতি ছিল না, কেননা এই ঠিকানা কারুরই জানা নেই, তবুও অন্যত্রই ব্যবস্থা করলে, সে ভদ্র ব্যবস্থাই।

দু'টো দিন কী অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যে কাটল সরমার, কল্পনায়ও কখনও আনতে পারত না—তীব্র অনুশোচনা, নিরাশা, বাবার মুখ—সমস্ত কলকাতায় খোঁজাখুঁজি করছেন পাগলের মতো—ছোট ভাই দু'টি, ছোট বোন—আবার ফিরে যাবার সময় কে কি ফরমাস করেছিল নিয়ে যেতে, তার দু'একটা কেনাও আছে বাক্সের মধ্যে ··কী হ'তে কী হ'য়ে গেল, কেমন করে হ'ল?···

কিন্তু মাত্র দুটো দিন। তারপরেই আকাশটা পরিষ্কার হয়ে গেল। যখন তারকারই জন্ম-কথা, তখন এও বলা যায় যে একটা উজ্জ্বলতর আকাশে এসে উদয় হ'ল সরমা।

—খুব ভালো একটা কনট্রাক্ট পেলে, একটা বড় কোম্পানীতে; একেবারে নায়িকার ভূমিকায় নয়, তবে বড় ভূমিকায়, উপনায়িকার বলা যেতে পারে। চুক্তির মূল্য চার হাজার টাকা।

এ সাহায্যও করলে সোনাদি। তার যেন ঠিক করাই ছিল আগে থাকতে।

তবে চার হাজারের এক হাজার গেল সোনাদির হাতে, ওদিক থেকেও কিছু পেয়েছে কিনা তা অবশ্য জানতে পারলে না সরমা।···রহস্যময়ী সোনাদি, দুর্বোধ্য মৃগাঙ্কদা'—এতদিনে তাদের প্রকৃত পরিচয় পেলে সরমা। কিন্তু পেলে, যখন তারাই একমাত্র অবলম্বন।

আরম্ভ হ'ল সিনেমা জীবন—এর উল্লাস, এর উন্মাদনা, এত অভিনবত্ব—এও একটা কল্পনাতীত নূতন জগৎ। বোঝে, সিনেমা জগতে একটা চাঞ্চল্য এনে ফেলেছে, এরই মধ্যে, স্যুটিং মাত্র এই সবে গোটাকতক শেষ হয়েছে, চিত্র মুক্তি পেতে এখনও কত দেরি। একটা চাঞ্চল্য—সিনেমা জগতে একটা নূতন আবিষ্কার, একটা নামের অন্তরাল রেখে দিলে সরমা। ও এখন অরুণা দেবী, ঐটুকু রইল দুদিক'কার জগতের মাঝখানে একটা পর্দা। নামকরণটা করলে মৃগাঙ্ক, বললে—"ও নতুন আলো ছড়িয়ে জড়তার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছে, ওর নাম দিলাম তাই অরুণা।"

আরও একদিন এই কথাটাই বলেছিল মৃগাঙ্ক,' প্রায় বছরখানেক পরে। চার জায়গায় চারটে ভূমিকা, দুটো তার মধ্যে মুখ্য। একেবারে ক্লান্ত হয়ে ফিরছে বাসায়—এখন তার নিজেরই আলাদা বাসা। সোনাদি আর মৃগাঙ্ক এসেছে। টেবিলে বসে তিনজনে; চায়ের রাজসিক আয়োজন। ওর আদেশে বেয়ারা একটি রঙিণ তরল পদার্থের বোতল এনে রেখে দিলে, অর্ধশূন্য, হালকা বিলাতী মদিরা একটা, স্ত্রী-কণ্ঠের উপযোগী।···দুটি পানপাত্র, সোনাদি খায় না।

কথাপ্রসঙ্গে কি করে সেই প্রথমদিনের থিয়েটারে জড়তার কথা উঠল, মৃগাঙ্কই তুললে। সরমা পাত্র দুটি পূর্ণ করে দিতে মৃগাঙ্ক একটা তুলে নিলে, নিজেরটাও তুলে নিয়ে পাত্রে পাত্রে ঠুকে নিয়ে সরমা হেসে বললে—"তখন কলেজের বন্ধু মহলে আমার নাম কি ছিল জানেন মৃগাঙ্কদা?—'বোমা'!"

খিল খিল করে হেসে উঠল। সে-হাসির এখন আরও ধার হয়েছে, একটা নিতান্তই নিজস্ব ভঙ্গি হয়েছে। রাজপথের দুধারের দেয়ালে বোর্ডে, কিওস্কোতে; নানা বর্ণের রঙিন চিত্রে সে-হাসি পথিকের গতি করেছে শ্লথ, দৃষ্টি করেছে বিভ্রান্ত···

আসিতেছে !—আসিতেছে !—মুক্তি প্রতীক্ষায় !—ভূমিকায় চিত্রজগতের নূতন জ্যোতিষ্ক অরুণা দেবী !

দিন গড়িয়ে চলল। চিত্র পেল মুক্তি। মাত্র স্যুটিঙের ওপর পরিচিত মহলে যে-যশের গুঞ্জন উঠেছিল, এই একটি চিত্রেই সে-যশ দিকে দিকে পড়ল ছড়িয়ে। ঠিক এখানেও হ'ল সেই প্রথমদিনের পুনরাবর্তন—সেদিন কলেজের সেরা মেয়ে অনুরাধা পড়ে গিয়েছিল চাপা, নায়িকার ভূমিকা নিয়ে; আজও সেই ভূমিকাতেই ছায়াচিত্রের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী নিষ্প্রভ হয়ে গেল এই নবাগতার সামনে।... ছবিতে প্রবন্ধে সিনেমার কাগজগুলা হয়ে উঠল মুখর। The starry world, তার প্রবন্ধের শিরোনামা দিলে—The coming figure on the Indian screen.

পত্রিকার মলাটেও বেরুল ছবি; নামজাদা একটা বিলাতী স্নো—চিত্রাকাশের নূতন তারকা অরুণা দেবী বলেন—কর্মের অবসাদের মধ্যেও মুখশ্রীকে সজীব রাখতে আমি যতগুলি স্নো'র পরীক্ষা করেছি তার মধ্যে—ইত্যাদি।

একদিন খগেন বললে—"তুমি যেন একটা রেডিওর গান হয়ে পড়েছ অরুণা। পথে চলতে চলতে গানটা একবার শুরু হলে আর মিস্ করতে হয় না—একটা বাড়ি ছেড়ে গেলাম তো আর একটা বাড়িতে চলছে—তার সুর মিলিয়ে আসতে না আসতে আর একটা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে তোমায়ও দেখি পথের ধারে ছবিতে —কারুর বাড়িতে গিয়ে বসলাম—একটা না একটা সিনেমার কাগজ পড়েই হাতে—ইংরিজী, বাংলা যাই হোক; তুমি আছ। নেহাৎ অন্য ধরনের কাগজ হলে মলাটও ওলটাতে হয় না, মুখের দিকে মিষ্টি হাসি নিয়ে তুমি আছ চেয়ে।"

ওদিকেও একটা কাহিনী উঠছিল গড়ে। একদিন সোনাদি বলেছিল—"তোমার মতের ওপর ওর খানিকটা শ্রদ্ধা আছে সরমা।"

কথাটার একটা নিগূঢ়ার্থও ছিল। এই পরস্পরের মতের ওপর শ্রদ্ধা, তার ওপর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কথা মেনে নিলেও মেয়েরা লতার জাতিই, আশ্রয় খুঁজবেই,—এই দুইয়ে মিলিয়ে খগেন-অরুণার মধ্যে আগে থেকেই একটা সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠেছিল যেন। তারপর এদিকে এসে যে নিতান্তই একটা নিঃসঙ্গভাব ফুটে উঠল

সরমার মনে, সব কিছু হওয়া সত্ত্বেও যে একটা অসহায়তা—নিতান্ত মেয়ে বলেই—তাইতে আরও স্পষ্ট করেই তার মনের তন্তুগুলি এগিয়ে খগেনকে করলে আশ্রয়।

হার্ভার্ডের পাট উঠে গেছে খগেনের, তাব সঙ্গে আপাততঃ হলিউডেরও। ওরও নাম হয়েছে মন্দ নয়—তারকামণ্ডলীতেই একদিন স্থান পাবে বলে ওব আশা ওর বন্ধুবান্ধবদেরও। কিন্তু মেয়ে তারকায় পুরুষ তারকায় তফাৎ আছে। সরমা থাকে নিজের সুসজ্জিত আলয়ে, খগেন থাকে একটা মেসে; ভালোই কিন্তু মেসই।

তবু ওদের মিল আছে মনে মনে, প্রকৃত সখ্য; দুজনে মিলে একটা জীবনের স্বপ্ন দেখে, প্ল্যান করে। তার মধ্যে হলিউডও আছে। বিবাহ? সেটার বিষয় ওরা এখনও নিজেবাই ভালো করে নিজেদের মন জানে না। কিন্তু তার জন্য আটকায় না। মন্ত্রপুত বিবাহ—সে জগৎ থেকে ওরা বেরিয়েই এসেছে, শ্রদ্ধাও বোধ হয় নেই তাতে। ওদের হবে Companionate marriage—দুজনের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখে ওরা যাবে পাশাপাশি এগিয়ে।

নূতন জীবন, নূতন সাফল্য কতরকমের স্বপ্ন দেখে ওরা।

একটা বৎসরেব এই ইতিহাস। এর ভেতর দুটো ছবি বেরিয়ে গেল সরমাব। তার সঙ্গে আছে আরও গোটা পাঁচেকের চুক্তি, এবার বেশির ভাগই নায়িকার ভূমিকায়।

দ্বিতীয় বৎসরের গোড়ার দিকেই একটা ধাক্কা খেলে সরমা, তাইতে আর যা হবার হ'লই, একটু দাঁড়িয়ে চোখ মেলে দেখবার অবসর পেলে।

সেটা হ'ল যেদিন খগেনের সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ট্রাজেডিটা এইখানে যে, ছাড়াছাড়িটা হ'ল যেদিন ওরা একেবারেই খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে।

খগেনের আয় বেড়েছে। সরমা অনেকদিন থেকেই ওকে বলছিল তার বাসাতে চলে আসতে, মেসে ওর নিজের কাজকর্মেরও খুব অসুবিধা হচ্ছিল, কিন্তু

বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল ওর আত্মসম্মান। ও যেদিন এল—সেদিন সরমা ঠাট্টা করে বললেও—"আমি কি বুঝিনা ?—তুমি এলে ঠিক যখন একেবারে মোটরের খরচটি পর্যন্ত কড়াক্রান্তিতে আধা-আধি বুঝিয়ে দিতে পারবে। মেয়েরা তো চায় একেবারে উজোড় করে দিতে, কিন্তু নিচ্ছে কে ?—ওদিকে তো হিসেবের কড়াক্কড়ি। বুঝিনি যেন আমি।"

খগেন বললে—"তুমি একেবারে বোঝনি অরুণা ; আমার ইচ্ছে ছিল তখনই আসি যখন কড়াক্রান্তি পর্যন্ত সমস্ত খরচেরই ভার নিতে পারি আমি।"

"তাই করলে না কেন ? কী দরকার ছিল এত তাড়াতাড়ি আসবার ?" অভিমান ভরে সরমা বললে।

"দেখলাম সে রকম সব একেবারে উজোড় ক'রে দেবেই না কখনও। সে-নেওয়াব যে কী আনন্দ এক পুরুষেরাই জানে।···কিন্তু সে আশায়-আশায় কতদিন থাকি ? তাই অর্ধেকের লোভেই চলে এলাম।"

ক'টা দিন নিবিড় আনন্দে কাটল। কাগজে ওদের দুজনকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে। ভবিষ্যৎ-বাণীও। এই সময়ে স্যুটিঙের প্রয়োজনে সরমার দিন কয়েকের জন্য বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হ'ল; ধানবাদের ওদিকে একটি জায়গা বাছা হয়েছে, যাচ্ছে একটা বেশ বড পার্টি।

ঠিক এই সময়টিতে খগেনেরও জোর প্রোগ্রাম হাতে, যার জন্য স্টেশনে পর্যন্ত গিয়ে তুলে দিয়ে আসতে পারলে না। তবে সেও যাবে, ধানবাদেই। ঠিক হয়েছে স্যুটিং শেষ হ'লে সরমা ওখানেই থেকে যাবে, তারপর দিন দশেকের মধ্যে খগেন গিয়ে উপস্থিত হবে। ওরা একবার স্বপ্নের আবেষ্টনীর মধ্যে ওদের স্বপ্ন ফলিয়ে তুলতে চায়—ধানবাদকে কেন্দ্র করে নদী, পাহাড, অরণ্য···খগেন মোটরটাই নিয়ে যাবে এখান থেকে।

যাওয়া কিন্তু সে রাত্রে হ'ল না সরমার। প্রায় শেষ মুহূর্তে একজন খবর আনলে টেলিগ্রাম এসেছে যে-বাড়িটা ঠিক করা হয়েছিল সেটা নিয়ে হঠাৎ কি গোলমাল হয়েছে। সমস্ত দলটাই স্টেশন থেকে ফিরে এল।

গাড়িটা ছিল সাড়ে আটটায়। মনটা একটু দমে গেছে। খগেনের বাইরে

প্রোগাম, বাড়ি এখন খালি, সরমা একটা ট্যাক্সি করে সোনাদির বাসায় চলে গেল। সেখানে খানিকক্ষণ কাটিয়ে ওরই মোটরে যখন বাসায় ফিরল, রাত্রি প্রায় এগারটা; কিছু পূর্বেই ফিরে আসবার কথা খগেনের।

বাড়ির সামনে ছোট্ট একটু বাগান, তার ভেতর মোটর প্রবেশ করতেই খগেনের গলা শোনা গেল। বৈঠকখানায় কার সঙ্গে কথা কইছিল বেশ মুক্ত কণ্ঠেই, মোটরের আওয়াজ শুনে বলতে বলতে বেরিয়ে আসছে—"বাঃ, মৃগাঙ্কদা! আর আমরা দুজনে কখন্ থেকে এসে···"

তারপরেই দেখলে সরমা মোটর থেকে নামছে, বললে—"আরে! তুমি? আমি মনে করি·· হঠাৎ ফিরে এলে যে?"

'মৃগাঙ্কদার আসবার কথা ছিল নাকি? কৈ, বললেন না তো, আমি তো তাঁদেরই মোটরে এলাম ওখান থেকেই।···না, যাওয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল; টেলিগ্রাম এসেছে·"

শোফার জিগ্যেস করলে—"আমি যাই তা'হলে?

বৈঠকখানা থেকে গটগট করে বেরিয়ে এল মলয়া, বললে—"না, দাঁড়াও; আমি তা'হলে এই গাড়িতেই চলে যাই ··কী টেলিগ্রাম এল ওদের সরমা?"

সরমা স্তম্ভিত হয়ে গেছে, কিন্তু অভিনয় ক'রে ক'রে এই রকম সব নাটকীয় পরিস্থিতি কি করে সামাল দিতে হয় জানে—এর পর যা হবার তা হবে। বেশ সহজ কণ্ঠেই বললে—"টেলিগ্রাম এল—বাড়িটা নিয়ে হঠাৎ কি গোলমাল হ'য়েছে। তা, এখুনি চললে তুমি?"

মলয়াও জানে সামলাতে, বেশ সহজভাবেই বললে—"হ্যাঁ যাই, অনেক রাত হয়ে গেছে।"

—নামতে নামতেই ঘুরে একটু হেসে ঠাট্টাও করলে—"এখন তোমাদের দুজনের মাঝে অন্তরায় হ'য়ে থাকা বৈত নয়।"

সরমাও হেসেই যা উত্তর দিলে, তাতে খগেনকে পর্যন্ত নিলে টেনে, বললে—"যে-মানুষ দুজনেরই অন্তরে সে কখনও অন্তরায় হতে পারে?...কি বলো না"—বলে খগেনকেও সাক্ষী মানলে।

খগেনই শুধু বেশ সহজ ভাবটা আনতে পারলে না, একটু স্খলিত কণ্ঠেই বললে —"অন্তত আমার অন্তরের খবর তো এত সহজে দিতে পারি না আমি।"

রাত্রিটুকুও সবুর করতে পারলে না সরমা। তার একটা কারণ হয়তো এই যে মনটা বড় খিঁচড়ে রয়েছে ধানবাদ যাওয়াটা পণ্ড হওয়ার জন্য। মলয়া চলে যেতেই বললে—"একটু বসবে কি?"

দুজনেই গোল টেবিলটার দুদিকে মুখোমুখি হয়ে বসল।

"মলয়া যে এসেছিল রাত্রে এ ভাবে?"

"কি ভাবে?"—প্রশ্নটা ক'রে সোজা মুখের পানে চেয়ে রইল খগেন, সে তোয়ের ক'রে নিয়েছে নিজেকে।

"তাও ব'লে দিতে হবে?"

"তুমি একটা অদ্ভুত এ্যাটিচ্যুড্ নিয়ে কথা কইছ দেখছি অরুণা, তখন তোমার ঠাট্টাতেও তা প্রকাশ পেয়েছে। · মলয়া এমনি এসেছিল, কথা ছিল মৃগাঙ্কদা আর সোনাদিও আসবে।"

কি ভেবে সোনাদির নামটাও জুড়ে দিলে খগেন, কিন্তু এতে আর একবার কণ্ঠ স্খলিত হ'ল।

সরমা ঘাড়টা একটু তুললে, বললে—"আমি ও-কথাটা একেবারেই বিশ্বাস করতে পারছি না বলেই জিগ্যেস করছি। দেখলেই তো আমি ওঁদের ওখান থেকেই আসছি, ঘণ্টা দেড়েকের ওপর ছিলাম—শুকুবার কথা নয়, বিশেষ ক'রে যখন সোনাদির ও আসবার কথা ছিল বলছ।"

"সোনাদিকে আনবার কথা মৃগাঙ্কদাই আমায় বলেছিলেন, সোনাদিকে জানিয়েছিলেন কিনা আমি বলতে পারি না।"

সামলে নেবার চেষ্টা করলে খগেন।

কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল ক'রে ফেলছে দেখে উত্যক্ত হয়ে তর্কের রাস্তাই ছেড়ে দিয়ে সেও ঘাড়টা সোজা করে নিয়ে বললে—"কিন্তু এত প্রশ্নের কি দরকারটা বলো দিকিন?"

"তোমার কাছে উত্তরটা পেলে আর ওদের জিগ্যেস করতে হোত না।"

এবার খগেন দাঁড়িয়ে উঠল—"জিগ্যেস করবে?—ভজাতে হবে?—এত অবিশ্বাস?···তা বেশ জিগ্যেস কোর' মৃগাঙ্কদাকে।"

"কেন? সোনাদিকেও জিগ্যেস করতে দোষটা কি?·· এ শুধু তোমার আর মৃগাঙ্কদা'র ভেতরকার কথা, না? · বুঝেছি; তাহলে তাঁকেও বলে দিও এ-ধরনের ব্যাপার আমার বাসায় চলবে না।"

"তোমার বাসা!···ঠিক, এ কথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম অরুণা, মাফ কোর'।·· আর, দেব—দেবমন্দিরও তো!···যাও, মিছে কথা বাড়িয়ে ফল কি?—শুয়ে পড়োগে।"

তারপর দিন সমস্ত দুপুর-বিকেলে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে সরমা। কাল রাত্রে ঘুম একরকম হয়নি বলতে গেলে, তবু আজকের যে ঘুমটা সেটা সহজ ঘুম নয়, ব্যবস্থা করে ডেকে নিয়ে আসতে হয়েছে। টেবিলের ওপর একটা পানপাত্র খালি পড়ে আছে।

সূর্য্যাস্ত হয়ে গেছে। বিষণ্ণ সন্ধ্যা, সমস্ত শরীরটায় একটা দারুণ অবসাদ, মনের তো কথাই নেই। বারান্দায় একটা হেলানো চেয়ারে অলসভাবে বসে আছে; চাকরকে বলা—যে কেউ আসুক, বলবে শরীর অসুস্থ, তাই ঘুমোচ্ছে।

সকাল বেলাই একেবার বাইরে চলে গিয়েছিল একটা ছুতো করে। ফিরে এসে দেখে, যে উদ্দেশ্যে যাওয়া সেটা সফল হয়েছে—খগেন তার জিনিসপত্র নিয়ে বাসা ছেড়ে চলে গিয়েছে।

—ভালোই হোল, অযথা একটা ব্যক্-বিতণ্ডা মাথা-চাড়া দিয়ে উঠছিল।

কিন্তু অসহ্য একটা শূন্যতা; যেন কিছু নেই, কিছু হবার নয়! সামনের শুধু ম্লান-অস্তরাগ-লিপ্ত আকাশের মতো একটা শূন্যতা—তারই গায়ে দুটো জীবনের কত বিচিত্র চিত্র ফুটে ফুটে মিলিয়ে যাচ্ছে।·· দুটো জীবনই বৈকি—মাঝে একটা মৃত্যুর ব্যবধান; ওদিককার জীবনে সরমার মৃত্যু হয়ে গেছে যে!

এখন মৃত্যুর এপার থেকে এই জীবনকেই দেখছে সরমা। কত মৃত্যুপথ বেয়েই না এই জীবনে এসে পৌঁচেছে সবাই!

এক এসেছে সে। তার বাবা একজন প্রবীণ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। বিদ্যায়, জ্ঞানে, অর্থে, প্রতিষ্ঠায় সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। সরমা শুনেছে—অকালে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে কোথায় গিয়ে আত্মগোপন ক'রে আছেন তিনি।... চারটি সন্তানের মধ্যে এক সরমা, সেই বড়। সরমা যে শেল হেনে এসেছে তারপর তিনি নাকি সন্তানদের প্রতি বীতরাগ হয়ে পড়েছেন—কোথায় পড়ে আছে তারা, কী ভাবে, সরমা তার সন্ধান পায় নি।

আবার এও দেখছে—বাপেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে মেয়েকে। স্বামী আইনের শরণ নিয়ে বিফলমনোরথ হয়েছে, পাগল হয়ে গেছে, আত্মহত্যা করেছে। আবার স্বামী-স্ত্রীতেও এসেছে। আর্ট, প্রগতি, কৃষ্টি—এই সব বড় বড় গালভরা নাম নিয়ে এসে প্রবেশ করে, রূপ থাকতে, কলা-প্রতিভা থাকতে যারা এল না তাদের করেছে ব্যঙ্গ। এসেছে স্ত্রী। ভরসাতেই, নিজে একটা পর্দা হ'য়ে, একটা শোভনতা (অন্তত তাদের বিবেচনায়)—তারপর সেটা রক্ষা করা প্রয়োজন হয় নি, অন্তরীক্ষে গিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে।

মা নিয়ে এসেছে মেয়েকে, ভাই নিয়ে এসেছে ভগ্নীকে; অন্য আত্মীয়ের কথা তো ছেড়ে দিতেই হয়। শিশু আসছে, কিশোরী আসছে, যুবতী আসছে—দিনে দিনে, নিত্য নূতন মৃত্যুর সংবাদ। মৃত্যুর ওদিকে জীবনের শত বৈচিত্র্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে এসব তেমন চোখে পড়ত না, এদিক থেকে সরমা দেখেছে মরণের উলঙ্গ মিছিল; স্তম্ভিত হয়ে গেছে, সে-হিসাবে তার এক ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে চলে আসা তো কত মার্জনীয়। এখন কিন্তু আর চোখেই লাগে না ওসব।...আজ আবার একটা অবসন্নতার মাঝে সেই সব নিজের কদর্যতায় উঠছে ফুটে।

সমাজের বুকের ওপর দিয়ে এ কী একটা সর্বনাশ এগিয়ে চলেছে। যত এগুচ্ছে ততই করছে শক্তিসঞ্চয়!

সর্বনাশ আরও এইজন্য যে—সবাই আসছে দারিদ্র্যের জন্যই—এমন নয়। নিতান্তই শুধু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, প্রগতি... সেদিন এল বিশাখা—শিক্ষিতা, সুন্দরী, সম্পন্ন

গৃহের গৃহিণী—স্বামীর সঙ্গে মতভেদ একটা বিশেষ সিনেমা-দেখা নিয়েই ; একটি শিশুপুত্র, তার সুদ্ধ মায়া কাটিয়ে চলে এল। সে এখন সিনেমার জন্ম দেবে, একটা অভিনয়ে সরমার কো-অ্যাক্‌ট্রেস।

আগেও হয়েছে এ ধরণের ব্যাপার, পাপেপুণ্যেজড়িত মনুষ্য-সমাজই তো ছিল থিয়েটার। কিন্তু তারা বাইরে এসে একপাশে দাঁড়াত। সিনেমা আছে সমাজের গা ঘেঁষে, এখান থেকে এরা সমাজকে প্রগতির পথে টেনে আনবার জন্য দেয় 'বাণী', কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতাদের ইণ্টারভিউ দিয়ে কলা-কৃষ্টির জন্য ত্যাগের কথা, তপস্যার কথা তুলে মনকে করে বিভ্রান্ত।

তারপর এদিককার জীবন। · এই তো কালকের খগেন-মলয়ার ব্যাপার গেল।··· মৃগাঙ্কও ছিল এর মধ্যে! সরমা এসে পড়ল দেখে আর এল না। অথচ সরমার মনে আছে—গোড়ায় একদিনকার কথা—ঠাট্টা বিদ্রূপের মধ্যে ঐ মৃগাঙ্ক হঠাৎ নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললে—"থাক্, মলয়া রয়েছে, নয় তো এর উত্তর দিতাম।"·· স্ত্রীর বন্ধু-কন্যা ব'লে বাক-সংযম!

এই জীবনেরই আর একটা দিক—বীভৎস, ভয়াবহ—ভয়াবহ, চোরাবালির মতো। মৃগাঙ্ক আর সোনাদি স্বামী স্ত্রী মোটেই নয়। সোনাদি ওর বিধবা শ্যালিকা। · ওরা সিনেমার অভিনয়ের দিকে যায় নি, অন্য একটা দিক সামলাচ্ছে দুইজনে মিলে ; ওদের প্রতিভা এই দিকেই খুলেছে। নিতান্তই অভিনয়ের দিকে যায় নি বলে সমাজে খানিকটা যাতায়াতের পথ আছে খোলা, ওরা দুজনে সেই পথে গিয়ে সরমার মতো অসতর্কদের নিয়ে আসে টেনে।

ওর আসার ইতিহাসটা সমস্ত মনে পড়ে যাচ্ছে সরমার—এই ম্লান সন্ধ্যায় যেন অন্য আর একজনের একটা করুণ জীবনকাহিনী ওর তপ্ত চক্ষু দুটিকে অশ্রু সজল করে তুলছে · হে ভগবান, আর কি সে কোনদিনই পারবে না ফিরে যেতে ঐ জীবনে?

কটা মাস আরও গেল কেটে। খগেনের পর ঐ মৃগাঙ্ককেই আশ্রয় করতে চেয়েছিল সরমা। আশ্চর্য! কেমন করে, কী বিপাকে যে এই সব ধরণের ঘটনা নিত্যই ঘটছে এদিককার এই জীবনক্ষেত্রে! অথচ নিত্যই ঘটছে। এর ফল এই

হোল যে সোনাদির দুয়ার একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল সরমার কাছে। মৃগাঙ্ক-সোনাদি কোম্পানীতে সোনাদিই ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এক সময় খগেন বলেছিল—she is the brain. সেটা টের পেয়েছিল সরমা আগেই; কিন্তু কথাটার পূর্ণ সত্যতা জানতে পারলে—সোনাদি তার আর মৃগাঙ্কর ব্যাপারটা জানতে পেরে যখন তার শত্রুতা আরম্ভ করলে।

এমন একটা বিপর্যয়ের কালো মেঘ উঠল আকাশ জুড়ে যে, পুরুষের বিষয়ে একটা ঘৃণা আর আতঙ্ক দাঁড়িয়ে গেলেও আবার একজনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে হোল সরমাকে।

দিন এগিয়ে চলল এই করে। কখনও সফলতার উল্লাসে বেগমত্ত, কখনও ঐ সফলতার ক্লান্তিতেই অবসন্ন, মন্থর। এখন পূর্ণ যৌবন, পূর্ণ শক্তি, সবটাই সফলতা এখন; কিন্তু বুঝতে পারছে যত সফলতা, ততই পরিণাম আসছে দ্রুত এগিয়ে। মূল্য দিতে হয় চরম, অত্যাচারে অনিয়মে দেহ-মন পড়ছে ভেঙে।...দেখছে তো চারিদিকেই এ জীবনের আয়ু কত অল্প, যতদিন দেহের সুষমা; কিন্তু কতদিনই বা সেটুকুকে আগলে আগলে রাখতে পারা যায়? আজকের স্টার—কালকের উল্কা-পাতে মুঠোখানেক ছাই হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে। অতীতের মতো ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হয়, বরং অতীতের চেয়ে বেশিই; কটা বৎসর আর? তারপর?... এই রকম মনে হোলে এক এক সময় কী যে হয়, ইচ্ছে হয় সেই অদূর ভবিষ্যৎটাকে আজই ফেলি এনে, চোখের কাছে এনে প্রত্যক্ষ করি তার বিভীষিকা। পার্টি, অনিয়ম, অত্যাচার—গা ঢেলে দেয় সরমা, আর ভেবে দেখে না কোথায় তলিয়ে চলেছে।

দু বছর প্রায় হয়ে এল। গোটা তিন সিনেমা মুক্তিলাভ করেছে এর মধ্যে, তার ভেতর একটাতে সরমাই নায়িকার ভূমিকায়। একটা খুব চলল, আর দুটো ওৎরায় নি, তবু তার মধ্যে যা সামলেছে তা সরমাই।..হাতে কন্‌ট্রাক্ট রয়েছে অনেকগুলি—ছোট বড় সবরকম...পেরে ওঠা শক্ত, তবু "না" বললে চলে না; অনুরোধ আছে, উপরোধ আছে। অর্থও আছে। যতদিন দেহের সৌষ্ঠব, কামিয়ে নিতে হবে, ওর চুক্তি-মূল্য এখন বারো হাজার পর্যন্ত উঠেছে;

শুধু তাই তো নয়, যতই আসুক, থাকে না। এ জীবনের যেন এ-ই নিয়ম, সর্বদাই অভাব, বিলাসিতার উঁচু শিখর লক্ষ্য ক'রে এগুতে হয়, না হলে প্রেস্টিজ অর্থাৎ কৌলিন্য থাকে না। অর্থ আসছে, কর্পূরের মতো গন্ধ ছড়াবার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে মিলিয়ে। সবার ইতিহাসই এই।·গাড়ি বদলি করেছে দুবার সরমা এর মধ্যে। ঐ রকম এক একটা উল্লাস মাঝে মাঝে; নৈলে চলে না।

চেষ্টা করে, ভাববে না; কিন্তু সে চেষ্টা কবে কারই বা হয়েছে সফল? ধীরে ধীরে একটা আতঙ্কই জমে উঠছে মনে।

মাঝে মাঝে ওদিক'কার জীবনও এক একটা আতঙ্ক হানে। সে আঘাত কিন্তু এ-ধরণের নয়; কখনও সামান্য একটি কথার মাধুর্যই চিরন্তন জীবনের সুখ-দুঃখের স্নিগ্ধ একটি অপরূপ প্রত্যাশা তোলে জাগিয়ে। কখনও সামান্য একটি ঘটনা তার বেদনা, তার নৈরাশ্য দিয়ে বুকের মধ্যে একটা হাহাকর তোলে। বৈরাগ্যের।শুচিতা, তার মধ্যে আশাব ইঙ্গিত—মনে হয় ফিরে যাই সব ছেড়ে, ছিন্ন বস্ত্রে, শুধু পতিতের জন্য অশ্রুটুকু সম্বল করে—যাদের ভাসিয়ে দিয়ে এলাম অকূল পারাবারে, খুঁজে দেখি তারা কোথায়, জড়িয়ে ধরি বুকে। নিজেকে অশুচি বলে মনে হয় না, কিছুই অসম্ভব বলে মনে হয় না; পাওয়া যাবে বৈকি ক্ষমা ভগবানের, তার সঙ্গে মানুষেরও সমবেদনা আছে; আছে বৈকি।—অনন্ত পাপ, পদে পদেই ভ্রান্তি; তার সমান্তরালেই যদি তাঁর ক্ষমা না থাকে তো সৃষ্টি চলে কি করে?

একদিনের কথা।

বাইরে ছবি তোলা হবে, কলকাতা থেকে দশ বারো মাইল দক্ষিণে, ছোট একটি নদীর ধারে একটি গ্রাম বাছা হয়েছে। ছোট পার্টি, তার মধ্যে সরমা আছে।

ওর ছবি তোলা হয়ে গেল বিকালের আগে। জায়গাটার শান্ত স্নিগ্ধতা ওর লাগছে বড় ভালো, বিকালের দিকে সে স্নিগ্ধতা আরও অপরূপ হয়ে উঠল

যেন। ফেরবার কথা সন্ধ্যার পরে, ও বললে—"আমি একটু ঘুরে আসি ততক্ষণ, আপনাদের হোক।"

খগেনও আছে এ দলে; (এমন কিছু আশ্চয ব্যাপার নয়)। একটু দুষ্টামি করেই বললে—"আমিও আসি?"

সরমা হেসে উত্তর করলে—"ভয় নেই, হারাব না।"

একজন খগেনের হয়ে বললে—"চোখের আড়াল হওয়াও তো কম ভয়ের কথা নয়—সেই কথা বলছে খগেন।"

একটু হেসে, ফিরে দেখে সরমা চলে গেল।

নদীর কখনও কাছে, কখনও খানিকটা তফাৎ দিয়ে এঁকে বেঁকে গেছে রাস্তাটা। ছোট গ্রাম, এখানে-ওখানে ছড়ানো ছাড়া-ছাড়া বাড়ি। খানিকটা কৌতূহল জাগিয়েছে সরমা—দোরের চৌকাঠে, গাছের তলায়, পথের ধারে থমকে দাঁড়িয়েছে কেউ কেউ, তবে ছেলেমেয়ের পাল গুটিঙের ওদিকেই, নিরুপদ্রবেই এগিয়ে যেতে পারছে।

যতই এগুচ্ছে, মনটা কেমন যেন কী হয়ে যাচ্ছে—চারিদিকে ছোট ছোট সংসার-চিত্র—যাওয়া-আসা—জলের কলসী কাঁকালে পৈঠা বেয়ে ওঠা—শিশুর হাত ধরে কেউ উঠানে গিয়ে উঠল—কেউ দাওয়ার ওপর ব'সে প্রদীপের সলতে পাকাচ্ছে ...এদিকে মন্থর নদীস্রোত, তীরের ঝোপে ঝিল্লির একটানা রব—মনে হচ্ছে এই যেন অনন্ত প্রবহমান জীবনের সুচিন্তিত আপন রূপ—আর যা হচ্ছে না হচ্ছে সব যেন অবান্তর, ব্যতিক্রম, ক্ষণিক। আজ অনেক আগে থেকেই ওর মনে একটা নূতন চিন্তা উঠেছে খগেনকে নিয়ে।—খগেন একটা প্রণয়-অভিনয়ে ওর কো-অ্যাক্টার আজ—যতই এগুচ্ছে, চিন্তাটা যেন ততই দানা বেঁধে উঠছে · ধরো, সমস্ত জীবনটাই যদি অন্য পথে যেতো—সোনাদি গোড়ায় যা ভাবা গিয়েছিল যদি তাই হোত, খগেনও যদি হোত একটু অন্য রকম, যাতে জীবনের গতিটা অন্যদিকে পড়ত ঢলে ওর মনীষা, ওর সৌন্দর্যপ্রীতি নিয়ে...তারপর যদি...তারপরেও যদি... মনটা যে আজ কী সুরে বাঁধা হয়ে গেছে, এত অসম্ভব 'যদি'র রাশির মধ্যে দিয়েও বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতেই চলেছে এগিয়ে...অনুতাপ হচ্ছে, খগেন যেমন বললে আসার

কথা, আসতে বললেই হোত। অন্তত নীরব থেকে গেলেও সেটা সম্মতিতেই দাঁড়াত; তারপর কেউ যদি আসে আসুক, সরমার তো কেনা পথ নয়।···আজ একটা যেন লগ্ন ছিল—বলবার যে—'চলো, ফিরে যাই, বাঁধি আমাদের নীড়, এখনও সময় উৎরে যায় নি।···এসোনা, হারিয়ে যাবার কথা নিয়েই বেরিয়েছিলাম, এই গ্রামেই হারিয়ে যাই আমরা দুটিতে···'

"বৌমা!"

—পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, সরমা বাঁ দিকে ফিরে চাইলে।··গোলপাতায় ছাওয়া তিনটি ঘর তিন দিকে, মাঝখানে উঠান, দেয়ালের বালাই নেই। সামনের ঘরের উঁচু সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে আসতে একটি বধূ মাঝের পৈঠাটিতে দাঁড়িয়ে পড়েছে, ঘরের দিকে রাঙা পাড়ের ঘোমটা একটু বাঁকানো।···কি উত্তর দিচ্ছে, চাপা গলায়; বাড়িতে কোথাও নিশ্চয় বর রয়েছে।

এইটুকুই চিত্র। খানিকটা তার কল্পনাই, কিন্তু সরমা অভিভূতের মতো রইল দাঁড়িয়ে।··সেই কলেজের দিনের ঠাট্টা করে "বৌমা" বলে ডাকা সবার।·· সত্যই এই সম্ভাবনাই ওর মধ্যেও ছিল নাকি কোনদিন স্বপ্ন, এই অবগুণ্ঠনের মতোই নব-যৌবনের একটি সন্নত ব্রীড়ার অন্তরালে?···দাঁড়িয়েই আছে, কী একটা আবেগে সামনের পা একটু উঠে পড়ল—যাবে একবার, আর কিছু না, দুটো কথা কইবে—নৈলে যেন বাঁচে না।

হুঁশ হোল; পা'টা টেনে নিয়ে দাঁড়িয়েই রইল।···না, এ চলবে না, সে-অধিকার ও চিরতরেই হারিয়েছে। ওর পদস্পর্শে গৃহস্থের অঙ্গন হবে কলুষিত। হয়তো বধূটি তুলসীমঞ্চে দীপ জ্বেলে দিতে চলেছে, সরমা গিয়ে কথা কইলেও তার সারা অঙ্গ হয়ে উঠবে অশুচি।

কে যেন কষাঘাত করে সরমার মুখটা নদীর দিকে দিলে ফিরিয়ে। ম্লান নত দৃষ্টি নিয়ে ও আরও অনেকটা দূরে নদীর ধারটিতে গিয়ে বসল।

হারিয়েই গেছে। বাস থেকে ওরা হর্ণ দিয়েছিল, শুনতে যে পায় নি—তার কারণ শুধু এই নয় যে সে এসে পড়েছে অনেক দূরে।···সন্ধ্যা হয়ে গিয়ে যখন

জ্যোৎস্না স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন দলের কয়েকজন ওকে এইখানে করলে আবিষ্কার।

আর পারছে না সরমা; ভগবান তাকে মুক্তি দিন; কোথায় তাঁর ক্ষমা? সে-বিশ্বাস ভেঙে গেলে তার উপায় কি হবে?

একটি ভুল, তারই ওপর ভগবান তাঁর শেল হেনে যান—আরও সফলতাই আসে, আরও সমাদর, আরও অর্থ, মর্যাদা···

কবে কার উদ্দেশে একটি ছোট্ট ডাক শুনে মনে কি হয়েছিল তা মন থেকে যায় মিলিয়ে। না হয় তাই যাক সব মুছে—মিটে মিটে, স্রোতে গা এলিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুক; তাও তো কৈ হয় না?

একদিন কী মনে হোল, নিজেরই একটা ছবি দেখতে গেল—একা। এ ছবিটায় তার প্রধান ভূমিকা তো নয়ই, এমন কি বেশিও কিছু নেই, মাঝামাঝি দু'টি দৃশ্যে খানিকটা সংলাপ, একটি নাচ আর একটা গান আছে। সিনেমাটা উৎরে গেছে, শুনছে প্রধান আকর্ষণ হয়েছে নাকি ঐ দুটি দৃশ্য। টেলিফোনে ফার্স্ট ক্লাসের মাঝামাঝি একটা জায়গা রিজার্ভ করে রেখেছিল—কেমন একটা সাধ হয়েছে, সবার মধ্যে অপরিজ্ঞাত হয়ে চারিদিকের মতামত শুনবে। যখন আরম্ভ হয়ে গিয়ে প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার, সেই সময় সরমা এসে প্রবেশ করল। পোষাক-প্রসাধনের দিক দিয়েও নিজেকে লুকুবার একটা প্রয়াস আছে।

এ ক্লাসটায় ভিড় নেই তেমন, তবু কিছু কিছু কানে আসছে। সামনে কাছাকাছি কোথাও দুজন বন্ধু ব'সে আছে—তাদের মাঝে মাঝে মতামত, চিনেবাদাম ভাঙার শব্দের সঙ্গে। অনুকূলই। একজন বারতিনেক দেখেছে, বন্ধুকে দেখাতে নিয়ে এসেছে, কথাবার্তায় টের পাওয়া গেল সরমারই নাচগানটুকু প্রধান লক্ষ্য।

ঠিক পেছনেই আছে একটি দম্পতি, কম বয়সের। তাদের কথা বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে; ফিস্ ফিস্ আওয়াজ, বিরাম নেই বললেই চলে—

"এ কী এমন জিনিস!—সেই তো থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়। ভাল্লাগ্‌ছে না।"

"একটু স্থির হয়ে দেখো না, অত উতলা হ'লে চলে? জমে আসছে তো প্লট।"

"আমিও জমে আসছি—শীতে। ভালো লাগবে তবেতো।"

"তোমার ভালো লাগানো যে কত শক্ত! পিসিমার সঙ্গে কালীঘাটে গিয়ে কপালে একগাদা সিঁদুর মেখে আসতে পাবতে তো ··"

"আমি এই উঠলাম!"

"বোস', বোস'···কী ছেলেমানুষী কর!"

"ফের যদি ঐ সব বলো তো যাবই উঠে ··ভাবী তো পথ—একলাই চলে যেতে পারব।"

"বোস চুপ করে, লক্ষ্মীটি।"

একটু চুপচাপ গেল। কয়েকটা দৃশ্য গেল বেবিয়ে।

"কেমন লাগছে এবার?"

"তুমি ও-ধরণের কথা যদি আর বলো "

"আচ্ছা, বলব না। · জমে আসছে না?"

"ছাই জমে আসছে। ··আমি মা কালীব কাছে মনে মনে মানৎ করলাম দুজনে গিয়ে নাকে খৎ দিয়ে পূজো দিয়ে আসব, অপবাধ নিও না মা।··· যেতে হবে।"

"যাব; কিন্তু অপরাধীকে সামনে দেখলে তো আবও চটেই যাবেন; ·· উঃ! · উঃ!—লাগে! ··আচ্ছা যাব গো! · এইবাব দেখো গো একটু চুপ করে, অরুণার নাচটা আসছে;"

"কে অরুণা?

"কেন, সেদিন দেখলে না 'ছায়া-বীথি'তে? প্রশংসাও তো করলে অত, ভুলে গেছ এর মধ্যে?"

"ও! বুঝেছি; সেই জন্তেই আসা! ··না, আমার মনে অত দাগ কেটে বসে

যায় নি তোমার মতন।···অরুণার নাচ! তাইতো বলি!···উঠতে অরুণা, বসতে অরুণা ··”

সিঁদুরে—অভিমানে—ঈর্ষায় চমৎকার লাগছে—এক সঙ্গে কত রকম সুর, ওর ওপর প্রশংসা; অরুণার মন এখন ওদের সঙ্গেই।

“চুপ করো লক্ষ্মীটি; এই দেখো—এসে গেছে সেই সীন্‌টা।···নাচে ভালো লেছি, সেটুকুও তোমার সইবে না, এরকম ক'রে তো···”

এমন সময় সামনে বোধ হয় থার্ড ক্লাস থেকে হঠাৎ একটা চীৎকার উঠল—“দিদি!! দিদি!! আমার দিদি!!”

“এই! এই! থামো!”

“না, আমার দিদি!! আমি যাব দিদির কাছে!!···”

আওয়াজ শুনে মনে হোল ছিটকে বেরিয়ে গেছে। রব উঠল—“আলো জ্বেলে দাও!·· লাইট! লাইট!”

আলো জ্বালতে জ্বালতে সে ততক্ষণ স্টেজের নিচে চলে গেছে, তাকে ধরে ফেলেছে দু'তিনজনে, চেঁচাচ্ছে—“আমার দিদি!! আমার দিদি!! আমার দিদি ছিল!! নিয়ে চলো আমায়!!”

নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য কুঁজো হয়ে ছটফট করছে!

এদিক থেকে একটি বাইশ-তেইশ বছরের যুবা গিয়ে পৌচেছে ততক্ষণ। হাতটা ধরেছে। সবাই বুঝেছে ট্র্যাজেডীটা; মন্তব্য হচ্ছে—“কেন ওকে নিয়ে আসা মশাই?·· কে হয় আপনার?···যেও দিদির কাছে খুকি, এখন চলে এসো··· ও-দিদির কাছে আর যেন না যেতে হয় মশাই·· কী যে সর্বনাশ হচ্ছে চারিদিকে!··”

যুবকটি মেয়েটিকে নিয়ে নিঃশব্দে ওদিককার দরজা দিয়েই আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

সরমা কাঠ হয়ে বসেছিল এতক্ষণ। অনেকে উঠেছে; কৌতূহলবশে এগিয়েও গেছে অনেকে; ও পারে নি।

মিনিট তিন-চারেক ব্যাপার, তারপরেই আলো নিভে চিত্র আবার আরম্ভ হোল।

সরমা তেমনি একভাবেই বসে রইল।···কে ছিল মেয়েটি? তারই বোন সুরবালা? বয়স তো এই রকমই হবার কথা; তার মূঢ় আতঙ্কিত দৃষ্টি দিয়ে ভালো করে দেখবার উপায় ছিল না, তিন চারজনের ধরাধরির মধ্যে ছটফটও করছিল মেয়েটি, দূরেও; তার পরেই চলে গেল ঘর থেকে···কে ছিল?·· বাবা তার ভাই বোন তিনটিকে ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন, হয়তো নেইও আর এ-পৃথিবীতে।··· এখন তাদের এই দশাই নাকি? অপরিচিতের আশ্রয়ে ··হয়তো একজায়গায়ও নয়, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত। সুরবালার রূপ আছে, হয়তো বোকামি করে তাই আশ্রয়দাতা নিয়ে এসেছিল—দিদির কৃতিত্ব দেখিয়ে আকৃষ্ট করবে সিনেমার দিকে।

একটু সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়ই প্রায়; এই সীনে তার সঙ্গে আছে কুসুম, নূতন এসেছে, তারই বোন নয় তো?···পুরো সম্ভাবনা আছে, কিন্তু কী যে মনের অবস্থা হয়েছে, কোন অবলম্বনই যেন আঁকড়ে ধরতে পারছে না, নিজের জীবনই চারিদিক থেকে যেন ঘিরে দাঁড়িয়েছে। কী সর্বনাশ হোল!—যতটা ভেবেছিল তার চেয়ে কত শতগুণ বেশি!···এক সময় মনে হয়েছিল—একলাই তো, নিজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সরে দাঁড়াই নিজের তেজে; সেই তেজ আজ এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

একবার ইচ্ছা হয়েছিল এগিয়ে যেতে, তারপর ওরা বেরিয়ে যেতে, বাইরেও চলে গিয়ে দেখতে, কে? সাহস হোল না, যদি সুরবালাই হয়!—শতসহস্র দৃষ্টির লাঞ্ছনার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে বুক গেল কেঁপে; দুবছরের মর্ম-নিংড়ানো ব্যথা একটি মুহূর্তের মধ্যে জমে উঠেছিল; কিন্তু পারলে না। ··যদি কুসুমেরই বোন হয় তো— সামনে এখনই তার পাশে সরমাকেও যে তারা সবাই দেখলে সিনেমার পর্দায়। যে-দৃষ্টি একটু আগেই ছিল প্রশংসায় সমুজ্জ্বল সেই দৃষ্টিই এখন, কুসুমকে সামনে না পেয়ে, তারই ওপর বিষ-উদ্গীরণ করবে।··· পারলে না।

অত সাধ করে দেখতে আসা নিজের দুটো সীন—কখন্ যে বেরিয়ে এসেছে টেরও পায় নি। অনেক পরে, যখন একটু হুঁশ হোল, আলোর ভয়ে চোরের মতোই অন্ধকারে-অন্ধকারে বেরিয়ে গেল সরমা।

কলকাতা ভালো লাগছে না, বিষ বাষ্পে যেন ভরে উঠেছে কলকাতা, হাঁপিয়ে উঠেছে সরমা। ইচ্ছে করছে এ জীবন ছেড়ে দিই, কোথাও পালাই, বাবার মতো অজ্ঞাতবাস। পোটা দুই ভালো কন্‌ট্র্যাক্ট নেয়ও নি ; কিন্তু পালাবে, কোথায় ? যেখানেই যাক, নিজের জীবন যে ওর সামনাসামনি হয়ে দাঁড়ায় ; এ শত্রু যে ছায়ার চেয়েও অনতিক্রম্য।

কলকাতার জীবন অন্যদিক দিয়েও অসহ্য হয়ে উঠেছে। যত প্রতিপত্তি বাড়ছে ততই ঈর্ষাও পাচ্ছে বৃদ্ধি চারিদিকে, শত্রুর সংখ্যা যাচ্ছে বেড়ে। সোনাদি তো উঠে-পড়ে লেগেছে ; ন্যায়-ধর্ম তো তারই দিকে—সেই না একদিন সরমাকে এইখানে পথ দেখিয়ে আনে ! তারই পায়ে মারবে ছোবল !

সবচেয়ে বড় কথা আর যুদ্ধ করার স্পৃহা নেই সরমার, এমন কি বিনা যুদ্ধে যেন পরাজয়ই মেনে নিতে চায়।

সে বড় সর্বনাশের কথা ! ওর মিত্রও তো আছে, তাদের সংখ্যাও বেড়েছে, সিনেমা-জগতে একটা উজ্জ্বল তারকা, সে যদি এইভাবে অবলুপ্ত হয়ে যায় !·· ঠিক এই রকমের একটা অবস্থা আসে, তাদের জানা। দুটো বছর তো কিছু নয়, আগেকার জীবনটা থাকে কাছে, স্মৃতি মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠে আনে অবসাদ, আনে নিস্পৃহতা, এই জগতের জটিলতায় অনভিজ্ঞ হওয়ার জন্যই শত্রুদের বাণ কাটাবার মন্ত্রও থাকে অনধিগত। এই ঝোঁকটা কাটিয়ে নিতে পারলে আবার একটানা বেশ চলে যায় শেষ পর্যন্ত।

মিত্রপক্ষ সতর্ক ছিল এবং সচেষ্টও ছিল।

বম্বে থেকে একদিন একটা প্রস্তাব এল—নায়িকার ভূমিকা না হলেও বেশ বড় ভূমিকাই, একটা হিন্দী চিত্রে। অর্থের দিক দিয়ে চুক্তি-মূল্য এখানকার একটা মূল ভূমিকারই মতো।

সরমা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কলকাতা থেকে মুক্তির সম্ভাবনায় ওর সিনেমা জীবনেই আবার একটা আস্থা ফিরে এল যেন!·· এই জীবনেই একটা নূতন ধারা সৃষ্টি করা যায় না দূরে গিয়ে?···দেখাই যাক না।

কিছু কিছু কন্‌ট্রাক্ট এখনও রযেছে কলকাতায়। কাজ আরম্ভ হয়নি, এমন গোটা তিন কাটিয়ে নিতে পাবলে চেষ্টা-চরিত্র করে। গোটা দুইয়ে ওর কয়েকটা শুটিং হয়ে গেছে, বাকী যাওয়া-আসা ক'রে সেরে নেবে। ও সহানুভূতি পেলে প্রায় সবার কাছেই।

বম্বে থেকে কলকাতাতে এসেই পার্টি একদিন চুক্তি ক'রে গেল।

এর পর থেকেই কোনও এক অদৃশ্য হস্ত ওর গতি নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে।

বম্বে মেলেই যাবার কথা, কিন্তু হঠাৎ একটা নূতন চুক্তি পেয়ে গেল। ওর যাবার দুদিন আগে মধুপুর নেমে. কাছাকাছি পাহাড় অঞ্চলে একটা শুটিং; দুটো দৃশ্যে, তাইতেই শেষ। সরমার তেমন ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু খাতিরে পড়ে গেল, মোটা টাকাও পাচ্ছে এটুকুর জন্য। শেষ পযন্ত রাজিই হয়ে গেল। ঠিক গেল আর এদিকে না ফিরে শুটিং সেরে মধুপুরেই গাড়ি ধরে একেবারে মোগলসরাইয়ে গিয়ে বম্বে মেল ধরবে।

সেই গাড়িটাই এই অভিশপ্ত গাড়ি।

এর পরেই ওর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সুকুমারের অভিজ্ঞতা মিলে যায় অনেকখানি। ইঞ্জিনটা আসানসোলের সেই এক ঘণ্টার বিলম্বটা কমিয়ে চল্লিশ মিনিটে নিয়ে এসেছে। উৎসাহ গেছে বেড়ে, মধুপুরের অল্প বিরতিটুকু থেকেও কযেক মিনিট বাঁচিয়ে নিয়ে আবার উন্মত্ত বেগে ছুটল। এই ধরণের অতি দ্রুত গাড়িগুলাতে চড়া একেবারেই অভ্যাস নেই, তায় এই অবস্থা; ক্লান্তির সঙ্গে ভয়েও অবসন্ন হয়ে সরমা যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, জেগে উঠল একেবারেই একটা খণ্ড প্রলয়ের মধ্যে।

আঘাত লাগেনি, সুকুমারের যেটুকু লেগেছিল সেটুকুও নয়, ও শুয়েছিল

একেবারে শেষের গাড়িটায়, যেটাতে ছিল বীরেন্দ্র সিঙের ছেলে আর পুত্রবধূ, তবে সেই একই কামরায় নয়।

ওর গাড়িতে ছিল একটি পাঞ্জাবী পরিবার। ঘুম ভেঙেই দেখে কর্তা সবাইকে নামাচ্ছে, গাড়ি অন্ধকার, একটা চেঁচামেচি পড়ে গেছে। বাইরের যে আওয়াজ সে রকম কথাও কিছু শোনেনি সরমা, জিগ্যেস করলে কি হয়েছে?

"অ্যাক্সিডেণ্ট্...নেমে পড়ো তাড়াতাড়ি সব ..এগাড়িটা মনে হয় দাঁড়িয়েই আছে, তবে নেমে তফাতে সরে যাওয়াই ভালো"—নামাবার সঙ্গে সঙ্গে বলে যাচ্ছে।

আত্মরক্ষার সহজ প্রেরণাতে সরমা হাতের ব্যাগটা নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল —ওদিকটা ওদের ভিড়, উল্ট দিক দিয়ে। নেমেই মাথাটা যেন গুলিয়ে গেছে, সামনের বিভীষিকা যেন আকৃষ্ট করছে।—কারা কাঁদে! · কি হোল?—খানিকটা এগিয়ে কিন্তু পালাবার যুক্তিটাই প্রবল হয়ে উঠল; যা দেখছে স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানছে, সহ্য করতে পারছে না। খানিকটা ঘুরে ফিরে, মাড়িয়ে, পাশ কাটিয়ে কিন্তু তখন দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে গেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার, মস্তিষ্ক কাজ করছে না। এক সময় আন্দাজে প'ড়ে উঠে, ঢালু বেয়ে বাঁধের নিচে চলে এল; তখনও কিন্তু দিকভ্রান্তিটা ঘোচে নি; একটা আবছায়া ধারণা আছে নিজের গাড়িটার দিকে ফিরে যাচ্ছে, তারপর একটু এগিয়েই চোখে পড়ল ইঞ্জিনের গহ্বরে সেই আগুনের শিখা।· আর কিন্তু ইচ্ছা নেই সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে ফিরে যেতে—সাহস নেই বলাই ঠিক। গাড়ির মধ্যে ট্রাঙ্ক আর বিছানাটা পড়ে রয়েছে, কিন্তু সে তুটোর মায়া নেই আর। সামনেই চলল। গল্প শোনা, কোম্পানীর লোক নাকি যারা বেঁচে যায় তাদেরও মেরে ফেলে, মোকদ্দমার সম্ভাবনা কমাবার জন্য। কে জানে সত্য কি মিথ্যা, কিন্তু মনের ওপর বিভীষিকার যে চাপ তার মধ্যে সে ভয়টাও রয়েছে।

নিচে নিয়ে অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে তারপর বাঁধের ওপর উঠল।...অগ্নিগর্ভ ইঞ্জিনটাকে যেন বিশ্বাস হয় না; যেন ধ্বংস-প্রাপ্ত একটা যন্ত্র নয়, একটা আহত দানব, মৃত্যু যন্ত্রণার বিক্ষেপেই হঠাৎ খানিকটা ছুটে আসতে পারে।...সবই

'বিশ্বাস হচ্ছে আজ মন নিজেকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার ক্ষমতাটা একেবারে হারিয়েছে।

এগিয়ে চলল। চোখ তুলতে সাহস হচ্ছে না, পারছেও না, রাস্তার যা অবস্থা। কী অন্ধকার! পেছনের ক্ষীয়মান আর্তধ্বনির গায়েই কী বিপুল স্তব্ধতা!...কোথায় চলেছে সে? অন্ধকারে দৃষ্টি স'য়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দুদিকে জঙ্গল স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সামনে দূরে দূরে জমাট অন্ধকারের মতো ওগুলো কি?...ও! পাহাড়। ঠিক তো পাহাড়ে জায়গায়ই যে।.. বুকটা এমন ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল!

এর পরেই অন্য এক রকমের ভয় এসে মনটা অধিকার করে ফেললে—এই যে এত বড় একটা মৃত্যু উৎসব হয়ে গেল বনভূমিকে শ্মশানে পরিণত করে দিয়ে... চিন্তা এগুতে সাহস করছে না—গা'টা ছমছম করে যেন অবশ হয়ে আসছে—একটা মাত্র একুশ বাইশ বছরের মেয়েই তো...দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপরেই—ওকি!... একটি অন্ধকারের ঋজু রেখা লাইনের ওপর দিয়ে—এগিয়ে আসছে কি চলে যাচ্ছে ঠিক বোঝা যায় না—কিন্তু সচল।· সরমা পা তুলতে পারছে না। যে ভয়টা উঠেছিল তাতেই সম্মোহিত হয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইল—দৃষ্টিটা অন্ধকার ঠেলে ঠেলে এগুবার চেষ্টা করছে—স্পষ্টতা একটু বাড়ল—না, এগিয়েই যাচ্ছে, একটা ছায়া-মূর্তি লাইনের ওপর দিয়ে লঘুচরণে এগিয়ে চলেছে!

মানুষও তো হতে পারে, তারই মতো বিভীষিকার আতঙ্কে পালাচ্ছে।

একটু যেন সাহস পাচ্ছে, সরমা প্রাণপণে শক্তি দিয়ে এই সম্ভাবনাটুকুকে বিশ্বাসে পরিণত করবার চেষ্টা করছে ··নিশ্চয় মানুষই হবে। পা বাড়ালে।...মানুষই নিশ্চয় —বহুদূরে রয়েছে বলে যেন মনে হয়, ঠিক যেখানে অন্ধকারটা জমতে জমতে একেবারে নিবিড় হয়ে উঠেছে। বোধহয় যেন সরমা লাইনের যে দিকটা ধ'রে চলেছে তার অপর দিক ধরে এগুচ্ছে মূর্তিটা, একটু কাছাকাছি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে—যদিও এখনও অনেকদূরে—পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না...যদি থাকেই পায়ের শব্দ।

তারপর বিশ্বাসটা যখন একটু দৃঢ় হয়ে এসেছে, একটা কাণ্ড হোল। চলা পথটুকুতে লাইনের পাথর গেঁথে গেঁথে গেছে, ওদিকে মনটা যাবার জন্যই বোধ হয়

একটা ঠোক্কর লেগে সরমা পত-পড় হয়ে সামলে নিলে—খড়-খড় করে লাইনের কতকগুলা পাথর পড়ল গড়িয়ে। পায়ে একটু চোট লেগেছে, জুতার মধ্যে ; খুলে দেখতে যাবে, খেয়াল হোল, না, ততক্ষণ লোকটা আরও এগিয়ে পড়বে। তখুনি সোজা হয়ে উঠে পা বাড়ালে।

কিন্তু কোথায় সে মানুষ!

শরীরটা এবার আরও অবশ হয়ে গেল সরমার, বোধ হয় সব মিলিয়ে দশ সেকেণ্ডও যায় নি যে সে চোখ ফিরিয়ে ছিল—কোথায় সে মানুষ! বিশ্বাসটা ওর একেবারে গেল উল্টে। ওর মনে পড়ল এমনই তো হয়—সদ্যমুক্ত, নিঃসন্দিগ্ধ বিদেহী আত্মা পৃথিবীর আকর্ষণেই মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে চলেছিল, ঐ একটুখানি শব্দে মানুষের উপস্থিতির কথা টের পেয়েই সচকিত হয়ে আবার গেছে বায়ুতে মিলিয়ে। কিন্তু এখন আর উপায় নাই ; ফিরে যাবে কোথায় সরমা? তার মনে হচ্ছে এখন চারিদিকেই এই। মনে হচ্ছে দৃষ্টি ফেরালেই দেখবে এ মহাশ্মশান থেকে অশরীরী-দের দীর্ঘ নিঃশব্দ ছায়া-মিছিল আসছে উঠে—একটা নিরন্তর স্রোতেই।...নিরুপায় হয়ে, চরম আশঙ্কায় যে সাহস—তাইতেই ভর করে ও এগিয়ে চলল সামনের দিকে। যেখানটা মনে হয়েছিল মূর্তিটা মিলিয়ে গেছে সেখানটা যে কী করে অতিক্রম করলে, নিজেই বুঝতে পারলে না। গতি দিলে আরও বাড়িয়ে—দূরের আর্তনাদ খুব ক্ষীণ হয়ে এসেছে, সেও যেন শব্দের প্রেতাত্মাই।

পাহাড়ের সেই গলিটা এসে পড়ল; ত'র মুখেই সিগন্যালের লাল আলো, বরাবর একরম মাথা নিচু করে আসছে বলেই এতক্ষণ দেখতে পায় নি। সাহসটা ফিরে এল, সামনে কিছু দূরে একটা স্টেশনেরও আলো যায় দেখা। ছুটতে ইচ্ছা করছে —নিঃসন্দেহভাবে মানুষ কাছে পেয়ে চেঁচাতেও ইচ্ছা করছে এখান থেকে ; শুধু শক্তির অভাবে কোনটাই পারলে না।

স্টেশন নয়, তবু মানুষেরই কণ্ঠস্বর।

সরমা গিয়ে হল্ট-কীপারের রামায়ণ পাঠের মধ্যে দাঁড়াল।

ছাব্বিশ

প্রায় এক নিঃশ্বাসেই সমস্তটুকু বলে গিয়ে সরমা থামল।

সুকুমারও একরকম নিঃশ্বাস বন্ধ করেই সমস্তটা শুনেছে, একটা প্রশ্ন করে নি, থামলে প্রশ্ন করলে—"তার পর ?"

"তার পর আমার পাপের বোঝা আরও বেড়ে গেছে, প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে আরম্ভ ..."

"কিন্তু অরুণা..." —বোধ হয় খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়াতেই সিনেমার নামটাই বেরিয়ে গিয়ে থাকবে।

সরমা বললে—"আর অরুণা কেন ? তুমি সরমাই বলো ; আমি অনেক যত্নে এ-নামটাকে রুমালে একটি অক্ষরের মধ্যে আগলে বেড়িয়েছি এই দুটো বছর।"

"ঠিক তো, দেখো ভুল !...কিন্তু, আমি আশ্চর্য হচ্ছি তোমার সমস্ত স্মৃতিটুকু তো ফিরে এসেছে !...কখন্, কি ক'রে হোল এটা ?"

ও যেন সেইটেই বেশি ক'রে লক্ষ্য করছিল আগাগোড়া, মুখটা বিস্ময়ে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সরমার মুখটা ঠিক সেই অনুপাতেই হয়ে উঠেছে করুণ, বললে—"স্মৃতি তো যায় নি, এক কণাও নয়, এত পাপের ওপর কি ভগবানের অত দয়া পাওয়া যায় ? প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তে আমি জ্বলে মরেছি স্মৃতির আগুনে।"

"সে কি ! তুমি নাম ধাম—আগেকার জীবনের সব কিছুই কি ভুলে ছিলে না এতদিন ?...তবে !"

সরমা মুখটা ঘুরিয়ে নিলে, একটু পরেই সুকুমার টের পেলে সে কাঁদছে। কি বলবে ভেবে উঠতে না পেরে চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ যাবার পর সরমা চোক দুটো মুছে নিয়ে শরীরটা আলগা করে দিয়ে সামনে চেয়ে বসে রইল একটু ; শুধু

একটা দীর্ঘশ্বাসে নিস্তব্ধতাটুকু একবার ভঙ্গ হোল, তারপর বলতে লাগল—"তবে •... সে তো বললাম—পাপের বোঝা আরও বাড়িয়েই তুলেছি।...সব বলব, বলবার জন্যেই তো এনেছি, তোমারও দয়া যে শুনতে রাজি আছ। আমার কি ভয় ছিল জান ?—ভয় ছিল যে এই পর্যন্ত শুনেই তুমি ঘেন্নায় উঠে যাবে।...সব বলব আমি, কিন্তু একটা অনুরোধ, শেষ পর্যন্ত তোমার ক্ষমায় আমার অধিকার নেই, শুধু একটা বিশ্বাস রেখো, আমি যা করেছি, শুধু মানুষের মতন হয়ে একটু বাঁচবার লালসায় করেছি...যদি শেষ পর্যন্তও তোমার পাশে স্থান পেতাম, তোমার জীবনে কোন দাগই লাগতে দিতাম না...উঃ, বাবাগো!"

আবার চোখে অশ্রু নামল।

সুকুমার সান্ত্বনার স্বরে বললে—"কেঁদো না সরমা। না হয় নাই বললে; এটাও বলবারই বা কী এমন দরকার পড়েছিল ?"

খানিকটা অশ্রু নেমে গিয়ে মনটা হালকা হোলে সরমা বলতে আরম্ভ করলে—"হল্টে এসে সুস্থ মানুষের সঙ্গ পেয়ে ভরসা ফিরে এল; তখন চিন্তা উঠল এবার কি করব। একা মেয়েমানুষ, প্রথমটা একটু ভয় হয়েছিল. কিন্তু দেখলাম লোকটা প্রকৃতই ধার্মিক, গোড়াতেই আমায় 'মাঈ' বলে ডাকলে; তেষ্টা পেয়েছিল, উঠে গেলাসটা ধুয়ে জল দিলে, তারপর সেই চারপাই-পাতা খুবরিটার সামনে নিয়ে গিয়ে বললে—সে আর কিছুই সাহায্য আপাতত করতে পারবে না, যদি ক্লান্ত হয়ে থাকি তো সেই চারপাইয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোতে পারি, রিলিফ-ট্রেন এলে সে তুলে দেবে।

ঘুমুবে কে ? আমি নিজের ভাবনা নিয়ে পড়লাম। ঠিক এইরকম অবস্থায় তো কখনও পড়িনি—এতবড় একটা বিপদ, একটা পুনর্জন্মই; তারপর এইরকম একটা শান্তির মধ্যে রামায়ণ পাঠ চলেছে; আমার মনটা সে রাত্রে ক্রমাগতই উথলে উথলে উঠছিল, তারই পাশে পাশে মনে পড়ছিল সেই কলেজের সময় থেকে আমার নিজের জীবনটা। তোমায় বলেইছি, আমি আর পারছিলাম না—ক্রমাগতই মনে হতে লাগল আবার তো সেই জীবনেই যাচ্ছি ফিরে—কলকাতা থেকে একরকম পালিয়ে বম্বে যাচ্ছি, কতকটা মুক্তিরই আশায়—কিন্তু সেখানকার জীবন তো আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে! এই সব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ

একটা খেয়াল কি করে এসে গেল মাথায়—কেন, এই তো মরেই যাচ্ছিলাম !···এই চিন্তাটা ধরেই আমার মাথায় একটা আইডিয়া বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল আস্তে আস্তে—হোক না এইটিই মৃত্যু আমার। আমি যে ও-জীবনটা ছাড়তে পারছিলাম না তার কারণ যেখানে গিয়েই লুকোই, আমার জীবনই একসময় না একসময় আমায় ধরিয়ে দেবে। কিন্তু এতো বেশ হোল—সবাই জানে, কাগজে পর্যন্ত রটে গেছে আমি বম্বে মেলে সোজা বম্বে যাই নি; মধুপুবে নেমে একটা শুটিং শেষ করে ঠিক সেইদিনই বেরুবাব কথা—যেদিন অ্যাক্সিডেণ্টটা হোল। শুধু তাই নয়, পার্টির সবাই এসে তুলেও দিয়ে গেছে ঐ-গাড়িতেই; সুতরাং প্রমাণের তো কিছু আর বাকি নেই যে অরুণা মরেছে; এখন শুধু নিজের কাছে মরা। ঠিক ক'রে ফেললাম এখান থেকে বেরিয়ে একেবারে দূরে কোথাও যাব চলে আপাতত। কোথায়, কিরকম ক'রে, তাই মনে মনে ঠিক করছি, এমন সময় কানে গেল একজন যেন বাঙালী এসে হণ্ট-কীপারের সঙ্গে কথা কইছে। আমি ভয়ে আঁৎকে রইলাম, ধরা বুঝি এখুনি যাই পড়ে। তুমি চলে গেলে; নিশ্চিন্দি হয়ে বসেছি, দেখি লোকটা আবার বেরিয়ে গিয়ে তোমায় ডাকলে—আর ডাকলে আমারই খবর দিয়ে। তখন কি করে আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল—শক্ লেগে আগেকার জীবনের সব ভুলে যাওয়ার কথা—যা একটা অবস্থা যাচ্ছে, এক রাশ প্রশ্ন হওয়াই সম্ভব—বাড়ি ঘর দোর, কে কোথায় আছে তাদের খবর দেওয়ার কথা—মিথ্যে বানিয়ে বলতে যাওয়ায় বিপদ অনেক—তার চেরে ওদিকটা একেবারে মুছে দেওয়াই নিরাপদ। তুমি আসা থেকেই মুখের ভাবে আরম্ভ ক'রে দিলাম। দেখলাম তুমি প'ড়েই গেছ ধাঁধায়। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করে নিশ্চিন্দি হলাম—তুমি আমায় চিন্তে পারনি—হয় আমার কোন ছবি দেখাই নেই, না হয়···"

সুকুমার বললে—"দেখাই নেই। আমি ছবি দেখি কম, যা দেখি তাও ইংরিজী ছবি। বাংলা নাম-করাও গোটা দুই দেখে বড্ড হালকা লাগে, আর যাই নি। কিন্তু আশ্চর্য! শক্ লেগে ভুলে যাওয়ার যেরকম নিখুঁত···"

"হয়েছিল কি সত্যি তেমন নিখুঁৎ—এতক্ষণে খুব সামান্য একটু হাসির মতো ফুটে উঠল সরমার ঠোঁটের কোণে, যেন নিজের প্রবঞ্চনাকেই ব্যঙ্গ করে। তারপর

আসব। এখন যান তাড়াতাড়ি। আমার স্বামী বাগানে, নিশ্চয় দেখেও থাকবে আপনাকে। আমায় যদি জিগ্যেস করে বসে, একটা কথা জেনে নিতে এত দেরি হয় বিশ্বাস করাতে পারব না ওকে। যান।"

তিনদিন পরে রুম্মার সুযোগ হোল। দূরের সাঁওতাল পল্লীতে একটা পূজা-উৎসব ছিল। সর্দার-সর্দারণী হিসাবে দুজনের যাওয়ার কথা, রুম্মা অসুস্থতার ভান করে কাটিয়ে দিলে, ঝংড়ু গেল একা।

রাত্রি যখন প্রায় একটা, সমস্ত পল্লীটা একেবারে নিষুপ্ত, মৃন্ময়ের শোবার ঘরের জানালায় বার দুই তিন খট্ খট্ ক'রে শব্দ হোল।

প্রশ্ন হোল—"কে ?"

"আমি।"—চাপা গলায় উত্তর হোল।

রুম্মার গলা যেন; তাড়াতাড়ি সন্তর্পণে উঠে মৃন্ময় দরজা খুলে বাইরে এল। রুম্মাই; কৃষ্ণসর্পী অন্ধকারের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছে। মৃন্ময়ের পেছনে পেছনে তার শোবার ঘরে গিয়ে উঠল, তারপর পিঠ দিয়ে দরজাটা চেপে দাঁড়াল। বললে—"আপনি বসুন ··ঐ কুশন চেয়ারটায়।"

"তুমি বসবে না ?"

"দাঁড়িয়েই থাকি না।"

অদ্ভুত দেখাচ্ছে রুম্মাকে। ঘরের অল্প-শক্তির নীল আলোটা জ্বালা ওর পরণে খাটো সাঁওতালী শাড়ি, এলো খোঁপায় প্রস্ফুট জবা—সমস্তটুকুর ওপর সেই আলোর দীপ্তি গিয়ে পড়েছে, ওকে যেন একই সঙ্গে করে তুলেছে বাসনাময়ী আর রহস্যময়ী।

রুম্মা কিন্তু গম্ভীর। চোখ দুটো স্থির, তার ওপর নীল আলোর দীপ্তি পড়ে এমন অস্বস্তিকর বোধ হচ্ছে যে অনেক কথা বলবার থাকলেও মুখ দিয়ে যেন বেরুচ্ছে না মৃন্ময়ের। তবু চেষ্টা ক'রে বললে—"এলে—অথচ বসবে না ?"

"আমি এসেছি আপনাকে সাবধান করতে, আপনি ভুল পথ ধরেছেন।"

"পথটা তো ভুলই কিন্তু ··সাবধান ··সে কার সম্বন্ধে ?"

"আমার স্বামীর সম্বন্ধে; সে টের পেয়েছে আপনার মনে কি আছে, অন্তত সন্দেহ হয়েছে তার।"

"থাকব সাবধান ··সাবধান ক'রে দেবার জন্যে তোমায় ধন্যবাদ।"

"তাহলে আমি যাই এখন।"

ফিরে দোরটা একটু খুলতেই মৃন্ময় উঠে দাঁড়াল, এক পা এগুলোও। রুম্মা ঘুরে দাঁড়াল, চোখের মধ্যে থেকে নীল আলোটা ঠিকরে বেরুচ্ছে, বললে—"আপনি এগুবেন না—গায়ে হাত তো দেবেনই না···"

এতটা শাসন সহ্য করা শক্ত, তবু মৃন্ময় নরম গলাতেই বললে—"অথচ তুমি এলে সেজেই।"

সেজে তো আসি নি।···বোধ হয় খোঁপার ফুলটার কথা বলছেন, ওটা পূজো-করা জবা ফুল।···ওটা যে কী আপনাকে একটু মনে করিয়ে দিই—আমার স্বামী যেদিন বাঁধের অবস্থা দেখবার জন্য জলে নেমেছিল, সেদিন তার সঙ্গে যাবার জন্যে তোয়ের হয়ে এই রকমই একটা জবা পরেছিলাম আমি।"

মৃন্ময়ের মুখে একটা ব্যঙ্গ ফুটে উঠল, বললে—"এই সব তত্ত্বকথা শোনাবার জন্যে এত কষ্ট করে এসেছ রুম্মা?—না এলেই তো পারতে···সাবধানই বা কি এত করবার ছিল? তোমরা এক চোখে দাও উৎসাহ, এক চোখে কর সাবধান।"

"ভুল বুঝেছেন, সাবধান করতে এসেছি আমার স্বামীর কথা ভেবে; আমাদের জাতকে আপনি চেনেন না, তারও ওপর আমার স্বামী সর্দার। মান-ইজ্জতের এক চুল এদিক-ওদিক হচ্ছে সন্দেহ হলে ও না করতে পাবে এমন কাজ নেই। তার ফলে তো আমায় হারাতেই হতে পারে ওকে; তার জন্যেই আপনাকে সাবধান করতে এসেছি।"

"সুকুমারবাবুর ওখানে তার মানের এদিক-ওদিক হচ্ছে না?"

"আপনার কথার উত্তর দিতে ইচ্ছে করে না; তবে আমার সেখানে সাজ-গোজের কথা ধরে নিশ্চয় বললেন কথাটা, এর যা অর্থ দাঁড়ায় সেই ধ'রে?"

"মিথ্যে বলছি?"

"তাহলে আর একটু তত্ত্বকথা বলি আপনাকে ; আমাদের জাত নিয়ে—আমরা বনের মুক্ত জীব, আনন্দ যাতে খোলাখুলিভাবে পেতে পারি তাতে আমাদের বাধে না। দিদিমণির বাড়িতে আমার সাজগোজ ঐ রকম একটা জিনিস। শুধু ঐটুকুই নয়—আমাদের জাতেরই যেমন ধর্ম, কোন পুরুষের সঙ্গে কোন মেয়েরই খোলাখুলি কথাবার্তায় যেমন বাধে না, দাদাবাবুর সঙ্গেও তেমনি বাধে না আমার···আর আমার স্বামীও জানে এটা।"

"দাদাবাবু তোমার ভাগ্যবান বলতে হবে।"

"ও-ধরণের ভাগ্যবান আপনিও হতে পারতেন ; ওঁদের বাড়ির বন্ধু হিসেবে আমি জাতের স্বভাবেই আপনার সঙ্গেও সেইরকম কোন সঙ্কোচ না রেখে কথাবার্তা আরম্ভ করি। তার ফল কিন্তু এই দাঁড়িয়েছে, যার জন্যে আমায় আজ এইভাবে হোল আসতে।"

নৈরাশ্যে গায়ে রাগটাই ধীরে ধীরে জেগে উঠছে মৃন্ময়ের ; একজন বন্য নারীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়া, তারপর এই উদ্ধত তিরস্কার, বললে—"রুম্মা, তুমি বড় বড় কথা বলছ, তুমি যে-স্তরের মানুষ তাতে তোমার মুখে ও শোভা পায় না ; তবুও বোধ হয় বিশ্বাসই করতাম যদি তোমার দাদাবাবু আর দিদিমণি—দুজনকেই আমি ভালো ভাবে না জানতাম।"

"কী জানেন আপনি ?···আমায় যা ভাবেন ভাবুন, তাঁদের সম্বন্ধে আপনি একটু বুঝে-সুঝে কথা কইবেন।"—রীতিমতো রুখে দাঁড়াল। একটা কলহেরই ব্যাপার, রাগের ঝোঁকে কথাটা এসেও গিয়েছিল মৃন্ময়ের মুখে ; কিন্তু এখনও সরমার উত্তরটা পায় নি, আশার মতো একটা লেগে আছে মনের এক কোণে ; নিজেকে সংযত করে নিলে।

রুম্মাই তাগাদা দিলে—"বলুন কী ব্যাপার···একটা বানিয়ে। আপনাকে আর একটু চিনে নিয়ে যাই।"

মৃন্ময় ঠোঁটের একটা দিক কুঁচকে মুখের পানে চেয়ে রইল ; সংযতও করবার চেষ্টা করেছে নিজেকে—সরমার দিকে চেয়ে আবার একটা লোভও হচ্ছে—চরম বিপদের কথাটা জানিয়ে দিয়ে রুম্মাকে একরকম ভয় দেখিয়েই আকর্ষণ করা যায় কিনা।

"বলুন···দেরি হচ্ছে বানিয়ে নিতে ?"

"শীগ্‌গির বোধ হয় একদিন শুনবে। এখন শুধু এইটুকু জেনে যাও, তোমার দাদাবাবু-দিদিমণি দুজনেই আমার মুঠোর মধ্যে।"

রুম্মা একটু নিষ্প্রভ হয়েই গেল, মুখের পানে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করলে—"মানে ? ···তাঁদেব অনিষ্ট কবতে পাবেন আপনি ?"

ফল হয়েছে—রুম্মা ভয় পেয়ে গেছে দেখে মৃন্ময় বাড়িযেই দিলে—

"একেবারে ধ্বংস ক'রে দিতে পারি। তাব সঙ্গে এইটুকুও জানিয়ে বাখি, এক বাঁচাতে পাব তুমি ; এর মানেটা নিশ্চয় বোঝ।"

রুম্মা আবার স্থিবদৃষ্টিতে চেয়ে বইল, তবে সেই যে একটু ক্ষণিক আতঙ্কেব ভাব সেটা একেবারে গেছে কেটে, তাব জাযগায় প্রতিহিংসা ঠিকরে বেরুচ্ছে ওব নীল দৃষ্টি দিয়ে। বললে—"ভেতরকার কথা যাই হোক, আপনি কিন্তু বলে ভালো করলেন না। দাদাবাবু দিদিমণি আমাদের ছেলেকে বাঁচিয়েছেন—আমাদের ছেলে, যে বিশখানা গ্রামের সর্দার হয়ে জন্মেছে। ভুল কবলেন ··আপনি যা মানুষ তাতে দুজন নিরীহ লোককে ধ্বংস আপনি স্বচ্ছন্দেই কবতে পাবেন—আমি এই ভয়ই বুকে নিয়ে যাচ্ছি এখন।"

ওর কোমরেব কাপড়ে একটা ছোবা গোঁজা ছিল, বাগেব চোটেই অন্যমনস্ক হয়ে বের কবে ফেলেছে, তার খাপ দিয়েই দবজাটা খুলে হন হন কবে বেরিয়ে গেল।

রুম্মা ওব স্বামীব সন্দেহের কথাটা বানিয়েই বলেছিল মৃন্ময়কে। ভয় দেখিয়ে তাকে তার লোভ থেকে নিরস্ত কবতে, নয়তো সাঁওতাল সর্দার ঝংড়ুর একটু সন্দেহ হলে মৃন্ময় এতদিন বাঁচত না, রুম্মাও নয়। এবাব কিন্তু, রুম্মা সেই সন্দেহকেই তুললে জাগিয়ে। শুধু তাই নয়, সন্দেহ জাগালে যে পরিণামে ঝংড়ুকেও হারাতে হ'তে পারে সে-কথাও গেল ভুলে, মাত্র একটি কথা বইল মনে—এই মৃন্ময় সুকুমার আর সরমার ধ্বংস এনে ফেলতে পারে।

পরদিন বৃদ্ধের এই তরুণী ভার্যা সামান্য একটা ছুতা করে স্বামীর সঙ্গে কলহ বাধিয়ে বসল—অবশ্য দাম্পত্য কলহই, হযও মাঝে মাঝে—আজ কিন্তু তার মধ্যে

এক কণা উগ্র বিষ দিল ঢেলে---এক সময় তীব্র শ্লেষ ভরে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে--"ইস্‌ ভারী সর্দার! ঘরে নিজের মাইয়ার মান রাখতে জানে না, সে করে বাইরে সর্দারি!"

"মান রাখতে জানি না!!"—ঝংড়ু দড়ির খাটিয়াতে শুয়ে শুয়ে চালাচ্ছিল এতক্ষণ, একেবারে সোজা হয়ে উঠে বসল—"কে তুর মানে হাত দিয়েছে?"

"চোখ নাই, আমি চোখ ধার দিই···চিনে নে; মিছে বাহানা করে কে বিকেলে বাসায় এসেছিল—হেঁসে দুটো কথা কইবার লেগে?"

তার পর দিন মৃন্ময়ের আফিস থেকে ফিরতে একটু রাত হয়ে গিয়েছিল। নতুন ঝিল আর বাজারের মাঝামাঝি নির্জন জায়গায় মোটরটা আসতেই পেছনে একটা আর্ত চীৎকার শুনে শোফার ফিরে দেখলে—পাশ দিয়ে একটা তীর এসে মৃন্ময়ের ডান পাঁজরের মাঝামাঝি সমস্ত ফলাটা পর্যন্ত বিঁধে রয়েছে। মৃন্ময় পড়েছে গদির ওপর লুটিয়ে।

ঊনত্রিশ

সমস্ত রাত সুকুমার আর সরমা হাসপাতালে মৃন্ময়ের পাশে বসে কাটিয়েছে। আঘাতটা খুবই গুরুতর; মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল, যাতে মনে হয় তীরের ফলা ফুসফুসটাও আহত করেছে; সুতরাং পরিণাম সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। চিকিৎসার দিক দিয়ে সুকুমারের যতটা সাধ্য করেছে, কলকাতাতেও লোক গেছে একজন বড় ডাক্তার নিয়ে আসতে।

শেষ রাত্রে মৃন্ময়ের একটু সংজ্ঞা হয়। সুকুমার সামনে বসেছিল। একটু চেয়ে চেয়ে চিনলে। হাতটা বাড়াবার চেষ্টা করছে দেখে সুকুমার নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিলে; দুর্বলতার মধ্যে যতটুকু শক্তি আছে তাই দিয়ে মুঠো করে ধরলে মৃন্ময়, তারপর তার চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সুকুমার কানের কাছে মুখটা একটু নামিয়ে বললে—"ঠিক আছে · বুঝেছি।"

মৃন্ময় আবার অচৈতন্য হয়ে পড়ল। সুকুমার সরমাকে বললে—"তুমি এবার যাও, বরং তোমায় দেখলে আরও বেশি চঞ্চল হয়ে উঠবে ব্রেণটা।···একটু ঘুমোবার চেষ্টাও করগে।"

সরমা উঠে বললে—"যদি সুবিধে হয় তো বলে দিও আমিও কিছু পুষে রাখিনি মনে।"

বাইরে বেরুতেই দেখে দোরের পাশে রুম্মা। আড়াল হয়ে বসেছিল, দাঁড়িয়ে উঠে চাপা খসখসে গলায় জিগ্যেস করলে—"কেমন আছে?"

হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠায় একটু চমকেই উঠেছিল সরমা, তারপর চেহারা দেখে যেন চোখ ফেরাতে পারলে না। চুল উস্কখুস্ক, বেশভূষা একটু অসংযত, চোখ দুটো প্রদোষের আবছা আলোয় যেন জ্বলছে, একটু রাঙাও। সরমা বললে—"তুই ও এখানে চুপ ক'রে সমস্ত রাত বসে আছিস?"

একটু বিরক্তিই প্রকাশ পেয়ে গেল তার কথায়—সরমা নিজে এত আগ্রহেব যে কারণটা আন্দাজ করেছে তাইতে। এগুতে এগুতে বললে—"আয় বলছি।"

বারান্দা থেকে নেমেছে, রুম্মা হঠাৎ ঘুরে এসে সামনে দাঁড়াল, বললে—"যেও না, দাঁড়াও।"

"কী?...কী ব্যাপার!"—নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সরমা, বাড়াবাড়ি দেখে বিরক্তিটাও হয়ে উঠেছে স্পষ্ট। রুম্মা নিচে বসে পড়ে ওর পা দুটো ধরলে জড়িয়ে, বললে—"না, ফেরো তুমি, দাদাবাবুকেও গিয়ে বলো—তোমরা ওকে বাঁচাতে পারবে না।

"পারবই যে তার আশা এখনও দেখছি না, তবে তোর এই ভবিষ্যৎ বাণী... মুড়ুলি ক'রে..."

"তা নয় কথা বুঝছ না কেন?...পারবে না—তার মানে ওকে বাঁচিও না তোমরা · না, বাঁচিও না—কোনমতেই নয়—বলো গিয়ে দাদাবাবুকে—এক্ষুনি..."

"বাঁচাব না! কেন?...তুই ওঠ আগে।" হাত ধ'রে তুলে দাঁড় করালে সামনে।

"না, বাঁচিও না, কোন মতেই বাঁচিও না—আবার যদি বাঁচবেই তো আমি এত ক'রে কেন..."

"আমি এত ক'রে!! ..তুই কি করেছিস? ..চল, এখানে দাঁড়িয়ে নয়, বাসায় আয়।"

বাসায় এসে ওরা বাইরের বারান্দায় বসল। এইটুকু পথ কোনও কথাই হয় নি। সরমা জিগ্যেস করলে—"তুই · ?"

"ঠিক নিজের হাতে আমি না হলেও, একরকম তাই। দরকার হ'লে তাই বলব —অবিশ্যি, তুলীর বাবা যদি না বলে দেয় তো···কিন্তু ওসব কথা এখন থাক না— যদি ওঠেই তো সে তখনকার কথা তখন।···তোমরা ওকে আবার বাঁচিয়ে তুলছ!"

সরমা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল খুবই, শেষের কথায় সচকিত হয়ে প্রশ্ন করলে— 'কেন বাঁচাব না?···বল্।"

"না, বাঁচাবে না। বাঁচালে ও তোমাদের সর্বনাশ করবে—দুজনেরই—ধ্বংস করবে—ওর মুখের কথাটাই বলি।"

"কোথায় শুনলি ওর মুখের কথা—কবে?"

"কাল রাত্তিরে, ওর বাসায়।"

"তুই গিয়েছিলি?"

"ওকে সাবধান করতে গিয়েছিলাম · ওর দৃষ্টি বড় খারাপ হয়ে উঠছিল ব'লে।"

সরমা একটু চুপ করে রইল; আবার প্রশ্ন করলে—"বেশ, তারপর?"

"আমায় ঐ কথা ব'লে শাসালে—যখন আর কিছুতে পারলে না।"

"কি ক'রে ধ্বংস করবে—কেন—সে সব কিছু জিগ্যেস করেছিলি?"

"দিদিমণি! এরকম একটা কথা শুনেও তোমরা কথার জের টেনে যেতে পার, আমরা বুনোরা পারি না। আমি তারপরেই ওর দোর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম, তারপর চব্বিশ ঘণ্টাও যায় নি।"—বেশ অসহিষ্ণুভাবে কথাগুলো বলে সেই রকম জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে মুখের পানে চেয়ে রইল রুম্মা।

দুজনেই সিঁড়ির ওপর বসে আছে, রুম্মা একটা নিচের ধাপে একটু ঘুরে। এবার যে চুপ করলে সরমা, আর অনেকক্ষণই কথা নেই। রুম্মা মাঝে মাঝে আড়চোখে দৃষ্টি তুলে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছে মুখের ভাবটা, যে আলোছায়াগুলো খেলে যাচ্ছে, তার মধ্য দিয়ে। ভয়ে ভয়েই লক্ষ্য করতে লাগল—নরমই হয়ে আসছে

বেশি ক'রে। এক সময় রুম্মার মাথায় হাত দিয়েই তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করে বললে সরমা —"কাজটা অন্যায়ই করেছিস তোরা রুম্মা, কিন্তু এও যেন মনে হচ্ছে অন্য রকম হবার উপায় ছিল না। কিন্তু এই পর্যন্তই থাক্—এইবার ভুলে যা সব, ভগবানের ওপর সব ছেড়ে দে, তিনি যা করবার করবেন।"

"তাঁর যা করবার আমাদের হাত দিয়েই করান্ দিদিমণি, সেইজন্যেই তো তুলে দিয়েছেন ওকে আমাদের হাতে।"

মাথায় হাত দিতে একটু নরম হয়েছে রুম্মা, কিন্তু সুর বদলায় নি। সরমা হাতটা কাঁধের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে টানতে টানতে বললে—"না, তুই ঠাণ্ডা হ'। ···তুই তাঁর কাছে আমাদের হয়ে এই দয়া চা রুম্মা যে, কেন যে আমাদেরই হাতে আমাদের শত্রু এমন ক'রে তুলে দিয়েছেন তা যেন পরিষ্কার ক'রে নিঃসন্দেহভাবেই বুঝতে পারি আমরা দুজনে—তোর দাদাবাবু আর আমি। রুম্মা, ও যে আমাদের কী ভাবে ধ্বংস ক'রে ফেলতে পারে তুই আন্দাজ করতেও পারবি নি। কিন্তু এও ঠিক যে—এক ভগবান ওকে নিজে নেন, মানুষের চেষ্টা সত্ত্বেও, সে আলাদা—কিন্তু আমাদের দু'জনের এতটুকু অবহেলার জন্যেও, মনের এতটুকু গলদের জন্যেও যদি মৃন্ময়বাবুকে যেতে হয় তো আমাদের ধ্বংস তিনি নিজের হাতেই নেবেন তুলে।·· আমরা দুজনে একটা নতুন ব্রত নিয়েছি জীবনে, তুই এই দয়াই চা তাঁর কাছে—যে তার গোড়াতেই যে তাঁর এই অগ্নি-পরীক্ষা, এতে যেন উৎরে যেতে পারি আমরা ভাল করেই।"

———